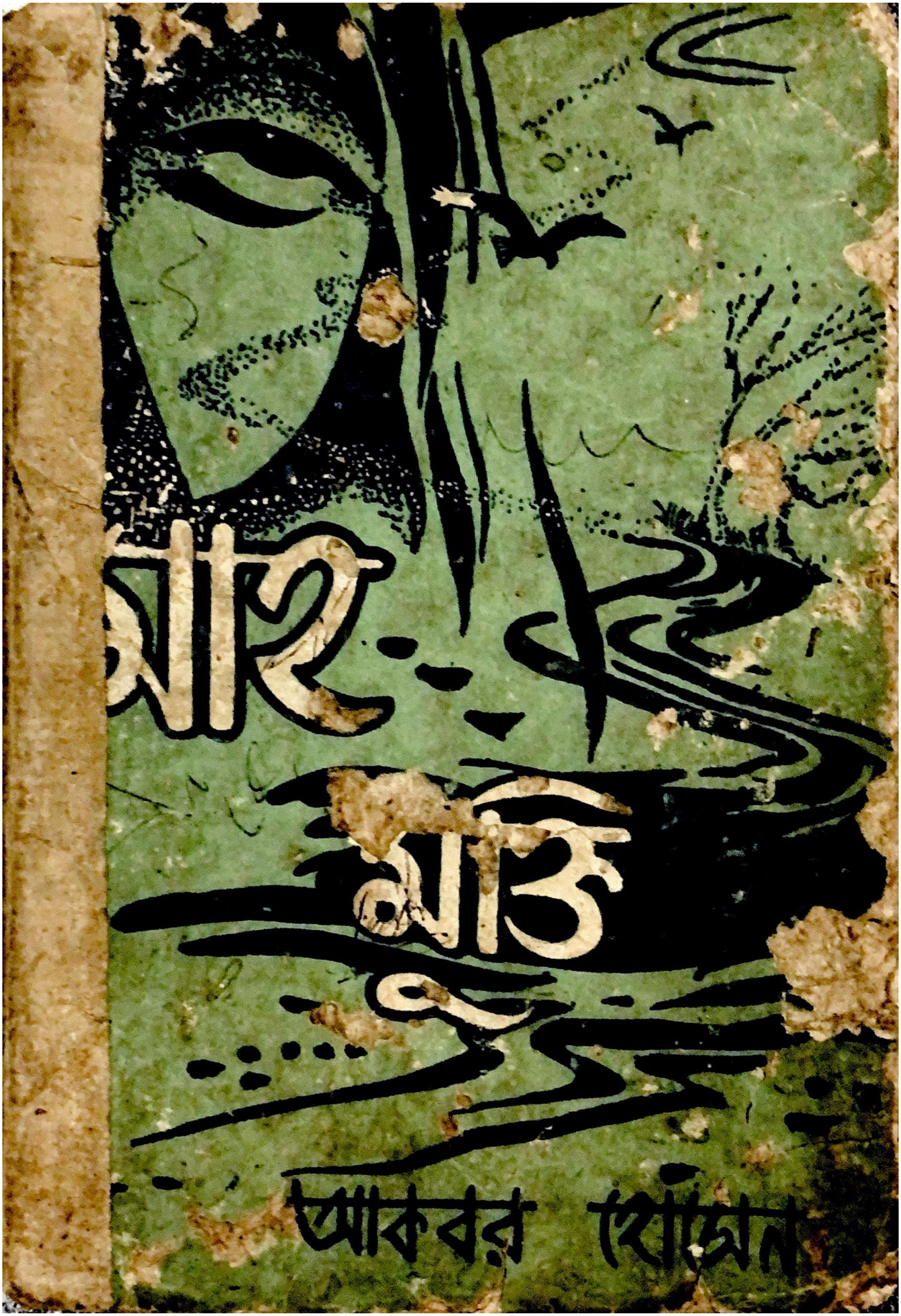

মোহ মুক্তি

আকবর হোসেন

মোহমুক্তি

“জহুরুল”

আকবর হোসেন

জাহাঙ্গীর ব্রাদার্স
৩৬, বাংলা বাজার
ঢাকা-১

প্রকাশক—
জাহাঙ্গীর ব্রাদার্স
৩৬, বাংলা বাজার
দোতলা

সর্ব্বস্বত্ব ঃ লেখক কর্ত্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ—১৯৫৩ সাল

মূল্য ঃ ১৯/০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ
শেলী প্রেস
৫৮, প্যারিদাস রোড
ঢাকা-১

মোহমুক্তি ঃ

প্রণয়-মধুর অভিনব প্রেমের উপন্যাস। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ পুস্তক পাঠক মনকে আকৃষ্ট করে রাখে। অতি আধুনিকার দাম্ভিক জীবন সত্তা কেমন করে সত্য ও সঠিক জীবন-বোধের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে শেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় তারই এক সকরুণ চিত্র-সম্বলিত উপন্যাস মোহমুক্তি। বাংলা সাহিত্যে মোহমুক্তি এক যুগান্তকারী মহান গ্রন্থ।

—প্রকাশক

আকবর হোসেনের অন্যান্য উপন্যাসাবলী
ও
ছোট গল্পের বই ঃ

অবাঞ্ছিত—পঞ্চদশ সংস্করণ
কি পাইনি-চতুর্দশ সংস্করণ
মোহমুক্তি—ত্রয়োদশ সংস্করণ
ঢেউ জাগে—ষষ্ঠ সংস্করণ
আলোছায়া—পঞ্চম সংস্করণ
দু'দিনের খেলাঘর—পঞ্চম সংস্করণ
মেঘ-বিজলী বাদল- চতুর্থ সংস্করণ
নতুন পৃথিবী—দ্বিতীয় সংস্করণ
ঝিলমিল—কবিতার বই, প্রকাশের পথে।

(১)

—তা'হলে এই তোমার শেষ কথা ?

মিনা একেবারে নিরুত্তর। অপমানজনিত রোষ চেপে আনোয়ার অনুরোধের সুরে বলে—মায়ের অসুখ—তাই। তিনি হয়ত আর বাঁচবেন না। তাঁকে একটিবার দেখতেও যাবেনা ?

—কি করে যাব বল ? অবসর কোথায় ?

আনোয়ারের কণ্ঠে ফুটে ওঠে ক্রোধ-মিশ্রিত অভিমানের সুর—অবসর সত্যি তোমার নেই। গত দেড় বছরের মধ্যে আমার সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপনের জন্য একটি মূহুর্ত্তের অবসরও তোমার জোটেনি। অথচ অবসর জুটেছে অনেকের সঙ্গে দিনের পর দিন প্রমোদ-ভ্রমণের, নৈশ অভিযানের—অভিসারের।

মিনা সক্রোধে উত্তর দেয়—একথা বলবার জন্যই কি এ ঘরে এসেছ ? যা' তা' ব'লো না আমাকে। আমি যাদের সঙ্গে মেলা-মেশা করি তারা কেউ আমার পর নয়।

—জানি। কেউ তারা পর নয়। পর শুধু আমি। যাক, একটু আগে তুমি বলেছ— 'উভয়ের মিলন যখন অসম্ভব, তখন বিচ্ছেদ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।' চমৎকার প্রস্তাব ! বালিগঞ্জের লেকে, ইডেন বা বোটানিক্যাল গার্ডেনে—গড়ের মাঠে—দক্ষিণেশ্বরের প্রাচীন বটতলে, ডায়মণ্ডহারবারের নদী সৈকতে যাদের বিলাস ভ্রমণ নেশা জাগায়, তারা নাকি মনের দিক থেকে ভ্রান্ত প্রশস্তি লাভ করে। সে প্রশস্তির ব্যাপকতা এত বেশী যে গণ্ডীর বাঁধন তাদের খুলে যায় ! গৃহকে তারা পিঞ্জর মনে করে—লজ্জা পর্দার অবরণকে তারা দুর্বহ ভাবে।

—এ দিয়ে কি বুঝাতে চাও ?

—বোঝাতে চাই যে তুমি শুধু আলেয়ার পেছনে ছুটে চলেছ স্বামী হ'য়ে আজ পর্য্যন্ত তোমার দেহকেও স্পর্শ করিনি। কারণ কারও মনের চারপাশে অশ্রদ্ধার কালো মেঘ জমা রেখে আমি দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতায় আঘাত হানতে চাইনে। কিন্তু যারা তোমার দেহের স্পর্শ পেতে চায়, তারা যে কত বড় ভণ্ড তা একদিন নিশ্চয়ই বুঝবে।

মিনা তীব্র প্রতিবাদ করে—এ সব কথার অর্থ? আমার দেহকে স্পর্শ করার সাহস কোন পুরুষের হয়নি আজও। আর বোধ হয় হবেও না কোনদিন। তুমি আমায় কি ভাবো বলতে পারো?

মৃদু হেসে আনোয়ার উত্তর দেয়—ভাবি অনেক কিছু। ভাবি—তুমি বধূ—সুন্দরী নববধূ। শরৎ প্রভাতের শিশির-সিক্ত আধ গোলাপ কুঁড়ির মতই তোমাকে আকাঙ্খার বস্তুরূপে ভাবি। আর ভাবি, কচি-কোমল পাঁপড়ি দলের মাঝে সারারাত ধ'রে আকাশের যে অশ্রু জমেছে তা স্পর্শ-দোলায় ঝরাবো না। দিবসের রৌদ্রতেজে বাস্প হ'য়ে আবার সে অশ্রু-শিশির বাতাসে বতোসে সুবাস ছড়িয়ে দিক। বিশ্বদেহে আনুক সজীব সরসতা—রাতের শিশির হয়ে আবার ঝ'রে পড়ুক তোমার অনাঘ্রাতা বুকে!

আনোয়ার বলতে বলতে বিমনা হয়ে থেমে যায়। দীর্ঘশ্বাসে আবার বলে—কিন্তু এতক'রে ভাবতে গিয়ে দেখি তোমার পাঁপড়ি দলে অসংখ্য কীটের আবাস। তুমি সে কীট দংশনে দাদের রোগীর মত আরাম খোঁজ। কিন্তু জাননা তারপর যে বিশ্রী প্রদাহ শুরু হবে তার জ্বালা কত বেশী তীব্র। যাক, এ নিয়ে তর্ক মিছে। মায়ের রোগ শয্যার পাশে শুধু আমাকেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

মিনা প্রসাধন মাখতে মাখতে বলে—উপায় কি! এতদিনে আর একটা বিয়ে করলে মাকে তোমার বউ দেখাবার সাধ পূর্ণ হ'ত।

বিপ্লব দাস

আনোয়ার উত্তর দেয়—তা হয়ত হ'ত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যে সাধ আজ অপূর্ণ রয়ে গেল তার আঘাত একদিন তোমার বুকেও কঠিন প্রতিঘাত জাগাবে। বিয়ে আবার করবো নিশ্চয়ই, কিন্তু তোমাকে মুক্তি দেবো না কোনদিন। তোমার মত সুন্দরীকে হাতছাড়া ক'রে মন রাখার ঠাঁই কোথায় পাব, বল?

মিনা সহসা উঠে দাঁড়ায়। তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে বলে—তুমি আমায় বেঁধে রাখবে নাকি? কিন্তু জেনো, ইহকালে সে শুধু স্বপ্ন হয়েই থাকবে।

—তাই হোক মিনা! কিন্তু আমি যে ইহকালের চেয়ে পরকালকে মানি বেশি ক'রে। এ জগতকে আমি ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন ভ্রমনের স্থান বলেই মনে করি। মৃত্যুর মাঝ দিয়ে, অন্ধ যবনিকা পার হ'য়ে একদিন মানুষ সত্য ও সুন্দরের বাস্তব জীবনে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে শুরু হয় আসল যাত্রা।

মিনা কটাক্ষ ক'রে উত্তর দেয়—তা'হলে সেদিনের আশাতেই ব'সে থাকো।

আনোয়ার বলে—তাই থাকবো মিনা, তাই থাকবো। আজকার এ উচ্ছৃঙ্খলতা তোমার থেমে যাবে—মিথ্যে বিলাস ভ্রমণের ভুলও তোমার ভাঙবে। অন্যায় অনাচারের জন্য তোমার মাঝে আসবে অনুশোচনা। তারপর তোমার উদ্ধত, গর্বোন্নত শির একদিন ঘৃণ্য পরাজয়ের গ্লানি ভরে নু'য়ে পড়বে। সেদিন দেখতে পাবে, তোমার রঙিন বসন্ত নিদাঘের দীর্ঘশ্বাসে হারিয়ে গেছে। শুনতে পাবে ঝরা পাতার মৃত্যু কাতর আকুল আর্ত্তনাদ। বুঝতে পারবে তোমার বিভ্রান্ত জীবনের চতুস্পার্শ্ব কেমন ধূসর-মলিন, ব্যর্থ-বিবশ।

মিনা উত্তর দেয়—ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা আমি ন'ই। অজানার গর্ভে কি লুকিয়ে আছে তা নিয়ে চিন্তাও আমি করি না। বর্ত্তমানকে নিয়েই আমার খেলা।

—কিন্তু এ খেলা তোমার ভেঙ্গে যাবে।

—ভাঙ্গুক! ভাঙ্গাগড়া নিয়েই ত সংসার। এক ভাঙ্গবে আর এক গ'ড়বো। বিলয়ের মাঝে যেমন দুঃখ আছে, তেমনি সৃষ্টির মাঝে আছে অফুরন্ত সুখ।

— তা হলে তাই ভাঙ্গো। ভেঙ্গে সৃষ্টির মাঝে সুখের সন্ধানই কর। দেখো, ভেঙ্গে গ'ড়তে গিয়ে ব্যর্থতায় নিজে না একদিন একেবারে ভেঙ্গে পড়!

মিনা বিরক্ত হয়ে উত্তর দেয়—সে চিন্তা তোমার নয়।

—কেন নয় বল? সহধর্মিনীর জন্য স্বামীর চিন্তা থাকাই ত স্বাভাবিক।

—বাজে ব'কোনা। আমার অনেক কাজ আছে।

—বাজে বক্‌ছি!

—নিশ্চয়ই। যার মা মৃত্যুশয্যায়, সে এখানে দাঁড়িয়ে কোন মুখে নীতিবাক্য আওড়াবার সময় পায়?

আনোয়ার প্রতিবাদ ক'রে উঠে দাঁড়ায়। মুহূর্তে সে যেন রোষানলে জ্বলে উঠে। আরক্ত চোখে গম্ভীর স্বরে বলে—এ নীতি বাক্য নয়—এ জীবনের শেষ জবাব। আমার বক্তব্য শেষে তোমার চরম কৈফিয়ত আজ শুনে যাবো। শেষ কৈফিয়ত।

ক্রোধে কাঁপতে থাকে আনোয়ার। অকস্মাৎ স্বমূর্ত্তি ধারণ করে মিনা। আনোয়ারকে লক্ষ্য করে সে বলে—হ্যাঁ, চরম কৈফিয়তই তোমার আজ দেব। কতবড় সাহস তোমার যে আমারই গৃহে দাঁড়িয়ে শাসন দেখাতে এসেছ। তোমার রক্তচক্ষুর তোয়াক্কা আমি রাখি না। বেরিয়ে যাও ঘর থেকে। যাও বলছি! যাবে না? দারোয়ান। দারোয়ান।

—দারোয়ানকে ডেকে অপমান করবে নাকি?

—শুধু অপমান নয়—আরও বেশী কিছু।

দারোয়ান ছুটে আসে—হুকুম কিজিয়ে মায়জি।

—এখুনি পাশের ঘর থেকে এ লোকটির বিছানা পত্তর—সব কিছু নিচের গদিঘরে নামিয়ে দে। কি দাঁড়িয়ে রইলি যে!

আনোয়ারের বিক্ষুব্ধ মুখের প্রতি দারোয়ান একবার সভয়ে তাকায়। তার কণ্ঠ শুষ্ক—দেহ অবশ। সে চাকর বইত নয়। কিন্তু এ গৃহের জামাতার ওপর এ কি নির্মম ব্যবহার—তাঁর প্রতি বহিষ্কারের এমন কঠিন আদেশ! দারোয়ান হতবুদ্ধি হ'য়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু এতবড় অপমান আনোয়ার নিরবে সহ্য কর'লো। স্ত্রীর ঔদ্ধত্যের জন্য সমুচিত শাস্তি দেওয়াই তার উচিত ছিল। কিন্তু মায়ের মৃত্যুম্লান মুখ একদিকে, অন্যদিকে স্ত্রীর জঘন্যতম ঔদ্ধত্য তাকে ক্ষণকাল চিন্তার অবসর দিল। দারোয়ানের সামনে নিজেকে সে আর ছোট করতে চাইল না। তাই তার মুখে ফুটে উঠলো ম্লান অপ্রতিভের হাসি। বললো—হ্যাঁ দারোয়ান, আমার বিছানা পত্তর সবকিছু নিচের গদিঘরেই নিয়ে যাও। মায়ের কঠিন অসুখ আজই আমাকে বিকেলের ট্রেনে দেশে যেতে হবে। যাও, ওগুলো নীচে নিয়ে রাখ।

দ্বিধাজড়িত পদে দারোয়ান কক্ষান্তরে প্রবেশ করে। ক্ষুব্ধ, ব্যথিত, অপমানিত আনোয়ার মিনার কাছে এগিয়ে যায়। দৃঢ় কঠোর, ক্রোধমত্ত তার মূর্ত্তি। সর্বশরীরে রুক্ষ উর্ত্তেজনার প্রকাশ। তবু সংযত সে। নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত অথচ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাষায় বলে—আজ ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায়, হতমান নিয়ে চ'লে যাচ্ছি মিনা। কিন্তু যাবার আগে কয়েকটি কথা তোমায় ব'লে যাবো। শেঠ জাফর আহম্মদের কন্যা তুমি। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত অভিজাত পরিবেশে মানুষ হয়েছ। কিন্তু তোমার আচরণে যে

জঘন্যতম ঔদ্ধত্যে প্রকাশ পেয়েছে তা লজ্জাকর এবং ক্ষমাহীন। যাক্। যদি কোনদিন জীবনে তোমার ব্যর্থতার গ্লানি আসে—যদি কোনদিন নিজেকে অসহায় ভাবো, তবে রতনদীঘির চৌধুরী পরিবারের রাজপথে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে দাঁড়িয়ো।

মুহূর্ত্তে ঘুরে দাঁড়ায় মিনা—ক্ষমা ভিক্ষা করব আমি ?

আনোয়ার দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দেয়—হ্যাঁ, তুমি। যদি বেঁচে থাকি সেদিন তোমায় ক্ষমা ক'রে ঘরে তুলে নেব। আর যদি না থাকি তবে সেখানকার মাটি তোমায় আশ্রায় দেবে। সেদিন ব্যর্থ জীবনে নিজেকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে অনেক ক্ষতি তোমার হয়ে গেছে—অনেক ঐশ্বর্য্য তোমার কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। যদি জীবনে তেমন দিন আসে তবে আজকের এ দম্ভের উপযুক্ত উত্তর তুমি পাবে। তোমাকে দৈহিক আঘাত দিয়ে শাসন করবো না। আমার শাসন চলবে নীরবে—অন্তরে অন্তরে। আর দার্শনিকরা তেমনি ভাবেই শাসন ক'রে থাকে উদ্ধত মানুষদের।

কথাগুলো বলে আনোয়ার ঝড়ের বেগে প্রস্থান করে। তার গতিপথের দিকে দৃষ্টি রেখে মিনা বিদ্রূপের হাসি হাসে। হল্ ঘরে পিয়ানোর পাশে গিয়ে আসন গ্রহণ করে সে। সে যেন আজ হাল্কা হয়ে গেছে—বিরাট গুরুভার নেমে গেছে তার জীবন থেকে। আপন মনে সে হাসে—আপন মনে খুলে দেয় বেণীর বাঁধন, হৃদয়ের অর্গলবদ্ধ দুয়ার। তারপর মুক্তির দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে অদ্ভুত ঢংয়ে সুরের ধ্বনি তোলে পিয়ানোর বুকে। গৃহখানা সে সুরের ঝঙ্কারে রোদন ক'রে ওঠে যেন।

পিয়ানোর সুরের মাঝে মিনার জীবনের মহা স্বস্তির সুরে বেজে উঠেছিল। তারই তান—মুর্চ্ছনায় সে আবেশ-মগ্ন। চোখের দু'পাশ বেয়ে ঝরে পড়েছে অকারণ অশ্রু। তবু সুরের বিরতি নেই—জীবন-স্পন্দনের নেই ইতি।

ক্ষণিকে দরজার করাঘাত হ'ল। সজোর, কর্কশ করাঘাত। মিনা উৎকর্ণ হয়ে প্রশ্ন করে—কে?

নাসির এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে—কাকে অনুমান করেছিলেন? নিশ্চয়ই আমাকে।

—হ্যাঁ, কারণ আপনারই আসার কথা ছিল যে।

—কিন্তু এত দেরী কেন? সবাই উৎকণ্ঠা নিয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। চলুন।

—আমাকে মাপ করতে হবে নাসির সাহেব। আজ কোথাও যাবো না। শরীর ভাল নয়।

নাসির উদ্বেগ প্রকাশে বলে—সে কি কথা! এত আয়োজন সব পণ্ড হবে যে। মিঃ মুন্সী প্রমুখ সবাই যে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

—কিন্তু আমি আমার অক্ষমতা জানাচ্ছি। তা'ছাড়া আজ পর্যন্ত আমি ঠিক করে উঠতে পারিনি কোন্‌টা ভাল, কি আমার করণীয়।

—সে আমি আগেই জানি। বাঙালী মুসলমান মেয়েদের গলদত এখানেই। তারা উচ্চশিক্ষা পেয়েও কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভয় পায়। আজ চেয়ে দেখুন বোম্বের ফিল্ম ব্যাবসার দিকে। সেখানে প্রায় সবগুলো বইতে মুসলমান মেয়েরা কি ভাবে পয়সা

লুঠছে। কত নাম তাদের! আপনার এত রূপ, যৌবন, এমন মিষ্টি কণ্ঠ, আর সুন্দর দেহলতা—কি যে বলেন আপনি!

নাসির অদ্ভুত ঢংয়ে হাসে। মিনা উত্তর দেয়—সত্যি? আমার মাঝে এতসব আছে নাকি? অবশ্য, চাটুকার আপনি ন'ন। কারণ রূপে গুণের কম্‌তি সত্যি আমার নেই। তবে আসল কথা কি জানেন?

—কি?

—আমি কোন পুরুষের আধিপত্য বরদাশত করতে পারবো না। মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে ছোট হ'তে হবে নাকি?

—না, না, তা হবেন কেন! তেমনভাবে ভাবাই মূর্খতা। তবে সংসার-জীবনে পুরুষ থাকে বাইরে—কর্ম্মক্ষেত্রে, আর নারীর জন্য গৃহ। গৃহলক্ষ্মী হয়ে নারীর যে রূপ ফোটে তা সুন্দর এবং সুশ্রী বলেই মনে হয়।

মিনা প্রতিবাদ করে—হ'তে পারে। কিন্তু সে রূপ আমার নয় আমি নিজত্ব বজায় রেখে চলতে চাই। নারীদেহে পুরুষ আমি। আর চির-কৌমার্য্যই আমার ব্রত।

—ভাল কথা। রক্ষা করতে পারেন, ভাল। কিন্তু তার কোন প্রয়োজন দেখিনে। নারীর রূপ যে নারীত্বেই। নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মাঝেই নারীর মহত্ত্ব।

—কিন্তু আমি সে মহত্ত্ব চাই নে। কারও কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবো না কোনদিন। নোংরা যৌন-জীবন যাপন করা আমার উদ্দেশ্যও নয়, কাম্য নয়।

—না হতে পারে। তাই বলে নারী পুরুষ যৌন মিলনে নোংরামী দেখলেন কোথায়? জীবদেহে সে যে স্বাভাবিক এক আবেদন। সৃষ্টির আদি হ'তে যার আরাধনা। তাকে একেবারে ত্যাগ করা অবাস্তব—অসম্ভবও বটে।

মিনা কটাক্ষ করে—আমার কাছে তাই সম্ভব। যৌন আবেদন সৃষ্টি করতে গিয়ে একজন ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। আপনিও কি সেই আবেদন তলে পেতে চান আমাকে?

নাসির বাধা দিয়ে বলে—ছিঃ! ছিঃ! একথা কেন ওঠে বলুন ত? আপনাকে বড় ক'রে তোলাই আমার কাম্য। আপনি বড় হউন, আপনার সুনাম ছড়িয়ে পড়ুক, অমোদের চেষ্টা সার্থক হোক।

মিনা উত্তর দেয়না। নাসির আবার বলে—তা'হলে কোনমতেই আপনার যাওয়া কি সম্ভব নয়?

—আমি ত আগেই বলেছি। শরীর আমার বড্ড খারাপ।

—বেশ! তাহ'লে আবার একটা দিন ঠিক ক'রে আপনাকে খবর দেব। সেদিন কিন্তু—

—না, না। সেদিন নিশ্চয়ই যাবো।

নাসিরের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে ঈর্ষা-বিদগ্ধ শহীদ কক্ষে প্রবেশ করে।

সে প্রশ্ন করে—নাসির কেন এসেছিল?

শহীদের প্রশ্ন করার ধরণ দেখে মিনা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। ভারীকণ্ঠে উত্তর দেয়—এসেছিল তোমারই মত প্রয়োজনের তাগিদে। তবে তার বক্তব্য স্পষ্ট।

—তার মানে?

—মানে আজ থাক। যে জন্য তোমায় ডেকেছি তাই শোন। কি ঠিক করলে তুমি? ধৈর্য্যের বাঁধ আমার ভেঙ্গে গেছে। এখানে এক মুহূর্তেও থাকতে সাধ নেই।

—কেন, কি হয়েছে?

—দ্বন্দ্ব, কলহ লেগেই আছে। বিয়ে নাকি ছাই কি একটা হয়েছে আমার। তাতে আমার সারাটা জীবন নাকি কার পায়ের তলায়

ফেলে দিয়েছি! পর্দ্দা! পর্দ্দা! পর্দ্দা! গ্রাজুয়েট হ'য়ে আমি ইচ্ছে মত বাইরে যেতে পারবো না, ইচ্ছে মত কারও সঙ্গে কথা বলতে পারবো না। কেন?

—একি তোমার স্বামীর আদেশ?

—স্বামী কে? তাকে আমি কোনদিন স্বামী বলে আমল দেবো ভেবেছ? তার সঙ্গে আজ আমার বোঝাপড়া হয়ে গেছে! কিন্তু এইখানেই শেষ নয়! আমার চলার পথ থেকে মিঃ চৌধুরীকে চিরদিনের মত সরাতে হবে। হয় সে স্বেচ্ছায় আমাকে ত্যাগ করবে, নয় যে কোন উপায়ে হোক—

— কিন্তু সে যে তোমার স্বামী।

—থামো। আমি তাকে স্বামী বলে স্বীকার করিনি, করবোও না কোনদিন।

অকস্মাৎ পিতৃকণ্ঠে ধ্বনিত হয়—কি স্বীকার কর না মিনা?

গৃহ অভ্যন্তরে পিতার সশরীর আগমন লক্ষ্য ক'রে মিনা অবাক বিস্ময়ে উঠে দাঁড়ায়! জাফর সাহেব কন্যার পার্শ্বে এগিয়ে গিয়ে বলেন—বিশ্ব সংসার যা স্বীকার করে নিয়েছে, তা তোমার একক প্রচেষ্টায় অস্বীকার করতে পারবে না মা। আনোয়ার আমারই বাড়ী থেকে এম, এ পাশ করলো। গত চার বছর ধ'রে তাকে লক্ষ্য করেছি। তোমার ইষ্ট হবে জেনেই তার সঙ্গে তোমার গ্রন্থী বেঁধে দিয়েছি। সে পবিত্র বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য যে হীন প্রচেষ্টা শুরু করেছ তাতে তোমার উচ্ছৃঙ্খলতাই প্রকাশ পেয়েছে। আজ বুঝতে পারছি, শেঠ জাফর আহম্মদ তার কন্যার উচ্চ শিক্ষার মাঝে শুধু কুশিক্ষাই দিয়েছেন।

শহীদ ক্ষীণ প্রতিবাদ করে—এ আপনার অন্যায় ধারণা।

জাফর সাহেব ক্রোধে গর্জ্জে ওঠেন—থামো! ন্যায়-অন্যায় বিচার

করতে তুমি এখানে কেন? কে তোমায় এখানে আসতে বলেছে? সরে যাও সামনে থেকে! যাও, দাঁড়িয়ে রইলে যে?

ক্রোধমত্ত জাফর সাহেব উদ্ধত বাহু তুলে এগিয়ে যান শহীদের দিকে? মিনা ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে চীৎকার ক'রে ডাকে—আব্বা—

কন্যার শঙ্কিত কণ্ঠস্বরে পিতার উত্তেজনায় বাধা পড়ে। শ্লথ হয়ে আসে গতি। ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন—ও কেন এসেছে? এ বাড়ীর সীমানায় আসতে ওকে নিষেধ ক'রে দিয়েছি। তবু কেন এসেছে ও?

মিনা নতমস্তকে উত্তর দেয়—আত্মীয়ের ছেলেকে এমন ভাবে অপমান করা কি উচিত হ'ল? তা'ছাড়া আমিই ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

—ডেকে পাঠিয়েছিলে! কেন?

—আমার প্রয়োজন কি কিছু থাকতে পারে না?

—তোমার প্রয়োজন। তা থাকবে বই কি! কিন্তু বিবাহিতা নারীর সে প্রয়োজন এমন উলঙ্গ এবং স্বাধীন ভাবে মেটানো যায় না। আজ তোমার স্বামীকে তুমি অপমান করেছ। সে গরীব হ'তে পারে, কিন্তু বনেদি ঘরের ছেলে সে। আমি যাকে জামাতার সম্মান দিয়েছি তাকে তুমি ভৃত্যেরও অধম জ্ঞানে বিদ্রূপ করতে শুরু করেছ।

মিনা মুখ তুলে উত্তর দেয়—বিদ্রূপ তাকে করিনি, মনেপ্রানে তাকে আমি ঘৃণাই করি।

জাফর সাহেব ক্রোধে গর্জ্জে ওঠেন—মিনা! তাঁর দৃষ্টিকেন্দ্র হ'তে আগুন ঠিকরে পড়ে যেন! উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে তাঁর সর্ব্বশরীর।

মিনা খাটের পাশে স'রে গিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলে—হ্যাঁ। যাকে আমি চাইনে তার জন্য অন্তরে কেন থাকবে এতটুকু স্থান? এতদিন

শালিনতা বজায় রেখে, লজ্জা-পর্দ্দার আড়ালে গুমরে মরেছি। অনেক সহ্য করেছি। কিন্তু আজ আমায় বেহায়া হ'তে হ'ল। মুখ ফুটে বলতে হ'ল—কেন আমি এতদিন তাকে স্বামী ব'লে আমল দিইনি। সে আমার স্বামী হবার যোগ্য নয়।

জাফর সাহেব কন্যার এহেন আত্মপ্রকাশে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। বিস্ময়-মাখা কণ্ঠে উচ্চারণ করেন—ফিলজফিতে ফাষ্টক্লাশ ফাষ্ট হয়ে যে এম, এ পাশ করলো, সে তোমার মত মেয়ের স্বামী হবার যোগ্য নয়! বড় অদ্ভুত কথা শুনালে আজ! অর্থ আর আভিজাত্য যে এক নয়, সে সত্য আজ প্রমাণিত হ'ল। বিয়ের পর তোমাকে একবার স্বামীর ঘরে যেতে হয়েছিল, মনে আছে?

—কেন থাকবে না!

—থাকাই ত স্বাভাবিক! সেখানে তোমাকে আনতে গেলে তোমার শাশুড়ী যা বলেছিলেন আজ দেখতে পাচ্ছি তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

মিনা প্রশ্ন করে—কি বলেছিল সে?

আরক্ত চোখে জাফর সাহেব বলেন—'সে' নয় ,তিনি। তাঁর প্রতিও তোমার শ্রদ্ধা নেই দেখছি। অশ্চর্য্য!

জাফর সাহেব ক্রোধ সম্বরণ করে বলেন—তোমার শাশুড়ী সেদিন বলেছিলেন—'বেয়াই সাহেব, আপনি বিরাট ধনী—বিপুল প্রতাপ নাকি আপনার। জানিনা আপনি মহৎ কিনা। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে—অর্থ আর আভিজাত্য একনয়। মেয়েকে প্রাচুর্য্যের মাঝে বিলাসী আর গরবিনী করেছেন, কিন্তু মানুষ করে তুলতে পারেন নি!'

সেদিন মর্ম্মাহত হয়ে নিদারুণ দুঃখ নিয়ে ঘরে ফিরে ছিলাম। কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি তোমাকে সত্যি মানুষ করে গড়া হয়নি। নইলে আমার স্বপ্ন-সৌধের ভিত্তিমূলে চরম আঘাত দেবার জন্য

তুমি এমনভাবে বিদ্রোহ শুরু করতে না। তবে জেনো—আমি বেঁচে থাকতে—

—আমায় মুক্ত হ'তে দেবেন না, এইত ?

জাফর সাহেব গর্জ্জে ওঠেন—অসম্ভব সাহস তোমার! আমার সামনে এভাবে ঔদ্ধত্য দেখাবার দুঃসাহস কোথায় পেলে ?

মিনা নির্ভয়ে উত্তর দেয়—এ দুঃসাহসের কথা নয়। এ আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিরূপণের প্রয়াস মাত্র। ভিখেরীর ছেলে, যে আমাদের সাহায্যে লেখাপড়া শিখলো—আমাদেরই গদি ঘরের পাশে গুদামঘরে বছরের পর বছর আস্তানা পেতে ছিল

—তারই জন্য সাজাতে হবে বাসর! আপনার এ অন্যায় জিদের জন্য নির্ব্বিবাদে সহ্য করতে হবে সবকিছু ? এ-যে কতবড় অন্যায়, কত বড় অবিচার—তাই আমি প্রমান করবো।

পিতা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে বলেন—বেশ! তা হ'লে বিদ্রোহ শুরু কর। তোমার ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রেখেই শুভ কার্য্য সম্পন্ন করেছিলাম।

—কিন্তু আমার চতুষ্পার্শ্বের কথা বোধ হয় চিন্তা করেন নি কোনদিন। তা যদি করতেন তবে আজ এ বিরোধ দেখা দিত না। একদিকে বিয়ে করাতে আমার আনিচ্ছা, অন্যদিকে আপনার কঠোর জিদ! আমার কাতর আবেদনও সেদিন আপনাকে টলাতে পারে নি।

—তাই ত প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করেছ। স্বামীকে অপমান ক'রে নামিয়ে দিয়েছ গদিঘরে।

—সেই ত তার উপযুক্ত স্থান।

—থামো! তার স্থান যে কোথায়, আমি জানি।

তাই যদি জানতেন তা' হলে চারটি বছর, তাকে গুদাম ঘরে রেখে নীতিবোধের মাথা খেতেন না।

পিতা দৃঢ়কণ্ঠে বাধা দেন—থাক্। তোমার কাছে আজ আমায় নীতিজ্ঞান শিখতে হবেনা, মিনা। উচ্চশিক্ষায় মানুষ মহৎ হয়, কিন্তু তুমি হয়েছ উচ্ছৃঙ্খল। সেদিন তোমার শাশুড়ীকে অপমান করেছিলে, আজ আমাকেও করলে।

শহীদ অকস্মাৎ উত্তর দেয়—শাশুড়ীকে মিনা কেন অপমান করেছিল তা বোধহয় শোনেন নি?

—না। শুনবার প্রয়োজনও বোধ করিনে।

—কিন্তু শুনলে আপনার হাসি পাবে।

—হাসি পাবে!

—হ্যাঁ! নতুন বউ সেদিন মিনা। তার মর্য্যাদা রক্ষার সাধারণ জ্ঞানও ওর শাশুড়ীর ছিলনা। প্রকাশ্যে বহু লোকের সামনে তিনি বলেছিলেন 'যে মেয়ে কোরান পড়তে পারে না—ইসলামের আদব কায়দা জানেনা, অথচ লজ্জা-পর্দ্দার মাথা খেয়ে সবার সামনে বের হয়, সে লক্ষপতির মেয়ে হ'লেও রতনদীঘির চৌধুরী বংশের বধূ হবার যোগ্য নয়।

—একথা তিনি বলেছিলেন?

—হ্যাঁ, তাও আবার বাড়ী ভর্তি লোকের সামনে।

—হুঁ। তা'হলে তিনি অন্যায় বলেন নি। উপযুক্ত কথাই বলেছিলেন। মিনার উচ্চশিক্ষার সাথে ধর্ম্মীয় শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। সে শিক্ষায় শিক্ষিতা হ'লে আজ এতবড় বিরোধ দেখা দিত না।

শহীদ উত্তর দেয়—বিরোধ কোথাও দেখা দেয়নি। আপনি মিনাকে ভুল বুঝেছেন।

—থামো! আমি ভুল বুঝেছি। আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ দেখতে আমি ভুল বুঝেছি, আর তুমি তাই শোধরাতে এসেছ! বের হও এখান থেকে। বের হও। তিনি উচ্চকণ্ঠে চীৎকার ক'রে ডাকেন—দারোয়ান।

মিনা উদ্বেগ প্রকাশ করে—আব্বা! দারোয়ান ডেকে ওকে তুমি অপমান করবে নাকি?

জাফর সাহেব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন – অপমান! তোমার চারপাশ থেকে কু-গ্রহগুলোকে আমি নির্মূল করবো। একেবারে নির্মূল করবো।

তিনি উত্তেজনায় কাঁপতে থাকেন। তাঁর দুই চোখে আগুন ঠিকরে পড়ে। মিনা ও শহীদের বিরক্তিকর অবস্থান তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। পিছনে ফিরে মুক্ত জানালার কাছে গিয়ে তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ডাকেন—দারোয়ান।

জাফর সাহেবের ভয়ঙ্করী মুর্ত্তি দর্শনে ভীত সন্ত্রস্ত শহীদ নিঃশব্দে গৃহ ত্যাগ করে। মিনা তাকে বাধা দিতে গিয়ে থেমে যায়। স্থানুর মত হত-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। রুদ্ধ-আবেগে তার চোখে দেখা দেয় অশ্রুর ধারা।

একটু পরে দারোয়ানের কণ্ঠে শোনা যায়—হুজুর। জাফর সাহেব তেমনি ভাবে বাইরে দৃষ্টি রেখেই হুকুম দেন—ওকে ঘাড় ধ'রে বার করে দে।

দারোয়ান সভয়ে প্রশ্ন করে—কাকে হুজুর?

তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই জাফর সাহেব উত্তর দেন—কেন, চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি? তিনি বাম বাহু শহীদের অবস্থানের দিকে প্রসারিত ক'রে মুহূর্ত্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে হুকুম দেন—ওকে। বের ক'রে দে।

কিন্তু একি কঠিন নির্দ্দেশ! তাঁর দৃষ্টিভ্রম হ'ল নাকি? শহীদের পরিবর্তে কে সেখানে অশ্রুসিক্ত চোখে দাঁড়িয়ে আছে! মিনা! মিনা কখন এসে দাঁড়িয়েছে শহীদের জায়গায়।

বিস্ময়াবিষ্ট জাফর সাহেব। দারোয়ান শঙ্কিতকণ্ঠে বলে—উনি যে মা, হুজুর।

—মা! জাফর সাহেব কন্যাকে গভীরভাবে লক্ষ্য করলেন। আশ্রুসিক্ত মিনার চোখ! বিষাদের মেঘভার তার মুখমণ্ডলে। অলক্ষিতে, কাকে তিনি বহিষ্কারের আদেশ দিলেন?

প্রশান্ত ব্যাঘ্রের দৃষ্টিতে দারোয়ানের প্রতি চাইলেন তিনি। দারোয়ান আবার বলে—উনি যে মা, হুজুর।

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন জাফর সাহেব—মা। মা হবার পবিত্র আকাঙ্খা যার মনকে আচ্ছন্ন করেনি, সে কোনদিন মা হয়না মূর্খ। অহমিকার অন্ধকারে তার মাতৃত্ববোধ গুমরে মরে। সে ব্যর্থ হয় জীবনে।

এতগুলো কথা বলে জাফর সাহেব মুহূর্ত্তে গৃহ ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন। সে সঙ্গে দারোয়ানও। স্বপ্নোত্থিতা মিনা পিতার গমন পথের দিকে বাহু বাড়িয়ে কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। অশ্রুসিক্ত চোখে আপন মনে বলে উঠলো—শেঠ জাফর আহমদের কন্যা ব্যর্থ হবে! তার উচ্চশিক্ষা, কৃষ্টি, এতদিনের অভিজ্ঞতা,—তার রূপ যৌবন সব মিথ্যে? অসম্ভব! একেবারে অসম্ভব!

তিনটি মাস কেটে গেছে ঘাত-প্রতিঘাতে। আনোয়ার এ গৃহ ত্যাগ ক'রে চলে গেছে, কিন্তু জাফর সাহেবের অন্তরে রেখে গেছে বিরাট এক ক্ষত।

এদিকে মিনার স্বাধীন জীবনের গতি চলেছে দুর্ব্বার তরঙ্গ তুলে। তার চারপাশে স্বর্ণপ্রসূ ভবিষ্যতের স্বপ্নজাল। চাটুকারের দল তাকে আকাশে তুলে ধরে।

পিতা ও কন্যার সেদিন ঝগড়া হয়ে গেছে। জাফর সাহেব কঠোরভাবে জানিয়েছেন—তোমার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হবার আগে খানিকটা বিষ আমার মুখে ঢেলে দিও। এত বড় কলঙ্ক আমার বংশে!

পিতার এ অর্থহীন উক্তিতে মিনা স্তম্ভিত হয়ে পড়ে।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পরছে—আকাশে জমেছে মেঘের স্তর।

কলকাতার ধুলিম্লান বাতাস সেদিন নির্ম্মল। ঝির ঝির ক'রে ভিজে হাওয়া এসে শান্ত আবেশ দিয়ে যাচ্ছে মিনার বিক্ষুব্ধ দেহ মনে। অস্থির, অশান্ত মিনা। তার মনের চারপাশে জমেছে গভীর কালো মেঘ! ব্যথা-বিধুরা—চিন্তা মলিন মিনা!

—সন্দেহ! কন্যার চরিত্রের ওপর বাপের সন্দেহ! জীবনের গতি তবে কোন পথে ঘুরে যাচ্ছে? পুত্র কন্যাদের সুশাসন করবার অধিকার প্রত্যেক পিতারই আছে। কিন্তু যে নারী পুরুষের ওপর আধিপত্য করার জন্য জন্মেছে তার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ! সেকি হাটে-বাজারে বিক্রী করবে তার অমূল্য সত্তা! এত হীন, এত জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় দেবে সে? না, কখনই না।

তার চিন্তার স্রোতে আঘাত হেনে দরজার কড়া ন'ড়ে ওঠে। এক অপরিচিত যুবকসহ নাসির সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। সুন্দর কারুকার্য খচিত একটা ভ্যানটি ব্যাগ নাসিরের হাতে। যুবকের হাতে ক্ষুদ্র এক ক্যামেরা।

তাদের সাদর জানিয়ে মিনা বলে - বসুন। কতদুর কি করলেন নাসির সাহেব?

—সবই নির্ভর করছে আপনার ওপর। মিঃ মুন্সি বলছিলেন—বাঙ্গালী মুসলমানের ঘরে মিনার মত মেয়ে আছে ভাবতে পারিনি। ক্ষণজন্মা তন্বী-তরুণী বটে!

—আরও কিছু বলছেন নাকি? মিনা মৃদু হাসে।

—আপনি ঠাট্টা করছেন? সত্যি, আপনার মত সুন্দরী তন্বীর জন্ম পৃথিবীতে খুব বেশী হয় না। তা'ছাড়া আপনার প্রগতিশীল মন ও অমায়িক ব্যবহার আপনাকে যে কত সুন্দর এবং জনপ্রিয় ক'রে তুলেছে তা আমার একার মুখে শুনে কুল পাবেন না।

—কেন এ অকারণ প্রশংসা বলুন ত ?

—অকারণ প্রশংসা নাসির কখনো করে না। প্রগতি সংঘের থিয়েটারে আপনি যে অভিনয় চাতুর্য্য দেখিয়েছেন তার তুলনা কোথাও পাওয়া যাবে না। সারা কলকাতায় আপনার নাম।

—তাই নাকি ?

—হবে না ? আপনার দৃষ্টিভঙ্গী উন্নত মানের। যারা মাটির আবর্জ্জনা ত্যাগ ক'রে ঊর্ধ-লোকের রহস্য জানার বাসনা পোষণ করে, তারা একদিন বড় হবেই। কেউ তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। মিঃ মুন্সির কথাই ভাবুন না। পরশ পাথর খোঁজা যার স্বভাব সে কি আপনার মত দুর্মূল্য রত্ন হাতছাড়া করতে পারে ? সন্ধান পাওয়া মাত্র 'কুহেলি'র "আধুনিকা" বইতে আপনার ডাক পড়ে গেল। মিঃ মুন্সি নিখুঁত সন্ধানী বটে !

—শুধু নিখুঁত সন্ধানী নন, সুচতুর চাটুকারও বটে ! কোম্পানীর তরফ থেকে এক পত্রে তিনি জানিয়েছেন—আমাকে পেলে নাকি বাংলার ফিল্ম ব্যবসায় বিরাট সাফল্য আসবে।

নাসির এগিয়ে যায় মিনার পাশে। বলে—আমিও তাই বলি। সারা দেশ যে আপনার মুখের দিকেই চেয়ে আছে। আপনি যে কত বড় তা'নিজে বুঝতে পারেন না।

—সত্যি আমি বুঝতে পারিনা যে, আমি কত বড় ! একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়ে মিনার বুক থেকে। কিছুক্ষণ মৌনতা বিরাজ করে। তারপর নীরবতা ভঙ্গ ক'রে নাসির বলে—আপনার জন্য একটা ভ্যানিটি ব্যাগ এনেছি। নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন।

—কেন নয় ! আপনাদের দান—

মিনা স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশে উপহারটি গ্রহণ করে। নাসির উপহার প্রদানের ক্ষনিক সুযোগে মিনার হাতখানা আঁকড়ে ধ'রে কি যেন বলতে চায়। কিন্তু কিছুই বলা হয় না। মিনা নীরবে হাত সরিয়ে

নেয়। হতমানে আসনে গিয়ে বসে নাসির।

দ্বিতীয় যুবক ক্যামেরা এগিয়ে দিয়ে বলে—এটা মিঃ মুন্সির দান। কেন পাঠিয়েছেন জানেন?

—বলুন।

—ক্যামেরা হচ্ছে এক প্রকার জীবন-দর্শন। জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপের নিখুঁত প্রকাশ ক্যামেরার বুকে ছাপ রেখে যায়। সুতরাং এর গুরুত্ব কম নয়।

মিনা ক্যামেরাটা সাদরে গ্রহণ করে বলে—এতসব উপহার দেবার কি প্রয়োজন? এটা নিয়ে একুশটা ক্যামেরা হ'ল। আর ভ্যানিটি ব্যাগ? তা শ'দেড়ক ত হবেই। আলমারীগুলো প্রায় উপহারেই ভর্ত্তি।

দ্বিতীয় যুবক আলমারীর উপহারগুলো দেখে প্রশ্ন করে—এর মধ্যে আপনার স্বামীর পক্ষ থেকে কি পেয়েছেন?

মিনা স্তব্ধ বিস্ময়ে যুবকের মুখের প্রতি চেয়ে থাকে। এ প্রশ্ন কোন সমজদার করতে পারে তা ভাবতে পারে না। তাই অপ্রতিভ মুখে উত্তর দেয়—হ্যাঁ, তাঁর তরফ থেকেও পেয়েছি। তবে তেমন কিছু নয়। তাঁর উপহার হ'ল একখানা কোরাণ শরিফ!

—কোরাণ শরিফ! যুবক হো হো ক'রে হেসে উঠে। সে সঙ্গে নাসিরও। কি বিশ্রী হাসি ওদের মুখে। কোরাণ শরিফ আবার কেউ উপহার দেয় নাকি?

মিনা শান্ত কণ্ঠে বলে—হ্যাঁ, তাঁর মতে ওই গ্রন্থই নাকি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপহার।

যুবক উত্তর দেয়—অবাক করলেন দেখছি। অদ্ভুত সেকেলে মানুষ ত! কিন্তু শুনেছি তিনি নাকি এম, এ, ফাষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট।

—হ্যাঁ। ফিলজফিতে।

—ও, তাই বলুন। ফিলজফারগুলো নেহায়েৎ সেকেলে।

নাসির বাধা দিয়ে বলে—সেকেলে ফিরে! সবগুলোইত বদ্ধ পাগল। শুধু বড় বড় কথা! Idea of God, Idea of soul, Idea of mind. Difference between soul and mind' বাপ্‌রে বাপ। যত সব পাগলের চিন্তা।

যুবকটি উত্তর দেয়—সত্য, ওসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করা নেহাৎ পাগলামী। ওমর খৈয়াম ঠিকই বলেছেন—Eat, drink and be merry—খাও দাওস্ফুর্তি কর।

মিনা প্রতিবাদ করে—আমি কিন্তু ওমরের সংগে একমত নই। শুধু Eat drink and be merry—আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি চাই অগ্রগতি। চারপাশের বাধা ঠেলে উঠ্‌তে চাই উন্নতির চরম শিখরে।

নাসির উদ্ভাসিত মুখে বলে—সত্যি আজ আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারিনে। বড় হবার এমন দুর্ব্বার আকাঙ্খা না থাকলে কি জগতে মহৎ হওয়া যায়? আপনার অনিবার্য অগ্রগতি কেউ রুখতে পারবে না।

মিনা সজাগ হয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে—আমি এবার স্থির সংকল্প নিয়েছি। মিঃ মুন্সিকে বলবেন আমি রাজী।

—কিন্তু আপনার স্বামী বা আব্বার মতামত?

—তাদের মতামতের প্রয়োজন হবে না। কোনদিন কারও মতামতের জন্য মিনা অপেক্ষা করে না।

নাসির উত্তর দেয়—এর নামই স্বাতন্ত্র্য—এর নামই স্বাধীনতা। কিন্তু—কি যে একটা বিয়ে করলেন! আপনার দেহের আর মনের ঐশ্বর্যের পাশে একটা জংলীর অবস্থান বড়ই দৃশ্যকটু। একেবারে matchless—যাকে বলা যায়, বানরের গলায় মুক্তোর মালা!

বিমনা হয়ে পড়ে মিনা। নাসিরের কথাগুলো তার জীবনের

ব্যর্থতায় প্রতি ব্যঙ্গ স্বরূপ। ছাইচাপা মনের আগুন স্ফুলিঙ্গ নিয়ে জ্বলে ওঠে। মিনা অস্থিরতা প্রকাশে বলে—না, না। ওসব বাজে চিন্তার অবসর আমার নেই। হ্যাঁ, আমার জন্য আলাদা একটা বাড়ীর বন্দোবস্ত করতে হবে কিন্তু।

—নিশ্চয়ই। মিঃ মুন্সিকে সেকথা বলেছি। আমার বেলেঘাটার বাড়ীতে ইচ্ছা করলে—

—না, না। সেখানে নয়। টালিগঞ্জের কোনবাগান বাড়ীর সন্ধান দেখুন। আমি সেখনেই থাকতে চাই।

—বেশ, তাই হবে।

(৪)

সংসারের একদিকে একজন ঘর ভেঙ্গে বাইরে যাবার জন্য উৎকণ্ঠিত, অন্যদিকে আর একজন তরুণ তার ঘর বাঁধার জন্য আগ্রহশীল। একজন বিলাস প্রাচুর্য্যের মাঝে হাঁপিয়ে উঠেছে, আর একজন দারিদ্র্যের কশাঘাতে নিজত্ব বজায় রাখতে অসহায় হয়ে পড়েছে। একজনের প্রেমের বাজারে এসেছে বিচ্ছেদ, আর একজন অজানার মাঝে খুঁজছে একান্ত ক'রে জানার সুযোগ।

দারিদ্র জীবনের সহজ গতিকে করে বিব্রত ও বিড়ম্বিত। লাখো কোটি মানুষের অসাফল্যের কৈফিয়ত দেয় দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্যের চাপে নিপিষ্ট হয়ে অনাথ, অসহায় সফিকে আশ্রায় নিতে হয়েছে হুগলীর এক সার্কেল অফিসারের বাড়ীতে। গৃহকর্ত্রী হামিদাবানু সফিকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন। সফির বিনয় নম্র স্বভাবের মাধুর্য্য তঁকে মুগ্ধ ক'রে রাখে।

হামিদাবানুর দশম বর্ষীয়া কন্যা আয়েশাকে পড়াবার ভার গ্রহণ করেছিল সফি প্রায় চার বছর আগে। সেই থেকে সে এ সংসারে সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত! এখন সে এ সংসারেরই একজন। নিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার অধিকার দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হয়ে। এ অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্তরালে আর এক প্রচ্ছন্ন সত্য তাকে নাগপাশে আবদ্ধ করেছে। কিশোরী চঞ্চলা আয়েশা তার জীবনের চারপাশে বিস্তার করেছে মোহের জাল। অজ্ঞাতে, অলক্ষিতে উভয়ের মাঝে যে আন্তরিকতা গ'ড়ে উঠেছে তা আজ প্রেম রূপে প্রকাশ পেতে চায়। আয়েশার চঞ্চলতা, গতি ছন্দ, অঙ্গ সুষমা—তার হাসি, বাণী, চাহনী,—তার স্পর্শে জাগরিত প্রতিটি বস্তু সফিকে দেয় বিপুল ঐশ্বর্য্যের সন্ধান। সেকি অদ্ভুত দৃষ্টি আয়েশার চোখে! কী সুন্দর, সুঠাম, সুগোল মসৃণ তার প্রতিটি অঙ্গ। ললাট সীমান্তে ঘনকৃষ্ণ কেশের বিরাট সমাবেশ। মোহিনী অঙ্গরাগে কিসের দুরন্ত আহ্বান? মেহেদির খুনে আঙ্গুলের ডগাগুলো রঞ্জিত।

ওমুখে কি সুধা, ও চোখে কি মায়া, ও বুকে কি প্রেম, ও বাহুতে কি আবেষ্টন মায়া? আয়েশার ঐশ্বর্য্যবহুল হৃদিচত্বরে আছে কি সফির বিলাস চরিতার্থের বিপুল আহবান ইঙ্গিত? আছে কি সেখানে সেবিকার, দয়িতার, অবগুণ্ঠনবতী জননীর বিস্তৃত বিশাল মিনতি—আহবান?

সফি এম্‌নি ক'রে চিন্তা করে অনেক কিছু। কিন্তু সংশয় আর ভয় তার চিন্তার ধারাকে করে ব্যাহত, তাকে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার ব্যর্থ পরিনাম দেয় স্মরণ করিয়ে। অসহায় দরিদ্র সে। তার পক্ষে এ অসাধ্য সাধনের চেষ্টা ব্যর্থ—এ আকাশ-কুসুম।

তথাপি সফি যে দিনে দিনে আয়েশার মাঝে সত্তাহীন হয়ে ডুবে গেছে। আয়েশার অনাঘ্রাতা প্রস্ফুটিত যৌবন তাকে একান্তে পাবার নেশায় পাগল ক'রে তুলেছে। সফি নাগালের বাইরের

দুষ্প্রাপ্য বস্তুকে ভালবেসেছে। সে আজ সত্যি মোহমুগ্ধ।

আনোয়ার চৌধুরীর সম্পাদনায় নতুন মাসিক পত্রিকা 'ইন্ধন' কলকাতার বাজারে সুনাম অর্জ্জন করেছে। গত মাসে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—"জীবনে বড় হবার সাধ যার প্রবল তাকে কোন জটিল পরিবেশ আটকাতে পারে না। প্রেম, ভালবাসা এবং জাগতিক কোন ঐশ্বর্য্য তাকে উচ্চাসন থেকে নামিয়ে পথের ধুলোয় মেশাতে পারে না। কাম্যবস্তু পাবার মাঝেই জীবনের সার্থকতা নয়—গন্তব্যস্থানে পৌঁছালেই যাত্রার শেষ নয়। থাকে আরও কাম্য আরও তৃপ্তিসুখ, আরও দীর্ঘ যাত্রার পথ। সে পথের ধারে প্রয়োজনের খাতিরে যা পাও, তা কুড়িয়ে নাও, যা আবর্জনা বলে মনে হয়, তা ফেলে দাও। শুধু পাবার আনন্দে আর বিচ্ছেদের হাহাকারে অভিভূত হয়ে যাত্রা তোমার থামিও না কোনদিন। পিছনে তোমার পথ নয়—স্থানুর মত নিশ্চল হায়ে থাকাও জীবন নয়! যাত্রা তোমার সম্মুখপানে। পৃথিবীকে সুস্থ, সবল, ও সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলার মাঝেই জন্মের সার্থকতা।

সেই সার্থক জীবনই সফির লক্ষ্য। দুর্ব্বার গতিতে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলাই তার কাম্য। তার চলার পথ বন্ধুর, দুর্গম, পাথেয়হীন কিন্তু আশার আলোয় সে-পথ প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল।

তথাপি বাস্তব জীবনের রূপ আলাদা। বস্তু জগতের মায়ার উর্দ্ধে সাধারণ মানুষের গতি অত সহজ নয়। পৃথিবীর কর্ম্ম কোলাহল ছাপিয়ে ঐশী বাণী ক'জনার কানে পৌঁচেছে আজ পর্যন্ত? মানুষ নিজের দোষগুণ বিচার ক'রে দেখে না। অথচ আপন অনুভূতির মাপ কাঠিতে সে চায় অপরকে যাচাই ক'রে দেখতে। ফলে মানুষ হয় পরশ্রীকাতর ঈর্ষাপরায়ণ, লোভী। স্বার্থপরতার হয় প্রসার। এতে আসল বস্তু কতখানি পায় তা সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে দেখে, না সে। যে দেখে, সে বিপুল ঐশ্বর্য্য ফেলে দেয়

পথের ধুলোয় চলে যায় সে গহন অরণ্যে অথবা পার্ব্বত্য পথে—লোকালয়ের বাইরে। নিঃসীম, জনবিরল মরুপ্রান্তরে সে ছুটে যায় আপনাকে চিন্‌তে-জীবনের দেনা পাওনার খতিয়ান নিয়ে লাভ ক্ষতির অঙ্ক কষতে।

কিন্তু সে ত সাধারণ মানুষের জন্য নয়। হাসি কান্নার স্থূল পৃথিবী নিয়েই সাধারণ মানুষের খেলা। তাই তারা চিরকাল ধরে চেয়েছে ভোগের সামগ্রী, উপভোগের পরিবেশ সম্ভোগের আবেশ। সাথে সাথে তারা পেয়েছে দুর্ভোগের ব্যথাভার—ফেলেছে হতাশার অশ্রুধারা।

তারা যে মানুষ। পৃথিবীতে আগমন তাদের ভুলের মাঝ দিয়ে। জাগতিক ধরা-ছোঁয়ার উর্ধে তারা নয়।

সফি তাদেরই একজন। জীবনের নানা স্তরে আসে নানা সুর নানা ঢেউ-তরঙ্গ। সফির যৌবন দোলাতেও লেগেছে রঙ। তার চারপাশে দানা বেঁধে উঠছে প্রেম, ভালবাসা আর ইন্দ্রিয় লালসার লোলুপতা। উদ্ভিন্ন যৌবনের সাধারণ ধর্ম্ম এ-ই। এর ব্যতিক্রম যার জীবনে, সে অতিমানুষ অথবা অমানুষ। এ দু'য়ের মাঝখানে যে শুধুই মানুষ, তার জীবন নিয়েই আমাদের কাহিনী। সেই সাধারণ মানুষের চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য আহবান, অজস্র দেওয়া-নেওয়ার খেলা—হাসি-কান্নার রূপালী মেলায় তার নশ্বর জীবনের যাত্রাঅভিনয়। সাগরের উর্ম্মিমালার মত জীবন বৈচিত্র্যময়। আঘাত আর প্রতিঘাতে সংসারের কত যে রূপের সৃষ্টি হয় অরূপের দরবারে তার সংখ্যা নির্ণয় অসম্ভব। এক কণা বীজের মাঝে সহস্র শাখা-প্রশাখার মহীরুহ যেন সুপ্ত থাকে, এক বিন্দু জলের মাঝে মহাসাগরের গর্জ্জন যেমন নিঃশব্দে লুকিয়ে থাকে, এক ঝলক শীতের রোদে যেমন সাহারা সৃষ্টির তেজ নিহিত থাকে—তেমনি একটুখানি চাপা দীর্ঘশ্বাসের মাঝে কত যে অন্তর্বেদনা মিশ্রিত থাকে তার ইয়ত্তা

নেই। প্রলয় প্রভঞ্জনেও সে ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাসের মত ধ্বংসশক্তি নেই। নিদাঘের তপ্ত লু'তে মানুষের অন্তর্দ্দাহের সমতুল্য প্রদাহ নেই। অথচ প্রেম ও প্রীতির আবেশে সারা পৃথিবীতে আছে পাবার উদারতা। চাঁদের কিরণে, ফুলের সুবাসে, মলয়ের পরশনে, নদীর কল্লোলে সাগরের কলরোলে, বনের মর্ম্মরে—পাহাড়ের কঙ্করে—এমন কি মৃত্যুর অন্তরালেও লুকিয়ে আছে প্রেম।

ভালবাসাই ত প্রেম। যার অন্তরে ভালবাসা নেই, সে যে পশুরও অধম। সফি সেই ভালবাসারই কাঙাল।

বর্ষণ-মুখর শ্রাবণ দুপুর। অবিশ্রান্ত ধারায় আকাশের কান্না শুরু হয়েছে। শহরের রাস্তাগুলো বৃষ্টির জলে ভর্ত্তি। বিশ্রী সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছে পাশের আবর্জ্জনা স্তূপ থেকে। বৃষ্টির ক্ষণিক বিরতির ফাঁকে সফি ঘরে ফিরে এলো। সমস্ত গৃহ নিস্তব্ধ। কক্ষগুলো জনশূন্য। কিন্তু সদর দরজা আজ খোলা কেন? কক্ষগুলোই বা তালাবদ্ধ নয় কেন।

সফি বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে প্রবেশ করে। জনশূন্য গৃহ তাকে আরও বিস্মিত ক'রে তোলে। কিন্তু তার সন্দেহ বিস্ময় কেটে যায় আয়েশার কক্ষে এসে। প্রকাণ্ড ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যস্ততা সহকারে নানা প্রসাধন মাখছে আয়েশা। সুবেশা, তন্বী সুন্দরী আয়েশা। সারা দেহে তার উদ্দাম ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ।

আয়নায় প্রতিফলিত হয়েছে সফির পূর্ণ অবয়ব। আয়েশাও সফির নিদারুণ নৈকট্য! বিস্ময়াবিষ্টের মত ঘুরে দাঁড়ায় সে। বলে —কলেজ থেকে পালিয়েছ বুঝি? নইলে—

সফি উত্তর দেয় না। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে শুধু। এত সুন্দর আয়েশা—এত অপরূপ সে! আজ কি নতুন রূপে জন্ম নিল তার মানস-সুন্দরী।

আয়েশার মনেও ধরেছে বসন্তের রং—জীবনে জেগেছে উন্মত্ত দোলা—শিহরণ তার প্রতিটি অঙ্গে।

চটুল হাসি হেসে প্রশ্ন করে সে—অমন ক'রে তাকিয়ে কি দেখছ সফি ভাই?

সফির চমক ভাঙে। বলে—দেখছি, দেখছি তোমাকেই।

—হুঁ! এতদিন দেখনি বুঝি?

—দেখেছি। কিন্তু এত সুন্দর রূপে তোমায় দেখিনি কোনদিন। তোমার আজকার এ মোহিনী রূপ আমায় কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে জানো?

আয়েশা প্রশ্ন করে—কিসের?

আমার অনাগত ভবিষ্যতের—কি এক মধুময় জীবন-খেলার। কিন্তু সে খেলা কি দেখতে পারবো না আশা? আমার স্বপ্ন কি সার্থক হবে না কোনদিন?

—কিসের স্বপ্ন?

—জীবনের। তোমার আর আমার জীবন-যাত্রার।

আয়েশা সহাস্যে উত্তর দেয়—কি সব হেঁয়ালি কর বোঝা ভার। থাক ও কথা। তার চেয়ে পাতালপুরীর সেই গল্পটা বল না সফি ভাই।

—কোন গল্প?

—সেই রাজপুত্তুর আর রাজকন্যার।

—বেশ, শোন। রাজপুত্তুর ফুল কুড়িয়ে আনতো আর রাজকন্যা আপন মনে ব'সে ব'সে মালা গাঁথতো।

আয়েশা প্রশ্ন করে—মালা গেঁথে কি করতো রাজকন্যা?

—রাজপুত্রের গলায় পরিয়ে দিত।

—তারপর?

—তারপর রাজপুত্তুর ছোট্ট একটা চুমু দিত রাজকন্যার মুখে।

আয়েশার মনেও ধরেছে বসন্তের রং—জীবনে জেগেছে উন্মত্ত দোলা—শিহরণ তার প্রতিটি অঙ্গে।

চটুল হাসি হেসে প্রশ্ন করে সে—অমন ক'রে তাকিয়ে কি দেখছ সফি ভাই?

সফির চমক ভাঙে। বলে—দেখছি, দেখছি তোমাকেই।

—হুঁ! এতদিন দেখনি বুঝি?

—দেখেছি। কিন্তু এত সুন্দর রূপে তোমায় দেখিনি কোনদিন। তোমার আজকার এ মোহিনী রূপ আমায় কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে জানো?

আয়েশা প্রশ্ন করে—কিসের?

আমার অনাগত ভবিষ্যতের—কি এক মধুময় জীবন-খেলার। কিন্তু সে খেলা কি দেখতে পারবো না আশা? আমার স্বপ্ন কি সার্থক হবে না কোনদিন?

—কিসের স্বপ্ন?

—জীবনের। তোমার আর আমার জীবন-যাত্রার।

আয়েশা সহাস্যে উত্তর দেয়—কি সব হেঁয়ালি কর বোঝা ভার। থাক ও কথা। তার চেয়ে পাতালপুরীর সেই গল্পটা বল না সফি ভাই।

—কোন গল্প?

—সেই রাজপুত্তুর আর রাজকন্যার।

—বেশ, শোন। রাজপুত্তুর ফুল কুড়িয়ে আনতো আর রাজকন্যা আপন মনে ব'সে ব'সে মালা গাঁথতো।

আয়েশা প্রশ্ন করে—মালা গেঁথে কি করতো রাজকন্যা?

—রাজপুত্রের গলায় পরিয়ে দিত।

—তারপর?

—তারপর রাজপুত্তুর ছোট্ট একটা চুমু দিত রাজকন্যার মুখে।

রাজকন্যা তখন কি বলতো জানো।

—কি ?

—বলতো—ওগো রাজপুত্তুর আমিও তোমায় ভালবাসি।

আয়েশা বাধা দেয়—ছাই বলতো। রাজপুত্তুর চুমুও দিতনা, আর রাজকন্যা অমন কথাও বলতো না। ওসব মিছে কথা।

সফি প্রতিবাদ করে—মোটেই মিছে নয়। রাজপুত্তুর তাকে যে সত্যি ভালবাসতো।

আয়েশা নিরুত্তরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। সফি কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে—মা কোথায়।

আয়েশা সবিস্ময়ে উত্তর দেয়—তা বুঝি জাননা ? নীরুর বিয়ের লোকজন এসেছে। মা ওদের বাড়ী গেছেন।

—হুঁ ! কিন্তু রাজকন্যা যায়নি কেন ?

চটুল হাসি হেসে আয়েশা বলে—রাজকুমার আসবে বলে। আয়েশা ছুটে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু সফি তার পথ আগলে দাঁড়ায়। বলে—সত্যি ক'রে বল, একি তোমার মনেরকথা ?

আয়েশা অদ্ভুত ভঙ্গীতে বলে—মনের কথা মনেইথাক। ও সব শুনে তোমার কাজ নেই। এখন ঘরে রইলে ত ? আলমারীর চাবি দেওয়া ছিলনা তাই এসেছিলাম। চোরের যা উপদ্রব।

—চোর আবার কবে আসে ?

—আসে গো মহাপণ্ডিত, আসে।

সফি উত্তর দেয়—হ্যাঁ, তা হয়ত আসে ! আজও কিন্তু এক চোর এসেছে। সে বাক্সের টাকা নেবেনা, নেবে অন্য কিছু।

—কি ? আয়েশা কাছে এসে দাঁড়ায়।

রূপ কথার জীবন্ত রাজকন্যা সফির একান্ত নিকটে। মধুর মায়াময় হরিণ চোখ আয়েশার—কী সুগোল, সুঠাম, ভঙ্গিমাময়ী গ্রীবাদেশ—তুষারধবল বাহুপেলব ! এ যে খোদার অপরূপ সৃষ্টি।

মোহিনী আয়শাকে নির্জনে একান্ত কাছে পেয়ে সফি চঞ্চল হয়ে ওঠে। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা, গৃহ অভ্যন্তর প্রতিবন্ধকতা শূন্য। এ অপূর্ব্ব সুযোগ মুহূর্তে প্রাণ হ'তে প্রিয় কামনার জনকে জীবনের কষ্টি পাথরে যাচাই করে দেখতে দোষ কি?

ক্ষণিকে এতসব চিন্তা ক'রে সফি ক্ষিপ্র হস্তে আয়েশার একখানা হাত আপন মুঠায় আঁকড়ে ধরে। আবেশে তাকে কাছে টেনে প্রদীপ্ত মুখে বলে—তুমি আমায় কথা দাও আয়েশা। বল, আমার হবে—শুধু আমার?

নতমুখী আয়েশা ক্ষীণ প্রতিবাদ করে—ছাড়।

সফি দীর্ঘশ্বাসে বলে—জানি তুমি আমায় ভুলে যাবে। বড় ঘরের মেয়ে তুমি? ভবিষ্যতে কত বড় হবে—উচ্চ হবে তোমার স্থান। আর আমি কত নিচে পড়ে থাকবো।

সফির বেদন-ভরা আবেদনের সুর আয়েশার অন্তরে ব্যথার সঞ্চার করে। বলে—না, না। তুমি কেন ছোট হয়ে থাকবে? মেধাবী ছাত্র তুমি। কত তোমার নাম ডাক। ভবিষ্যৎ জীবনে তুমি কৃতি মানুষ হ'ও—সেই কামনাই করি।

—কিন্তু সেদিন পর্যন্ত কি তুমি থাকবে আমার জন্য?

আয়েশা উত্তর দিতে পারেনা। এ যে কঠিন প্রশ্ন। শান্ত চোখে সফিকে লক্ষ্য করে সে নতমুখী হয়। অন্তর তার উদ্বেল। কণ্ঠ ভারী, আঁখিপাতা আদ্র। প্রতিশ্রুতি! যদি ব্যর্থতা আসে জীবনে আয়েশা আর ভাবতে পারে না।

গত চার বছর ধ'রে উভয়ের পরিচয়। এ পরিচয়ের অন্তরালে আন্তরিকতার শত শিকড় গজিয়েছে শতভাবে। সফি আয়েশার গৃহশিক্ষক। আয়েশা তাকে শ্রদ্ধা করে, মনে মনে হয়ত বা ভালও বাসে। সেই শিক্ষকের—সেই ভালবাসা জনের আকাঙ্খা তলে বিব্রত হয়ে পড়ে কিশোরী আয়েশা।

নিস্তব্ধ গৃহ। গুঁমোটবদ্ধ মৌনতা বিরাজ করে কিছুক্ষণ। সফি শান্ত কণ্ঠে বলে—তুমি ত জান আমার অন্তরের কথা। কত ভাল তোমায় বাসি আমি।

আয়েশা নত পল্লবে উত্তর দেয়—কিন্তু আমি কি বুঝি, বল? তুমি আমার শিক্ষক। আমার সমস্ত জ্ঞানের স্তরে স্তরে তোমার ছোঁয়াচ লেগে আছে। তুমি আমার আদর্শ—অনেক বড়। আমি মেয়ে মানুষ। জীবনে কোথাও, কোন অজানার স্রোতে ভেসে যাব কে জানে। মেয়েদের কোন নির্দিষ্ট গন্তব্যপথ নেই! আলোকলতার মতই তাদের আশ্রয় নিতে হয় পুরুষদের বাহুতলে। তোমার সে বাহু ত দুর্ব্বল নয়।

—জানি। কিন্তু তবু মন যে আশা—নিরাশায় দুলে ওঠে।

আয়েশা এবারে কাছে এগিয়ে যায়। বলে—আমাকে তুমি কি ভাবো, বলত? আমিও রক্তমাংসে গড়া মানুষ। আজ শুধু এইটুকু জেনে রাখ, আমি তোমায় ভুলবো না কোনদিন। তোমার গৌরবের মাঝে যেন আমার সৌরভ আশ্রয় খুজে পায়।

আকস্মাৎ সফির পায়ের উপর ঝুঁকে পড়ে আয়েশা! সশ্রদ্ধ ছালাম জানিয়ে উঠে দাঁড়ায় কোন অনাগত বধূ! কোন ভবিষ্যৎ স্বামী জীবনের তটভূমে হতবাক হয়ে, নিশ্চল, হয়ে স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আছে? সৃষ্টি কি এমনিভাবে পবিত্র চাওয়ার মাঝে নেমে আসে দেবার হাত বাড়িয়ে?

সজল আনন্দ কাদের দু'চোখে? কারা অতৃপ্ত বক্ষ মিলিয়েছে পরস্পরে! কাদের আলিঙ্গন-অনুভূতিতে বিশ্ব আত্মায় জেগেছে মহা আলোড়ন! ওষ্ঠপদ্ম মাঝে মিলেছে ওষ্ঠ—স্পন্দনে মিশেছে স্পন্দন। একি মহা মিলন ওদের! যৌবনের জাগরণে এত সুখ! জীবনের উদ্দাম গতি এত উন্মুখ—শিরা উপশিরায় এত শিহর-মাদকতা!

সফির দুরন্ত চুম্বনতলে রাঙা হয়ে ওঠে আয়েশা। নিপীড়িত

কিশোরীর সৌন্দর্য্য বাড়ে উত্তেজনার চাপে—লহর জাগে যৌবন তটে। এ সুখের অন্ত নেই—এ সুখের তুলনা নেই। এ সুখ জীবদেহকে আত্মহারা করে! এ সুখের মোহ দূরন্ত—বেপরোয়া।

(৫)

রিজেণ্ট পার্কের কুঞ্জবীথিতলে সুন্দর দ্বিতল বাড়ী! বাড়ীর বহিপ্রাঙ্গণে মৌসুমী ফুলের বিচিত্র সমাবেশ। চতুষ্পার্শ্বে দেবদারু গাছের সতেজ সারি—মাঝখানে শুভ্র-সুন্দর আধুনিক ধরনের অট্টালিকা। দ্বিতলের সুসজ্জিত কক্ষে মিনা কুশন চেয়ারে উপবিষ্টা। প্রশান্ত চোখে রোষের বহ্নি প্রকাশ। বিরক্তিতে পূর্ণ মুখমণ্ডল। পার্শ্বে নতমস্তকে শহীদ—শত অপরাধে ভেঙ্গে পড়া শহীদ। উভয়ের মাঝে কি যেন বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেছে একটু আগে।

মিনা অধরে ওষ্ঠ চেপে সংযত কণ্ঠে বলে—আমাকে এমনিভাবে পাবার আকাঙ্খা তোমার মাঝেও জেগেছে? আশ্চর্য! কোন মেয়ের সান্নিধ্যে আসার অর্থ যদি তার দেহকে পাওয়া মনে করো, তবে আমার কাছে নিরাশ হ'তে হবে। নরনারীর যৌন বৃত্তিকে আমি জঘন্য এবং কুৎসিত বলে মনে করি। পাশবিক জৈব অনুভূতিই জীবন নয়। ওসব নোংরামি আমি পছন্দ করিনে।

শহীদ নতমস্তকে নীরব থাকে। মিনা আবার বলে—ছিঃ! ছিঃ! এমন নোংরা মনের পরিচয় দেবে ভাবতেও ঘৃণা বোধ হয়। তুমি আমাকে এমনভাবে আক্রমন করতে পার তা স্বপ্নেও কোনদিন চিন্তা করিনি।

শহীদ এবারে শান্তকণ্ঠে উত্তর দেয়—তুমি যা স্বপ্নেও চিন্তা করনি, আমি তারই চিন্তা করেছি দিনের পর দিন।—আজ বাস্তব ক্রিয়া হয়ে গেছে মাত্র। কিন্তু একটা কথা আমি বিশ্বাস করি। একান্ত ক'রে চাওয়ার মাঝে কি কোন সত্যই নেই? জীবদেহে কামনার পরিতৃপ্তির মাঝেই আত্মার তৃপ্তি। ভোগ-উপভোগে সার্থকতাই জীবন। সুতরাং আমি অন্যায় বা ভুল করিনি।

মিনা বাধা দেয়—থামো। অর্ব্বাচীনের ন্যায় যা'তা ব'লো না। তুমি ভেবেছ আমি নারী, সুতরাং ভোগের সামগ্রী। মনে রেখো জগতের অন্য নারীদের থেকে আমি স্বতন্ত্র! পুরুষের দেহতলে আমার আত্মসমর্পন যারা চিন্তা করে তারা দুঃস্বপ্নই দেখে। তাদের চরম আঘাতই দিয়ে থাকি আমি।

শহীদ উত্তর দেয়—হ্যাঁ, সেই আঘাতই তুমি আমায় দিয়েছ। এবং কেন দিয়েছ তা ও আমি জানি। নাসিরের প্রতি তোমার আসক্তিই তার একমাত্র কারণ।

মিনা গর্জ্জে ওঠে—এতবড় দুঃসাহস তোমার কবে থেকে হ'ল? ব্যর্থ প্রেমিকের উচ্ছাস এমনি হীন মনেরই পরিচয় দেয়। তুমি বেরিয়ে যাও ঘরে থেকে। যাও বলছি।

এমনি সময়ে নাসিরের গাড়ী এসে থামে নিচে। অর্থশালী, সম্পদশালী' সুপুরুষ নাসির। কী মূল্যবান পোষাক ওর! কত সতেজ, সুন্দর, বলিষ্ট দেহ! পয়সা! হ্যাঁ, পয়সা। পয়সা থাকলে কি না হয়! পয়সার জোরে নাসির মিনার অন্তর জয় করতে চায়। কিন্তু মিনা যে নারীদেহে পুরুষ—পৃথিবীর মহা ব্যতিক্রম।

নাসির গৃহ-অভ্যন্তরে এসে দাঁড়ায়। সুন্দর সহাস্য সে মুখ। তার আগমনে সঙ্গে সঙ্গে শহীদ গৃহ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়। অন্তরে তার ব্যর্থতার ক্লেদ, পরাজয়ের গ্লানি।

অভ্যর্থনার সুর ওঠে মিনার কণ্ঠে—আসুন, আসুন। এমন

অসময়ে আপনি ত কখনো আসেন না নাসির সাহেব ?

নাসির উত্তর দেয়—সত্যি, তাই। কিন্তু আজ আসতেই হ'ল। আর সেও আপনারই জন্য।

—আমারই জন্য !

—হ্যাঁ ! আপনাকে দেবো বলে একছড়া মুক্তার মালা কিনে এনেছি ! তাই—

মিনা বিস্ময়মাখা কণ্ঠে উচ্চারণ করে—মুক্তার মালা ! কি হবে ও দিয়ে ? ওসব কেন কেনেন বলুন ত ?

—কেন কিনি তা নিজেই বুঝিনা। নিজের অজ্ঞাতসারে আজও কিনেছি। কিনে ভাবলাম, এ মালা আপনার কণ্ঠেই শোভা পায়।

—সত্যি নাকি ? আমার কণ্ঠ কি এতই স্বতন্ত্র ?

—তা যদি বলেন তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনার প্রতিটি অঙ্গে স্বাতন্ত্রের ছাপ। আপনি যে কত সুন্দর তা জানেন না—তাই। আর জানবেন কি ক'রে ? সোনা যদি নিজের লোভনীয় রূপ সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকতো তাহলে প্রতিটি মানুষের আকাঙ্ক্ষার তলে তাকে খণ্ডিত হতে দিত না। ধারালো অস্ত্র তার বুকে ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারতো না।

মিনা মৃদু হাসি ফুটিয়ে বলে—তেমন কোন অস্ত্র আমার জন্যও শান দিচ্ছেন নাকি ? আমি কিন্তু সোনা নই, স্বচ্ছ কাঁচখণ্ড মাত্র। যে অস্ত্রে সোনা কাটা হয় তা দিয়ে কাঁচ কাটা যায়না নাসির সাহেব ! কাঁচকে কাটতে হলে হীরের ধারের প্রয়োজন। নইলে অন্য অস্ত্রে কাটতে গেলে কাঁচ শতধা বিভক্ত হ'য়ে অস্ত্রধারীকেই বিদ্রূপ করে। যাক্। দিয়ে যান মুক্তোর মালা। কিন্তু আমাকে এসব দেবার আগে আপনার স্ত্রীর কথা ভেবেছেন ?

নাছির ত্বড়িত গতিতে উত্তর দেয়—ও মাই গড্ ! তার জন্য আমার মোটেই ভাবতে হয় না। আমার যথেষ্ট আছে। কত আর নেবে সে ?

মিনা কটাক্ষ ক'রে বলে—অফুরন্ত ভাণ্ডার নাকি? দেবার হাত চিরদিন খালি হয়। কিন্তু নেবার ঝুলি পূর্ণ হয় না কোনদিন। মানুষের পাবার আকাঙ্ক্ষা অপার। দেবার বেলায় সে কিন্তু নিতান্ত সীমাবদ্ধ।

নাসির সহাস্যে উত্তর দেয়—আপনার সঙ্গে তর্কে চিরদিন হার মেনেছি। কি যে আপনার ব্যক্তিত্ব। এবারে ত চিত্রাভিনেত্রী হ'তে চলেছেন। তাই আপনাকে পাবার স্বপ্ন দেখাকেও আমি সার্থক মনে করি। আমার সমস্ত ঐশ্বার্য্যের বিনিময়ে, সমস্ত সুখের মাঝে আপনার জন্য সাজাতে চাই বাসর শয্যা।

নাসিরের আত্মপ্রকাশে মিনা স্তম্ভিত হয়। কিন্তু সংযত কণ্ঠে বলে—অদ্ভুত উদারতা আপনার। অদ্ভুত ত্যাগ। ত্যাগের মাঝে যারা ভোগের সার্থকতা খোঁজে তারা এমনি নির্লজ্জ ভাবেই চিন্তা করে। সর্ব্বস্ব বিলিয়ে আমার জন্য বাসর না সাজিয়ে একটা কবর খুঁড়তে পারেন না?

—তাও পারি, যদি—

—যদি একই কবরে আপনার আর আমার দেহ পাশাপাশি স্থান পায়, এই ত? আশ্চর্য্য। মনে হয় মৃত্যুর পরপার পর্য্যন্ত আপনার আকাঙ্খার প্রসারতা। মিঃ মুন্সীও ঠিক এমনি ভাবেই কি যেন বলতে চান।

—মিঃ মুন্সী!

—হ্যাঁ। আশ্চর্য্য হ'লেন বোধ হয়? শহীদও বাদ পড়েনি। ষ্টুডিওর প্রতিটি মানুষের চোখে তীব্র কামনার মাদকতা। রাস্তায় হাজার হাজার লোকের দৃষ্টি আমার প্রতি।

আকস্মাৎ এ মুহূর্ত্তে মিঃ মুন্সী গৃহে প্রবেশ করেন। চোখে মুখে তাঁর দারুণ উদ্বেগ—ডুবিয়ে ছাড়বে। সব ডুবিয়ে ছাড়বে।

—কি হ'ল, মিঃ মুন্সী? নাসির প্রশ্ন করে।

মুন্সী নাসিরের প্রতি কঠিন দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে এগিয়ে গিয়ে মিনার সামনে একখানা পত্র ধরেন। বলেন—পড়তে দিন আগে। তারপর জানতে চাইবেন, কি হ'ল।

পত্র পাঠ করে মিনা স্তব্ধ-বিস্ময়ে ব'সে থাকে। মিঃ মুন্সী বলেন কি ভয়ঙ্কর কথা ভাবুন দেখি। এ যে ভয়ানক অভিযোগ 'ইন্ধন' পত্রিকাকে সবাই ভয় করে। আর তারই জাদরেল সম্পাদক করেছেন অভিযোগ!

নাসির সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—অভিযোগ? কিসের?

—কিসের তা এখনো বুঝতে কষ্ট হচ্ছে নাকি? মশায় পরস্ত্রী ফোঁসলানোর অভিযোগ। মিঃ আনোয়ার চৌধুরীর বিনা অনুমতিতে তাঁর স্ত্রী মিনাকে কেন ফিল্মে নামিয়েছেন তারই কৈফিয়ৎ। কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক না হ'লে বিশ্রী মামলা রুজু হবে।

নাসির এগিয়ে এসে বলে—ভয়ানক কথা।

—ভয়ানক কথা নয়—সমূহ বিপদ মশায়, সমূহ বিপদ। আগে জানলে এ মেয়েকে কখনো আমার বইতে নামাতাম না। কি বিপদ বলুন দেখি।

মিনা উত্তর দেয়—আমি কি অত ভেবেছি।

—ভাবেন নি ত এখন সামলে নিন। কি মাটি খাওয়া কাজ। আমাকে এখন ব্যবসা ছেড়ে মামলা চালাতে হবে নাকি? যত সব আপদ এসে জুটেছেন আমার কোম্পানীতে। শিক্ষিত ভদ্র ঘরের মেয়ে হয়ে এমন ধোঁকা দেবার অর্থ কি বলতে পারেন?

মিনা প্রতিবাদ করে—কিসের ধোঁকা দিয়েছি?

—'ইন্ধন' পত্রিকার সম্পাদক যে আপনার স্বামী, এ কথা গোপন রেখেছিলেন কেন? জাল জোচ্চুরীর ব্যবসা ভেবেছেন নাকি? পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার খরচ হয়ে গেছে, পঞ্চাশ হাজার!

গৃহতল কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ থাকে। ঢং ঢং করে দেওয়াল

ঘড়িতে সময়ের নির্দ্দেশ দেয়। মিনা মৌনতা ভঙ্গ করে বলে—কি এখন করতে বলেন আমাকে?

—সোজা গিয়ে আপনার স্বামীর অনুমতি নিয়ে আসুন।

—তার সঙ্গে আমি সব সংশ্রব ত্যাগ করেছি।

—কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তিনি হয়ত আপনাকে ত্যাগ করেন নি। শুনুন, আপনি যদি না যান তবে বাধ্য হয়ে আমাকেই তাঁর কাছে যেতে হবে।

মিনা বাধা দেয়—না, না। তার কাছে যাবার প্রয়োজন নেই তার চেয়ে মামলা চলুক।

—কিন্তু পুলিশ-ওয়ারেণ্ট বের হ'লে আপনাকে যে আগ্‌লে রাখাই দায় হবে।

—বলেন কি? আপনাদের মত বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহারথীর দল আমাকে আগলে রাখতে পরেবে না?

নাসির উত্তর দেয়—কেন? আমরা কি মামলা চালাতে অক্ষম। মিনা এখন আমাদের হাতে রয়েছে। চলুক, মামলাই চলুক।

—সেটা আপনার কাম্য হ'তে পারে—আমার নয়। আমাকে আপোসের হাত বাড়িয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে যেতেই হবে!

মিঃ মুন্সী শেষোক্ত কথাগুলো বলে গৃহ ত্যাগ করেন।

ডিরেক্টর মুন্সীর সঙ্গে কয়েকজন যুবক এসেছে, 'ইন্ধন' অফিসে। এদের মধ্যে শহীদের নাম উল্লেখযোগ্য। মিঃ মুন্সী একখানা কাগজ আনোয়ারের সামনে ধ'রে বলেন—এখানা কি আপনার পত্র ?

আনোয়ার পত্রখানা হাতে নিয়ে একবার সবাইকে লক্ষ্য করে। শহীদের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই সহসা তার চোখে মুখে রোষের রেখা ফুটে ওঠে। কিন্তু তবু সংযত কণ্ঠে বলে--হ্যাঁ, আমারই পত্র। আপনিই মিঃ মুন্সী।

—হ্যাঁ

—কি বক্তব্য আপনার বলুন।

—দেখুন, বইখানা অনেক দুর এগিয়ে গেছে, প্রায় আধাআধি এ অবস্থায় আপনি যদি মিনাকে সরিয়ে নেন তা'হলে আমার বিপুল ক্ষতি হ'বে।

—ক্ষতি আমারই কি কম হয়েছে ?

—জানি। কিন্ত, মিনা অদ্ভুত অভিনয় করেছে। তার ভবিষ্যত উজ্জ্বল—আপনারও গৌরব। এমন গৌরবের জনকে অযথা আগলে ব'সে থাকবেন না।

আনোয়ার উত্তর দেয়—কি আশ্চর্য্য ? তাকে যদি আগলে বসে থাকতে পারতাম তা'হলে আপনার কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে পত্র লিখতে হ'ত না। যাক, তাকে নিয়ে ফিল্ম করার আশা আপনাকে ত্যাগ করতে হবে।

—বলেন কি ! এ ক্ষেত্রে আমি কিছুতেই তাকে ছাড়তে পারিনে।

—তাই নাকি ; তা'হলে আমিও তাকে বাইজি নাচ নাচাবার জন্য অনুমতি দিতে পারি না।

—বেশ। কিন্তু আমার পঞ্চাশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ করবে কে বলুন?

আনোয়ার দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দেয় সে কৈফিয়ত কি আমি দেব? আশ্চর্য্য! আপনার জানা উচিত ছিল যে কারও বিবাহিত স্ত্রীকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নামাতে হ'লে তার স্বামীর অনুমোদন দরকার।

—আপনি কি বলতে চান সে জ্ঞান আমার নেই? আসলে ওর যে স্বামী আছে তা আগে জানতে পারিনি।

—তাই নাকি? তা বেশ! এখন জেনেছেন ত? যান, সেই মত কাজ করুন। দেখুন, কতগুলো অভদ্র ছোটলোক মিনাকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে ঘরের বার করেছে। আমি তাদের ক্ষমা করব ভেবেছেন?

শহীদ প্রতিবাদ করে—মাপ করবেন। আপনার স্ত্রীকে কেউ ঘরের বার করেনি। তার মত স্বাধীন মেয়ে নিজেই চলতে জানে।

আনোয়ার দৃঢ়কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে—কখনো জানে না তাকে পথে বের করেছ তুমি আর তোমার সাথী নাসির। অসভ্য লম্পটের দল; কোন সাহসে এসেছ আমার সামনে? বের হয়ে যাও এখান থেকে। নইলে—

শহীদ উঠে দাঁড়ায়। প্রতিবাদ ক'রে বলে—ভদ্রলোকের মত কথা বলুন। অতচোট দেখাবেন না। আপনার মত দু'পাঁচটাকে হজম করতে পারি, তা জানেন?

—হজম! আনোয়ার উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়। রূঢ়-কঠিন কণ্ঠে উচ্চারণ করে—এতবড় সাহস তোমার! মুহূর্তে দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে আদেশের স্বরে বলে—কে আছিস? এখুনি একে ঘারে হাত দিয়ে বের করে দে।

মুহূর্তে পশ্চিমা দারোয়ানের সজোর ধাক্কায় শহীদকে বিশ্রীভাবে অন্তর্হিত হ'তে হয়। মিঃ মুন্সী এ হেন ব্যবহারে উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে

বলেন—আমাদের এমনিভাবে অপমান ক'রে তাড়াবেন নাকি?

—অপমান! বড় মান আপনারা রেখেছেন আমার। রতন দীঘির চৌধুরী বাড়ীর বউকে নিয়ে খুলেছেন ব্যবসা। কোর্টে কেস ক'রে আপনার কোম্পানীকে দেখে তবে ছাড়বো।

মিঃ মুন্সী আঁৎকে ওঠেন—বলেন কি মশায়? একি বিপদ! কত হিঁদু মেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাজার হাজার মেয়ে নিত্য আবেদন জানাচ্ছে ফিল্মে নামবার জন্য। আপনার সৌভাগ্য যে বাংলার ফিল্মে একটা মুসলমান মেয়েকে সুযোগ দিয়েছি। তার পুরস্কার এই অপমান! বেশ। আপনি মামলাই করুন। কোর্টেই ফয়সালা হোক্ সব কিছুর। মিঃ মুন্সী উঠে দাঁড়ান।

—তাহ'লে মিনাকে আপনি ছাড়বেন না।

—ছাড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সে কণ্টাক্ট সই করে নেমেছে বইতে। আমার কাছে তার দলিল রয়েছে।

—দলিল; কোর্টের পরোয়ানা আগে বের হোক্। সবাইকে আমি গ্রেফতার করিয়ে তবে ছাড়ব।

—বেশ। তাই করাবেন।

মুন্সী সদলবলে প্রস্থান করেন। আনোয়ার আপন মনে উচ্চারণ করে—জোচ্চোর বদমায়েসের দল! ঘরের বউ বের করে চালাবেন ফিল্ম ব্যবসা! যতসব ছোটলোকের দল।

এরপর ঘটনা-প্রবাহ অতি দ্রুত এবং উত্তেজনার মাঝে এগিয়ে গেল। আনোয়ার কর্তৃক আনীত মামলার আসামীদের তলব হ'ল। সে সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে শেঠ জাফর আহম্মদও মামলা দায়ের করলেন। উভয় মামলার মাঝখানে পড়ে মিঃ মুন্সী, নাসির এবং শহীদ নিজেদের বিপন্ন মনে করলো। ফৌজদারী মামলার রূপ

যে কত বিশ্রী তা মিনা জানে। সুতরাং সেও নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিব্রত হয়ে উঠলো।

ম্লানমুখে শহীদ বলে—এখন উপায়? আমার মতে মিঃ চৌধুরীকে চিরতরে সরাতে না পারলে সমূহ ক্ষতি হবে।

—হ্যাঁ, আমিও মিঃ চৌধুরীর কেসের কথাই ভাবছি। আব্বার কেসে আমি জবাব দেবো। কিন্তু তিনি যে এভাবে হঠাৎ মামলা শুরু করবেন, ভাবতে পারিনি। মনে হয় এর মূলেও মিঃ চৌধুরীর হাত রয়েছে।

—নিশ্চয়ই রয়েছে। শুনলাম সেই নাকি তোমার আব্বাকে নানা ভাবে উত্তেজিত ক'রে মামলা করিয়েছে।

—তাহ'লে উপায়?

—উপায় আছে! আগামী আর্ট কনফারেন্সে একটুখানি বিষ সব সমস্যার সমাধান ক'রে দেবে। শুধু তোমাকে একটু কঠোর হ'তে হবে। পারবে?

—কেন পারবো না। কিন্তু তাতে যদি তার মৃত্যু হয়?

—হ'লে ক্ষতি নেই। পথ ছেড়ে বিষাক্ত সাপ যদি সরে না গিয়ে উল্টো ফণা তুলে দাঁড়ায় তাহ'লে তার নিধন কামনা করা ছাড়া কি করতে পার, বল? প্রকাশ্য আদালতে সে যে কেলেঙ্কারীর একশেষ করবে। তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে সে হবে বিপুল বাধা! অথচ তেমন বাধা দেবায় কোন অধিকার তার নেই।

—অধিকার! কিসের অধিকার? আমার স্বাধীন সত্তার ওপর কেউ আধিপত্য করতে পারে না। যারা করবার চেষ্টা করে, তারা ক্ষমতার অপব্যবহারই ক'রে থাকে। তা'ছাড়া তার সঙ্গে সম্বন্ধই বা কিসের? বিয়ে? কয়েকজন মানুষের অনুরোধে নিজের অচ্ছিার মাঝে স্বীকারোক্তি করেছিলাম। শুধু 'কবুল' ব'লে মাত্র একটা শব্দ

উচ্চারণ করেছিলাম। সেই সামান্য শব্দের মাঝে এত অধিকার ত আমি স্বীকার করিনে—আর কোনদিন করবোও না। আগামী আর্ট কনফারেন্সই তার নিয়তি নির্দ্ধারণ করুক। তুমি তার ব্যবস্থা কর শহীদ। তার মৃত্যুই আমার কাম্য।

কিছুক্ষণ মৌন থেকে মিনা আবার বলে—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। জীবনে এ কঠিন বাধাকে সরাতে না পারলে আমার মুক্তি কোথায়?

(৭)

সফির জীবনে এসেছে অনেক পরিবর্তন! আয়েশার পিতা বদলী হয়ে মুর্শিদাবাদ চলে গেছেন। যাবার আগে আয়েশাকে একান্তভাবে কাছে পেয়ে সফি বলেছিল—তুমি চলে গেলে আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকতে পারবো না। এমনভাবে আমায় কাঙাল ক'রে চলে যাবে, আশা?

—কি করবো বল? আয়েশা আর বলতে পারেনি।

সফি বেদনা-বিগলিত কণ্ঠে আবার বলেছিল—কত যে আঘাত তোমায় দিয়েছি—পড়াতে ব'সে কত গালি যে বকেছি। সে সব তুমি ভুলে যেয়ো, আশা।

আয়েশা আঁচলে অশ্রু মুছে বলেছিল—একবার দেখতে যেয়ো। যাবে ত?

—নিশ্চয়ই যাবো। তোমাকে, মাকে আর আমিনকে কোনদিনও

ভুলতে পারবো না। যদি কখনো মুর্শিদাবাদে যাই, তবে তোমাদের জন্যই যাবো।

অভিমানের সুর ফুটে ওঠে আয়েশার কণ্ঠে—ও! একমাত্র আমার জন্য যাবে না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ পাগলী। শুধু তোমার জন্যই যাবো। কিন্তু তুমি কি ততদিন থাকবে আমার জন্য? কত বড়ঘরে তোমার বিয়ে হ'য়ে যাবে। হয়ত আমাকে চিনতেও পারবে না সেদিন। তা'ছাড়া তুমি যে অনেক বড় আয়েশা!

—বড় নই। বল, অনেক ছোট। আকাশের চাঁদও আমি নই। মাটির মানুষ আমি। আমার ছালাম গ্রহণ কর।

আয়েশা মাথার আঁচল তুলে সহসা সেদিন ঝুঁকে পড়েছিল সফির পায়ের ওপর। কিন্তু তার প্রণতা, অশ্রুসিক্ত মুখখানা সফি আর তুলে ধরতে পারেনি। তার অশ্রু-ভেজা চোখের সামনে হামিদা-বানুর কঠিন পদাঘাতে আয়েশা লুটিয়ে পড়েছিল মেঝেতে। তার কপালের একপাশ কেটে গরিয়ে পরেছিল তাজা রক্ত।

দু'হাতে রক্ত মুছে আয়েশা কান্না-ব্যাকুল কণ্ঠে বলেছিল—একি করলে মা?

রোষাগ্নি ঠিকরে পড়ে মায়ের রুক্ষ চোখে! ক্রোধকম্পিত হস্তে আয়েশার চুলের গোছা ধরে টান্‌তে টান্‌তে তিনি অন্দর বাড়ীতে নিয়ে যান। তারপর ফিরে এসে সফিকে লক্ষ্য করে বলে—বের হয়ে যাও ঘর থেকে। ছোটলোলের ছেলে। নইলে এমন স্বভাব হয়। নিজের ঘরে মা বোন নেই?

আর্ত্তনাদ ফুটে বের হয় সফির মুখ থেকে—সত্যি, মা বোন কেউ আমার নেই। আয়েশা মনে হয় একটু ভুল করেছে! কিন্তু ভুলই ত অপরাধ নয়, মা। যা দেখেছেন তাতে পাপবৃত্তির লেশমাত্রও ছিল না। আয়েশা ফুলের মত সুন্দর, আকাশের মত নির্ম্মল, চন্দনের

কত সুগন্ধময়ী। বড় দুঃখ যে, আজ বিদায় মুহূর্ত্তে আপনার চোখে অযথা হীন প্রতিপন্ন হয়েছি। হয়ত আজকের এ দুর্ঘটনা আমার জীবনপথে একদিন সত্যের সন্ধান দেবে।

এতগুলো কথা ব'লে সফি ঝড়ের বেগে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল।

তারপর অনেকদিন গত হয়েছে। অনেক পরিবর্তন এনেছে তার জীবনে। দারিদ্র্যের কশাঘাত তার কাছে মর্ম্মান্তিক হয়ে দেখা দিয়েছে! তাই ছাত্র জীবনের ইতি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভবঘুরে সফিকে দেখা গেল কলতার রাস্তায়—ফুটপাতের ওপর।

লাইট পোষ্টের গায়ে একখানা বিজ্ঞাপন 'গৃহ শিক্ষক চাই'। মন্দ কি! সফি ঠিকানা অনুযায়ী পার্কসার্কাসের এক উকিলের বাড়ী গিয়ে নিজের অভিপ্রায় জানায়। গৃহস্বামী তাকে যাচাই ক'রে পুত্রের লেখা পড়ার ভার ন্যস্ত করেন সফির ওপর।

উকিল সাহেবের বড় মেয়ে রিজিয়া সংসারের সব কিছুর তত্ত্ব রাখে। বড়ীর চাকর-চাকরাণী থেকে আরম্ভ ক'রে প্রতিটি অতিথ মেহমানের যত্ন সে একাই নেয়। রিজিয়া বিবাহিতা, কিন্তু বাপের সংসারেই বছরের বেশী সময় তার কাটে।

রিজিয়া প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সফিকে সাহায্য করে। পর্দ্দার তাড়ালে দাঁড়িয়ে সফির অভাব অভিযোগ শোনে। কিন্তু খাবার সময় সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে সে সামনে বসে তাকে খাওয়ায়। এ ভবঘুরে যুবককে রিজিয়া কেন যেন প্রীতির চোখে দেখে।

কিছুদিন হ'ল রিজিয়ার অনুরোধে এবং আর্থিক সাহায্যে সফি কলেজে ভর্ত্তি হয়েছিল, কিন্তু উকিল সাহেব আপত্তি তুলেছেন—'তুমি বাপু নিজে পড়বে, না ছেলেকে পড়াবে? আমি ত তোমাকে পার্ট টাইম পড়াবার জন্য বাসায় রাখিনি।' ফলে সফিকে বাধ্য হয়ে কলেজ ত্যাগ করতে হয়েছে। কিন্তু রিজিয়া এ দুঃসংবাদে হয়েছে মর্ম্মাহত।

গ্রীষ্মের দুপুর। রোদের তেজ অত্যন্ত প্রখর। আকাশে এখনও মেঘ নেই, বাতাসে এতটুকু আলোড়ন নেই। সারা কলকাতা যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। চিন্তা-ক্লান্ত সফি—করুণ তার মানসিক পরিবেশ। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে চিন্তা করছে সে। জীবনের গতি তার কোন পথে? কোন্ পথে আসবে তার সাফল্য? এমনি আরও কত কি চিন্তা।

অকস্মাৎ তার চিন্তার দ্বারে আঘাত ক'রে অতি অপ্রত্যাশিতভাবে রিজিয়া গৃহে প্রবেশ করে। ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় সফি। বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বলে—আপনি!

—হ্যাঁ, প্রয়োজন আছে ভাই।

—কি করতে হবে বলুন।

—কিছুই করতে হবে না। ব'সো। কলেজে কতদিনের মাইনে বাকী, বল? কত টাকা তোমার প্রয়োজন?

বিস্ময়-মাখা কণ্ঠে সফি উত্তর দেয়—আমার যে টাকার প্রয়োজন একথা কে বলেছে আপনাকে?

—কেউ নয়। আমার মন। বল, কত টাকা তোমার প্রয়োজন আর একটা বছর পড়লে তুমি ডিগ্রী পাবে। মানুষের মত মানুষ হ'তে পারবে। এ অবস্থায় ব'সে থাকবে কেন? তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি স্থাপন করবার এই ত সময়।

—জানি। কিন্তু উপায় নেই।

—'উপায়' নিজে এসে যখন মুক্তহস্তে দাঁড়িয়েছে, তখন ভুল তুমি করবে না নিশ্চয়ই!

এ নারীর মহত্ত্বের কাছে সফি কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করে। কতখানি বিনয় দেখালে—কতখানি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলে রিজিয়ার মত মানুষের প্রতি উপযুক্ত সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যায় সফি তা অনুমান করতে পারে না। মহানুভবতার জীবন্ত মূর্ত্তি-

চিরকল্যাণময়ী রিজিয়া। কত বছরের সঞ্চিত পুণ্যে এমন একজন মানুষকে আপন ক'রে পাওয়া যায়, তা কে নির্ণয় করবে?

শান্ত কণ্ঠে অশ্রু সজল চোখে সফি বলে—আপা। যে স্নেহ আমায় দান করতে এসেছেন তা চিরদিন অম্লান থেকে আপনার হৃদয় মাধুর্য্যই প্রকাশ করবে। জগতে সহায় সম্বলহীন মানুষগুলো যদি আপনার মত একটা মনুষের জীবন স্পর্শ পায়, সহানুভূতির কণা মাত্রও কুড়িয়ে পায়, তবে তাদের দুঃখময় জীবনের মোড় ঘোরাতে কষ্ট হবে না। আপনি আমার অশান্ত মনে সান্ত্বনার যে বাণী বয়ে এনেছেন তা-ই আমার যথেষ্ট। এর বেশী প্রয়োজন নেই। আপনি ঘরে যান।

রিজিয়া প্রতিবাদ করে—শুধু মুখের সহানুভূতি লাভ ক'রে তুমি সফল হ'তে পারবে না ভাই। আমার সহানুভূতির সাথে সাথে কিছু আর্থিক সাহায্য তোমায় গ্রহণ করতে হবে। শুধু উচ্ছ্বাস বা আবেগ নিয়ে মানুষ বড় হ'তে পারে না। জীবনের অগ্রগতির পথে চাই উপযুক্ত রসদ। যোদ্ধা হ'য়ে খালি হাতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'লে এক পা-ও তুমি এগুতে পারবে না। রসদের প্রয়োজন হবেই।

কতগুলো নোট সফির হাতে দিয়ে রিজিয়া বলে—এখন এগুলো রাখ। প্রয়োজন হলে আবার জানিও, কেমন?

দ্রুত কক্ষ ত্যাগ ক'রে রিজিয়া চলে যায়। সফি নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে কল্যাণময়ী এ নারীর গমন পথের দিকে।

দিন বয়ে চলে। ঝঙ্কৃত হয় জীবনের শত তার সহস্র সঙ্গীতের সুর তুলে।

কিন্তু একদিন সফির এ সুর বেসুরো হয়ে বেজে ওঠে।

জ্যোৎস্না-হাসিত রাত? প্রশান্ত-বেদনা রিজিয়া সেদিন সফিকে খাওয়াতে বসে দীর্ঘশ্বাসে বলে—কাল ঠিক এমনি সময়ে আমি আর এ বাড়ীতে থাকবো না!

—তার মানে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে সফি।

—মানে আর কিছুই নয় ভাই। শ্বশুর নিতে এসেছেন। কালই চ'লে যাব। কিন্তু আমার মাথার দিব্যি রইল—লেখাপড়া ক'রো। রক্তের সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে নেই, কিন্তু আমার মৃত এক ভাইয়ের সন্ধান পেয়েছি তোমার মাঝে। ভাই তোমারই মত ছিলেন শান্ত এবং সুন্দর।

রিজিয়ার আসন্ন বিচ্ছেদ সংবাদ পেয়ে সফি ভেঙ্গে পড়ে। বলে —কালই চ'লে যাবেন?

—হ্যাঁ, ভাই। একবার যেয়ো আমায় দেখতে। ভাই মাঝে মাঝে যেতেন। কিন্তু তিনি ত আর নেই। আব্বা তাঁর কাজ ফেলে যেতেই পারেন না।

পরদিন যাত্রার পূর্ব্ব মূহূর্ত্তে রিজিয়া অশ্রু-সজল হয়ে ওঠে। সফিও নিজেকে সামলাতে পারেনা যেন। স্নেহের আমোঘ বন্ধন ক্রমে শিথিল হয়ে আসে—চোখের কোনে নির্লজ্জ অশ্রু ধারা নিয়ে নামে। নীরবে চোখ মোছে সফি।

যেন রোরুদ্যমানা শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা—অসহায়া হরিণীর করুণ চাহনি! কার জন্য হরিণীর চোখে এ বিয়োগ ব্যাথা?

আয়োজন শেষ হয়ে যায়। প্রয়োজন যায় মিটে। বেদনা-বিধুর মনের ওপর গাড়ীর কালো ধোঁয়া ছায়াপাত করে। অন্তরের নীরব ব্যাথার অভিব্যক্তি পায় গাড়ীর গর্জ্জন-গতির মাঝে। অন্তর্হিত হয় পরিচিত জন সুদূরের পথের মায়ায়। রিজিয়া চ'লে যায়। তার বিচ্ছেদ ম্লান মুখখানা অস্পষ্ট হয় সফির ঝাপসা চোখের দৃষ্টি সীমায়। মোটরের চাকাগুলো সফির চোখের সামনে স্বপ্ন ছায়ার মত ঘুরতে থাকে তীব্রবেগে।

বৈকালী আকাশ খণ্ড মেঘের বিচিত্র। রোদের ঝাঁঝ এতক্ষণে মৃদু হয়ে এসেছে। দখিনা বাতাসে পৃথিবীর স্পন্দন অনুভব করা যায়। সারি সারি সুউচ্চ অট্টালিকা। ওরা যেন আকাশ ছুঁয়ে কোলাকুলি করতে চায়। অতি উচ্চ এক হর্ম্ম্য শীর্ষে উড্‌ডীন রয়েছে একখানা পতাকা। গগন সীমান্তে উদ্ধত পতাকা যেন পাখা মেলেছে দারুন উল্লাসে। মনে হচ্ছে রিজিয়ার বিজয় অভিযানের বার্তা নিয়ে সমস্ত নগরীই যেন এগিয়ে চলেছে।

নিস্তব্ধ রাজপথ। ঘুমন্ত-প্রায় নগরী। জনবিরল রাস্তায় ভাজা বিক্রেতার কণ্ঠ শোনা যায়। প্রতিধ্বনি তার প্রাসাদে প্রাদাদে।

ও বাড়ীর দুরন্ত বালক ভাজা বিক্রেতাকে দরজায় রেখে ছুটে যায় অন্দর মহলে। তারপর বোনের আঁচল ধ'রে টেনে নিয়ে আসে গৃহের দ্বারে—ভাজা বিক্রেতার সামনে।

বোনটি বলে—ওরে দুরন্ত! ওসব খেলে যে অসুখ করবে।

অবুঝ বালক ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে তাকে। তার আব্দারের কাছে বোনটি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে। আঁচলের গিঁট খুলে পয়সা বের ক'রে ভাজা কিনে দেয় অনুজের হাতে। বালক মহা উল্লাসে ভাজা মুখে দিয়ে নৃত্য শূরু করে। বোনটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ধীরে ধীরে অন্দর আঙ্গিনায় চলে যায়।

সফি অপলক দৃষ্টিতে এ মধুর দৃশ্য চেয়ে দেখে। সে ভাবে—এ সংসার সত্যি বেচা-কেনার এক আনন্দ মেলা। এ মেলার আসরে সে-ও আজ তার রিজিয়া আপার অন্তরের গিঁট খুলে কি যেন অমূল্য রত্ন বের ক'রে নিয়েছে। সারা পৃথিবীর ভাজাওয়ালারা সে রত্নের বিনিময়ে খাবার যোগাতে পারবে কি?

বঙ্গীয় আর্ট কনফারেন্সের সুযোগ নিয়ে মিনা স্বামীর প্রতি চরম আঘাত হেনে আংশিক সাফল্য অর্জন করেছে। বিষ প্রয়োগের ফলে আনোয়ারের মৃত্যু ঘটেনি, কিন্তু বদ্ধ পাগলে পরিনত হয়েছে সে। মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে মিনার বর্ত্তমান অবস্থান নাসিরের বাগান বাড়ীতে। সম্পুর্ণ আলাদা এক কক্ষে মিনা বাস করে। কিন্তু কৃতকর্ম্মের জন্য সে আজ অনুশোচনায় দগ্ধ। উত্তেজনার বসে যা সে করেছে তার জন্য প্রতিদিন তাকে ভোগ করতে হয় বিবেকের দংশন যন্ত্রণা। মিনা প্রায়ই বিমর্ষভাবে বসে থাকে। কিন্তু শহীদের তা ভাল লাগে না। সে বলে—তুকি যেন দিনে দিনে কেমন হয়ে যাচ্ছ, মিনা।

মিনা নিরুত্তরে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। শহীদ বলে—এত সহজে যারা ভেঙ্গে পড়ে, তারা কিন্তু ভীরু হৃদয়ের পরিচয় দেয়। নীরবে আঘাত সহ্য ক'রে বাঁচার নাম জীবন নয়। আঘাত প্রতিঘাত দিয়ে বাঁচার মাঝেই জীবনের সার্থকতা।

মিনা উত্তর দেয় না। বিছানায় গড়িয়ে প্রাণভ'রে কাঁদে শুধু।

পশ্চিমের জানালা পথে এক ঝলক রোদ এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। বৈকালী গৃহে সে আলোতে খানিকটা উজ্জল। আলো-ছায়ার এ বিচিত্র পরিবেশে মিনা নিজেকে যাচাই ক'রে দেখে। এমন নিষ্ঠুর সে! যে আপন হাতে স্বামীকে বিষ প্রয়োগ করতে পারে, সেকি নারী?

মনের এ দ্বন্দ্ব কাটে না। সে আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ধূসর মেঘের মত ছড়িয়ে পড়ে তার রুক্ষ কেশ—চোখের মধ্য মণি হ'তে বের হয়ে আসে বেদনভরা অশ্রু। তার পাণ্ডুর মুখ লক্ষ্য ক'রে

শহীদ বলে—আজ বুঝতে পারছি মিঃ চৌধুরীর প্রতি তোমার কত দুর্ব্বলতা। নইলে যা করেছ তার জন্য ভেঙ্গে পড়বার মত মেয়ে তুমি নও।

মিনা এবারে উত্তর দেয়—সত্যি ভাঙবার মত মেয়ে আমি নই শহীদ। আর তাই যদি হ'তাম তা'হলে আপন হাতে বিষ প্রয়োগ করতে পারতাম না। ভাবছি—কেন এ কাজ করলাম। কেন আমি অমন গুণীকে খুন করতে গিয়ে বদ্ধ পাগল করে দিলাম? এতবড় নিষ্ঠুর কাজ তুমি কেমন ক'রে আমাকে দিয়ে করিয়ে নিলে? এতবড় পাপ!

মিনার মনের দ্বন্দ্ব ভাঙাতে চেষ্টা করে শহীদ! বলে—ছিঃ! অমন ক'রে ভেবো না। দুর্ব্বলতাই নারীর আসল রূপ, তা আমি জানি। কিন্তু তোমার কাছে এত দুর্ব্বল হৃদয়ের পরিচয় পাবো তা ভাবতে পারিনি। সংঘাতের সম্মুখীন হবার মনোবল যাদের নেই তারা কৃতকর্ম্মের অনুশোচনার মাঝেই পুড়ে মরে।

মিনা উদাস-ব্যকুল কণ্ঠে উত্তর দেয়—আমাকেও হয়ত তেমনি ভাবেই মরতে হবে। হয়ত সারা জীবনই অনুশোচনায় দগ্ধ হ'তে হবে—অশেষ দুঃখ পেতে হবে। নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, সুন্দর একটা জীবনকে আমি চিরদিনের মত পঙ্গু ক'রে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছি। এর চেয়ে তার মৃত্যু ভাল ছিল। তা'হলে চোখের সামনে আর কোনদিন দেখতে পেতাম না তাঁকে।

কিন্তু এসব চিন্তা কেন কর বলত?

—কেন করি তা নিজেই জানিনা। একটু আগে তাকে ট্রাম লাইনের পাশে ছুটোছুটি করতে দেখে এলাম। কী বিশ্রী রুক্ষ-মলিন দেহ। কতো আবোল তাবোল চীৎকারই না করে বেড়াচ্ছে সে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পথ আগ্‌লে বিকট হাসি হেসে

কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে—একটা পয়সা আমায় দেবে?

মিনা আর বলতে পারে না। অশ্রু-ঝাপসা চোখে সে থেমে যায়। চাপা দীর্ঘশ্বাস বের হয় তার বুক থেকে।

শহীদ প্রশ্ন করে—তারপর?

মিনা চোখ মুছে উদাসীর মত বলে—দুটো টাকা আমি ওর হাতে দিতে গেলাম। কিন্তু নিলেনা। ছুটে দূরে গিয়ে আমার গাড়ীর দিকে পাথর ছুঁড়ে বলে—যা, চ'লে যা! তুই পাপী! তোর পয়সা ত পাপের পয়সা। তারপর জনতার মাঝখানে কোথায় যেন সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে মিনা আবার বলে—আর এখানে নয়। অন্য কোথাও চ'লে যাবো। নইলে নিজেই কোনদিন পাগল হয়ে যাব হয়ত। এতবড় অন্যায় আমি করলাম—এত নিষ্ঠুর আমি হ'তে পারি?—এতটুকু অন্যায় ও সে করেনি আমার প্রতি। নির্বিবাদে গৃহ ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে। তবু কেন তার এত বড় ক্ষতি আমি করলাম?

শহীদ বিরক্তি প্রকাশে উত্তর দেয়—এ সব তোমার আগে ভাবা উচিত ছিল। তুমি না বড় হ'তে চাও মিনা? অথচ পথের কাঁটাকে ঠেলতে তোমার এত কষ্ট? ছিঃ! এই কি তোমার জীবনের ব্রত? সামান্য আঘাতে নিজকে খর্ব্ব ক'রে আর ছোট পতিপন্ন ক'রো না। তুমি যে অনেক বড়, সাধারণ মানুষের মত তোমার জীবনে কেন থাকবে দুঃখ করবার অবসর?

শহীদের কথার মধ্যে কি যেন যাদুমন্ত্রের প্রভাব। মিনা সহসা সে প্রভাবে নিজেকে ফিরে পায় অদ্ভুতভাবে। চিন্তার মেঘভার কেটে যায়। চোখে মুখে তেজস্বিনীর সুপ্ত তেজ ফুটে ওঠে। সজোর

নিশ্বাসে তার বুক ওঠে ভ'রে। সত্যি, এমন ভাবে মিনা ভেঙে পড়তে পারে না। সে যে অনেক বড়। জগতে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম সে। তার চলার পথে যে আবর্জনার সৃষ্টি হয়েছিল তাই সে আপনার হাতে করেছে উৎখাত। সাধারণ নিয়মের গণ্ডীতে জীবন তার সীমাবদ্ধ নয়। গতি তার দুর্ব্বার। এগিয়ে যাবে সে প্রবল বেগে, ঝড়ের তাণ্ডবে-গর্জ্জন তুলে।

নিমেষে অশ্রু শুকিয়ে যায়—আপন তেজে জ্বলে ওঠে মিনা। দৃঢ়কণ্ঠে বলে—হ্যাঁ, শহীদ। আমাকে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? আমি যে অনেক বড়। বিশ্রী দুর্বলতায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম তুমি আমায় জাগিয়েছ। আজ বিলাপের অবসর আমার নেই—কোনদিন থাকবেও না।

উদ্ভাসিত মুখে শহীদ বলে—তাই বল। তোমার মত মেয়ে এত সহজে গলে যাবে ভাবতেও বিস্ময়বোধ হয়। সামান্য আলোড়নে তোমার মত আধুনিকার জীবন-পর্বতে ধস নামলো ভেবে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলাম।

—আমার দুর্বলতা লক্ষ্য করে আমি নিজেও স্তম্ভিত হয়েছি। যা করেছি তা সজ্ঞানে স্থির-মস্তিকে চিন্তা করেই করেছি। তার জন্য অনুশোচনা কেন? ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! আমি এতক্ষণ কি যেন হয়ে পড়েছিলাম।

শহীদ উত্তর দেয়—দুর্বলতাই মানুষকে সত্যিকার মানুষ হ'তে দেয় না, মিনা।

—সত্যি, তাই। দুর্ব্বলতা কেন আমার থাকবে? আজ থেকে আমি কঠোর হব, কঠিন হব—নির্ম্মম হব।

বৈকালী আকাশে সেদিন মেঘের গুমোট। সূর্য্য কিরণ মেঘের স্তরে স্তরে আটকা পড়েছে। আড়ালের জগত তাই ছায়াম্লান। এ ম্লানিমার কোল বেয়ে রাতের আঁধার নামছে ধীরে ধীরে। জগতের ব্যস্ততায় এসেছে অবসাদ-ক্লান্তি।

দোতলার বারান্দায় চিন্তান্বিত মিনা। পৃথিবীর অবসান ব্যথায় নিজের অন্তরের ব্যথা অনুভব করে সে। প্রায়ান্ধকার দিগন্ত—শান্ত, শিথিল, অবসাদ-ক্লান্ত দিগন্ত! পৃথিবীর নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন মাঝে মিনা নিজের অন্তরকে দেখতে পায়। সেখানে অতি কুৎসিত, কদর্য্য অসভ্য এক পশু বাস করছে। বিশ্রী তার রূপ। অতি জগন্য তার মনোবৃত্তি। সে নারী, না মহানারী?

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। জনকোলাহল শান্ত প্রায়। গ্রামাঞ্চল থেকে ভেসে আসছে কুকুরের ঘেউ ঘেট ডাক। ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে আসছে যাত্রীবাহী ট্রেন একখানা। ট্রেনের উজ্জ্বল আলো ক্ষণিকের জন্য নিপতিত হয় মিনার জড়তাপূর্ণ মুখে। সে শিউরে ওঠে। চিন্তার মোহ যায় কেটে। দৃষ্টি তার গিয়ে পড়ে সুবিশাল নগরীর আলোকোজ্জ্বল বুকের ওপর। শত শত আলোর চক্ষু তার জীবনের প্রতি বিদ্রূপ হানে যেন।

হত-বিহবল, স্বপ্নবিষ্টা মিনা। বাস্তব জ্ঞানশূন্য অজানা মোহে আবিষ্ট সে। ভৃত্য আলো জ্বেলে দিয়ে গেল প্রতিটি কক্ষে। তীব্র আলো। কিন্তু মনের বিভ্রান্তির হ'লনা এতটুকু পরিবর্ত্তন।

ঝির ঝিরে বাতাস বইছে। ঝলকে ঝলকে বাতাস দোলা খাচ্ছে মিনার বিন্যস্ত কেশরাজি। পার্শ্বে নাসিরের কক্ষ। জানালাগুলো উন্মুক্ত—গৃহদ্বারও বায়ুবেগে আলগা হয়ে গেল।

স্নিগ্ধ নীলাভ আলোতে মায়া ঢেলেছে নাছিরের শয়ন কক্ষ। মিনা স্বপ্নবিষ্টের ন্যায় ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় কক্ষ দ্বারে। ক্ষনিক দাঁড়ায় সে, তারপর প্রবেশ করে অভ্যন্তরে। কী সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো আসবাব পত্র। অভিজাত্যের ছাপ আছে বটে। শুধু পয়সার অভিজাত নয়—সুরুচির আওতায় পরিপুষ্ট আভিজাত্য। টেবিলে প্রসাধন দ্রব্যের বিপুল সম্ভার। আলমারীতে পুস্তকের শত সমাবেশ। মাঝখানে গবাক্ষ শিয়রে সুকোমল পালঙ্ক। আবেশ আহ্বান-মাখা রুপালী পালঙ্ক। মেঝেতে দামী কার্পেট। দেওয়ালে সুনিপূণ শিল্পীর তুলির টান। তাতে পাওয়া যায় উচ্ছল জীবনের সন্ধান।

প্রকাণ্ড ড্রেসিং টেবিলের তাকের ওপরে শ্বেত মর্ম্মরে রচিত ছোট্ট তাজমহল। মিনা অভিভূতের ন্যায় হাত বাড়িয়ে দেয় অমর প্রেমের নিদের্শন বুকে। সাহসা কেঁপে ওঠে তার ভীরু হাত। খ'সে পড়ে পাথরের তাজমহল টেবিলের আয়নার ওপর। ভাঙনের ক্রন্দন ওঠে ক্ষণভঙ্গুর কাঁচের বুকে। খান্‌খান হয়ে যায় জমাট বাঁধা একত্ব।

মিনা সম্বিত ফিরে পায়। চির-খাওয়া আয়নার বুকে নিজের শতধা বিভক্ত অভিশপ্ত দেহের অবস্থান লক্ষ্য ক'রে চম্‌কে ওঠে। জীবনের পরিনতির একি অর্থপূর্ণ প্রকাশ!

অব্যক্ত চিৎকার ধ্বনিত হয় মিনার কণ্ঠে! বিবেকের দংশন শুরু হয় দেহে আর মনে। অস্থিরচিত্তে পায়চারী করতে গিয়ে সহসা আঘাত লাগে মাথায়। টল্‌তে টল্‌তে কোনমতে এগিয়ে গিয়ে ঢ'লে পড়ে সে নাসিরের খাটের ওপর। অবচেতনার মাঝে নিঃসার অবসাদে এলিয়ে পড়ে মিনা। তারপর শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়ে সে। এমনি ক'রে কেটে যায় অনেক্ষণ।

মিনা ঘুমন্ত, অসার। নাসির এসে দাঁড়ায় তার কক্ষ অভ্যন্তরে

বিস্ময়াবিষ্ট হতবাক সে। কোন্ অপরূপ রূপসী তার শয্যাঅঙ্কে শায়িতা! কোন অপার্থিব জ্যোতিঃ অঙ্কশায়িনীর ঘুমন্ত মুখে? অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব! যার প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন ব্যর্থ জীবন কেটেছে, সে আজ এমনভাবে আপন ইচ্ছায় হয়েছে প্রতিষ্ঠিত! এ যে স্বপ্নেরও অতীত। ব্যার্থ ব্যাধের গৃহে কুরঙ্গিণীর একি মধুর বিলাস শয়ন! নাসির আপন মনে উচ্চারণ করে-তুমি সেদিন শুধু মুক্তোর মালাই গ্রহণ করনি মিনা, আমাকেও গ্রহণ করেছ!

নিঃশব্দে শান্তপদে দরজা বন্ধ ক'রে মিনার বিলুণ্ঠিত দেহের দিকে এগিয়ে যায় নাসির। গভীর দৃষ্টিতে পান করে ঘুমন্ত, অবচেতন মিনার অপরূপ রূপসুধা। 'কুহেলী'র কুহকিনী। কী মধুময় তার অঙ্গরাগ! কী মস্হণ সুঠাম তার উন্মুক্ত বাহুপ্রদেশ। কী স্বপ্নমাখা তার নিমিলিত আঁখি আবরণ! বিশ্ব-সুন্দরী নুরজাহান কি এর চেয়েও রূপবতী ছিলেন?

নিঃশ্বাস প্রঃশ্বাসে মিনার সুদৃঢ় উন্নত বুক ঢেউ ভেঙ্গে পড়ে। বাতাসে বিন্যস্ত কেশে জাগে মৃদু আলোড়ন। প্রশান্ত নির্ম্মল মুখ। ললাট সীমান্তে ঘন কৃষ্ণ কেশের বনানী। নাশারন্ধ্রে গিরি-গহ্বরে মায়াবী আহবান ইঙ্গিত, নিমিলিত আঁখি তটভূমে মানস সরোবরের মায়া প্রশস্তি! অপুরু রক্তিম ওষ্ঠপুট কোড়ক আবদ্ধ! জাগারণ সাড়া মাঝে প্রস্ফুটিত হবে পাঁপড়ির দল যেন।

নাসির শান্ত আবেসে আসন গ্রহণ করে ঘুমন্ত মিনার পাশে পুলক-কম্পিত হস্তে তার দেহে স্পর্শ জাগায় সে ধীরে ধীরে। কী কোমল, মস্হণ, কস্তুরী সুরভী—মাখা নারীদেহ। নাসিরের সারা দেহে জাগে উত্তেজনা। সে ঝুঁকে পড়ে মিনার মুখের ওপর।

মৃদু চুম্বন দিয়ে সহসা শঙ্কিত হয় নাসির। সে স'রে দাঁড়ায়। ঘুম ভেঙ্গে যায় মিনার। দৃষ্টি মেলে নিজের পরিবেশ লক্ষ্য ক'রে মিনা বলে—একি! আমি এখানে কেন নাসির সাহেব?

—আমিও ত তাই ভেবে বিস্মিত হচ্ছি—আপনি এখানে কেন? এমন সুন্দরভাবে, এমন, অপ্রত্যাশিতভাবে আপনার অবস্থান লক্ষ্য ক'রে ভাবছিলাম —আমার মুক্তোর মালাই শুধু গ্রহণ করেন নি, সে সঙ্গে আপনি আমাকেও গ্রহণ করেছেন।

মিনা জড়তাপূর্ণ কণ্ঠে বিহ্বল দৃষ্টিতে প্রতিবাদ করে—না, না। সব মিথ্যে! সব মিথ্যে। আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে, কেন আমি এখানে?

—আপনি শান্ত হোন। মনে হয় কোন মানসিক দুশ্চিন্তায় মগ্ন ছিলেন?

মিনা—হ্যাঁ, তাই বোধ হয় হবে। নইলে এমন হবে কেন?

—কি এমন হয়েছে যার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন?

ফাঁকা অর্থহীন দৃষ্টিতে মিনা নাসিরের মুখের প্রতি চেয়ে থাকে। বলে—ব্যস্ততা নয় নাসির সাহেব, এযে সহজ বাস্তবের স্বরূপ প্রকাশ! বোধহয় এ-ই স্বাভাবিক।

নাসির সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে যায় মিনার কাছে—একেবারে কাছে। অন্তরের গোপন কথা বলার জন্য মিনার একখানা হাত আকড়ে ধ'রে বলে—কক্ষে প্রবেশ করেই দেখি আমার পাথরের তাজমহল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। কিন্তু তার পরিবর্তে স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আকাঙ্খিতা মমতাজ। মিনা আজ থেকে এ গৃহে তোমার স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে একান্ত ক'রে পেতে চাই তাকে, যার জন্য প্রতিক্ষা করেছি বছরের পর বছর প্রহর গুণে।

মিনা কেমন চমকে ওঠে। ম্লান হাসি ফুটিয়ে বলে—এমনি করে চেয়েছেন আমাকে? কিন্তু আমি ত কাউকে চাইনি নাসির সাহেব। আমি নিজত্ব বজায় রেখে মাথা উঁচু করে এগুতে চাই। কোথাও

স্থিতি আমার লক্ষ্য নয়। নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে চলার ছন্দে ইতি টানার মনও আমার নয়। আমি বিরাট, বিশাল। বিপুল ব্যাপ্তি আমার। সৌন্দর্য্যে আমি অপরূপ, দেহ লাবণ্যে, অঙ্গ—সৌষ্ঠবে অপূর্ব্ব—দুর্লভ সুন্দরী আমি। সারা পৃথিবী আমার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে! কিন্তু কারও প্রতি করুণা করে ফিরে চাইবার প্রবৃত্তি আমার নয়।

—তাহলে নিজেকে আপনি অনেক বড় মনে করেন? সৌন্দর্য্য আপনার আছে একথা জগত স্বীকার করবে। নশ্বর জীবনে এমন নিখুঁত সৃষ্টি খোদা আর একটিও করেনি হয়ত। কিন্তু সে সঙ্গে এত অহঙ্কার দিয়ে কোন সৃষ্টিকে কলঙ্কিত করেননি তিনি।

মিনা বলে—হয়ত তা-ও সত্য। গর্ব্ব? হ্যাঁ, গর্ব্বইত আমার গর্ব্বের বস্তু। পৃথিবীর জঞ্জাল আবর্জ্জনা থেকে আমাকে মুক্ত করে রেখেছে আমার গর্ব্ব। নিজেকে অনেক বড় ক'রে ভাবি বলেই কেউ আমার নাগাল পায় না। আর সত্যি, তাই! যা আমি চাইনে তা পাবার জন্য অন্তরে কেনই বা থাকবে এতটুকু স্থান?

নাসির একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। শান্ত পদে সে স'রে যায় খাটের অপর প্রান্তে। ব্যর্থ প্রেমিকের অসহায়তা লক্ষ্য ক'রে মিনা আপন মনে হাসে। নিজেকে সজাগ ক'রে তোলে সে অভিনয়ের ঢংয়ে। অভিনেত্রী কি কখনো অভিনয় ভুলতে পারে? বলে—আপনার মুক্তোর মালা কিন্তু আজও গলায় পরিনি। মালাছড়া এনে দিচ্ছি। আপনি নিজের হাতে পরিয়ে দেবেন, কেমন?

মিনা গমনোদ্যত। নাসির উল্লাস-আনন্দে ছুটে যায় তার কাছে অদ্ভুত আবেগে তৃপ্তি-উচ্ছাস প্রকাশ করে—মিনা, তুমি আমায় গ্রহণ করে ধন্য কর মিনা। সে আবেগ-উচ্ছাসে আঁকড়ে ধরে তাকে। কিন্তু মিনা মুক্ত হয়ে স'রে দাঁড়ায়। বলে—ছিঃ। এমন উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেবেন না।

—এ উচ্ছৃঙ্খলতা নয় মিনা—এযে প্রাণের আবেগ। একটা হীরের আংটি তোমাকে উপহার দেব। গ্রহণ করবে ত?

—নিশ্চই। কারও কোন দান আমি ফিরিয়ে দিইনা। কিন্তু দাতাদের দুর্ভাগ্য, আমার কাছে কিছুই তারা পায় না।

মিনা দ্রুত প্রস্থান করে। তারপর মুক্তার মালা হাতে সে ফিরে আসে নাসিরের ঘরে। বলে—এই নিন। নিজ হাতে পরিয়ে দিয়ে চোখের নেশা মিটিয়ে নিন।

মিনা এগিয়ে যায় নাসিরের একান্ত কাছে। অপূর্ব্ব দীপ্তি তার চোখে মুখে। ঐশ্বর্য্যময়ী অভিনেত্রীর মোহিনী রূপই বটে!

আবেগ উত্তেজনার মাঝে মুক্তার মালা পরিয়ে দিয়ে নাসির বাহুপাশে আবদ্ধ করতে চায় মিনাকে। কিন্তু মিনা বাধা দেয় বলে—এবার আংটিটি দিন। আপনার হাতে পরিয়ে দিই।

—আমার হাতে! তুমি পরিয়ে দেবে?

—কেন নয়! এতে কি এমন ক্ষতি আমার হবে বলুন? মিনা নিঃসঙ্কোচে আবেশ আবেষ্টনের মাঝে আংটি পরিয়ে বলে—বেশ কিন্তু মানিয়েছে আপনাকে।

—আর-মুক্তার মালায় তুমি কেমন রাণী সেজেছ তা একেবারে চেয়ে দেখ।

এইক্ষণে শহীদের কণ্ঠ শোনা যায়। নাসির থমকে দাঁড়ায়। মিনা সহাস্যে বলে—অমন বিচলিত হলেন কেন? ও! শহীদ দেখে গেল ব'লে? হা খোদা! ভয়নি, ভয়নি। শহীদ জানে, এ শুধু অভিনয়! মিথ্যে অভিনয়!

নাসির ঘুরে দাঁড়ায়। বিস্ময়-বিমূঢ় কণ্ঠে বলে—এ শুধু মিথ্যে অভিনয়! হ্যাঁ, মিথ্যে অভিনয়ই বটে। অভিনেত্রীর কাছে এর বেশী চাওয়া কি ধৃষ্টতা?

—হয়ত ধৃষ্টতা নয়। হয়ত ভুলও নয়। কিন্তু নাসির সাহেব

আমি যে সংসার জীবনে অনাসক্ত !

—সংসারে আসক্তি ছাড়া কি ভোগ-সম্ভোগের অবসর নেই ? জীবন ত স্রোত। কিন্তু একটানা স্রোতে বিচিত্রতা নেই। তাই কলস্বরা, তরঙ্গময়ী, চঞ্চলার স্রোতে আছে প্রানের সন্ধান। মানুষের যৌবন তটে জাগে উত্তেজনা—কামনার উন্মত্ততা। তার সহজ পরিতৃপ্তির মাঝেই আত্মার পরিপূর্ণতা। চাওয়া-পাওয়া ব্যর্থতাই জীবনেয় চরম ব্যর্থতা। আকাঙ্খার অপূর্ণতাই জীবনের পরাজয়।

—সব জানি। কিন্তু নারী ও পুরুষের দৈহিক মিলন আমার কাছে জঘন্য পশুবৃত্তি বলেই মনে হয়। ও ছাড়া কি মানুষ বাঁচতে পারে না ?

—পারে হয়ত। কিন্তু নর-নারীর স্বাভাবিক জীবন যাত্রার প্রতি অবিচার ক'রেই তাকে বাঁচতে হয়।

—আমি সেই অবিচারের মাঝেই বাঁচতে চাই নাসির সাহেব। আমাকে মার্জ্জনা করুণ।

মিনা দ্রুত নিস্ক্রান্ত হয় গৃহ-প্রাঙ্গন হ'তে। নাসির তার গমন পথের দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সশব্দে মিনার শয়ন কক্ষের দ্বার রুদ্ধ হয়। তার বিকট আওয়াজ নাসিরের কানে এসে বিরক্তি জাগায় শুধু।

সেদিন আদালত গৃহে অসংখ্য লোক সমাগম হয়েছে। শেঠ জাফরের বক্তব্য শুনে বিচারক মিনাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। মিনা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্কোচে বলে—হুজুর, আমি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা এবং সাবালিকা। স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করেই আমি আমার বর্ত্তমান কর্ম্মজীবন বেছে নিয়েছি। কারও প্ররোচনায় বা প্রলোভনে পড়ে আমি আমার পিতা বা স্বামীর মর্যাদা ক্ষুন্ন করতে চাইনি। তা'ছাড়া এখন আমার স্বামী বদ্ধ পাগল। সুতরাং তার মামলার কোন গুরুত্বই থাকতে পারে না। এদিকে আমার স্বনামধন্য পিতা যে সব ভদ্র সন্তানদের দোষী মনে ক'রে নালিশ করেছেন তারা সম্পুর্ণ নিরপরাধ। সুতরাং হুজুরের কাছে আমার প্রার্থনা, এ মামলা এখানেই শেষ হোক।

জাফর সাহেব কন্যার মুখে এমন স্পষ্ট স্বীকারোক্তি শ্রবণ ক'রে স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। আবেগ উত্তেজনায় অভিভূত কণ্ঠে তিনি বললেন—তাহ'লে হুজুর আমারও শেষ বক্তব্য শুনুন।

বিচারকের অনুমতি গ্রহণ করে জাফর সাহেব বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—আমার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী মিনা। কিন্তু আজ প্রকাশ্য বিচারালয়ে তার ব্যক্তব্য শুনে আমি মর্ম্মাহত হয়ে পড়েছি। কোন কন্যা এভাবে পিতাকে অপমান করতে পারে, তা আমার ধারণারও অতীত ছিল। যাক মামলার এখানেই শেষ হোক। আজ থেকে মিনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হ'ল।

এইক্ষনে জনতা ভেদ ক'রে ছিন্নবস্ত্র পরিহিত পাগল আনোয়ার এসে বিচারকে সম্মুখে হাজির হ'ল। সে বিকট হাসিতে গৃহতল কাঁপিয়ে বললে—সম্পর্ক ছিন্ন!—অ্যাঁ। সম্পর্ক ছিন্ন! হাঃ! হাঃ

হাঃ! আমি কিন্তু সম্পর্ক ছিন্ন করবো না! আমি কোনদিন কাউকে মুক্তি দেব না। হাঃ। হাঃ! হাঃ!

বিচারক উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে বলেন—তোমাকে আদালত গৃহে আসতে দিল কে?

পাগল প্রকৃতস্থ হয়ে মাথা নেড়ে বলে—হুজুর, আমারও যে কিছু নালিশ রয়েছে।

—তোমার আবার কিসের নালিশ!

পাগল উত্তর দেয়—আমার নালিশই ত আসল নালিশ। স্বামীর নালিশ স্ত্রীর বিরুদ্ধে। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

বিচারক শান্ত কণ্ঠে বলেন—বদ্ধ পগেলের নালিশ নিয়ে আদালত বিচার করেনা। তুমি যাও এখন।

পাগল হো হো করে হেসে ওঠে। বলে—তুমি বুঝি বিচারক। দু'পক্ষ থেকে শুনে তবে বলবে কে দোষী, আর কে নির্দ্দোষী। কিন্তু যাকে শুনতে হয় না, তাঁর কোর্টে, বুঝলে বিচারক—তাঁর কোর্টে সেদিন দেখে এলাম বিচার কাকে বলে! ন্যায়ের তুলাদণ্ডে এতটুকু এদিক ওদিক হয়না। হাঃ হাঃ হাঃ। তাঁরতুলনায় তুমি আবার বিচারক।

জনৈক উকিল বিরক্তি প্রকাশে বলেন—হুজুর! অনেক কেস বাকি। পাগলকে পুলিশ দিয়ে বের করে দিন।

একদৃষ্টে উকিলের প্রতি চেয়ে পাগল তীব্র কণ্ঠে বলে—তুমি উকিল! মিথ্যের বেশাতি করে আর কতদিন পরের পয়সায় চলবে তোমার? আমি সম্পাদক! আমি সবাইকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যোগাই সর্ব্ব প্রকার ইন্ধন। কিন্তু তুমি কেড়ে নাও মানুষের সব সম্বল—তুমি গাঁটকাটা, ডাকাত তুমি। সত্যকে মিথ্যে কর, আবার মিথ্যেকে সত্য বলে চালাও। সমাজ জীবনে তুমি দুষ্কৃত। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

পাগল উল্লাসে হাতে তুড়ি দিতে থাকে! বিচারক বলেন—তোমার ব্যক্তব্য শেষ হয়েছে। এবারে বাইরে যাও!

পাগলের সেই দিকে দৃক্‌পাত নেই। সে এবারে মিনাকে লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে যায় তার দিকে।

আদালত গৃহ জাগ্রত হয়ে ওঠে পাগলের গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে মিনা বিচলিত হয়ে পড়ে। উচ্চরোল হাসির লহর তোলে পাগল। অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সে মিনার মুখের প্রতি। তারপর ব্যঙ্গের স্বরে বলে—তুমি এখানে? তাই বুঝি এতসব পাগল এসেছে তোমায় দেখতে। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

অট্টহাসির রোল শেষ না হ'তেই পাগল কান্নার সুরে বলে—আমার মা, আমার স্ত্রী, এমন কি দেশের সবাই আমাকে পাগল বলে। ওরা আমাকে বাইরে পর্যন্ত আসতে দেয় না। তাই ত চুপি চুপি লুকিয়ে এসেছি বিচার দেখতে।

সহসা এক টুকরো আধপোড়া সিগারেট কুড়িয়ে পাগল মিনার প্রতি নিক্ষেপ করে। সিল্কের শাড়ীতে জড়িয়ে যায় আগুন চীৎকার করে ওঠে মিনা। মুহূর্ত্তে জনতা অধৈর্য্য হয়ে পড়ে—উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ান বিচারক। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমা পুলিশের পদাঘাত গিয়ে পরে পাগলের দেহে। মেঝেতে হুমরি খেয়ে লুটিয়ে পড়ে সে। আকুল আর্ত্তনাদ ওঠে বিচারালয়ে। রক্তের ধারা নামে তার মুখ থেকে। কী তাজা রক্ত! নাকের একপাশ কেটে গেছে। তা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরছে। এত রক্ত মানুষের দেহে! বিভৎস হয়ে যায় ওর মুখমণ্ডল।

রক্তাক্ত দেহে আক্রমনের ভঙ্গীতে পাগল ছুটে যায় পুলিশের দিকে। প্রচণ্ড আঘাত দেবার জন্য পুলিশ হানটার উচিয়ে ধরে। অকস্মাৎ এমনিক্ষণে মিনা চীৎকার ক'রে বাধা দেয়—না, না। ওকে অমন ক'রে মেরো না। দোহাই তোমাদের।

বিচারক প্রশ্ন করেন—তুমি ওকে চেন?

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে মিনা উত্তর দেয়—হ্যাঁ—না, না,! চিনিনে। আমি ওকে চিনিনে। কাঠগড়ার মাঝেই মিনা ভেঙ্গে পড়ে।

পাগল মিনাকে লক্ষ্য ক'রে বলে—

আমায় চিনবে তুমি পথের প্রান্তে অস্তাচলে'
জীবনে ধূলো খেলার রঙের আসর সাঙ্গ হ'লে।

পাগল এবার টল্‌তে টল্‌তে আদালত গৃহ ত্যাগ করে চ'লে যায়। শান্ত পরিবেশের মাঝে বিচারক রায় প্রকাশ করেন—"সমস্ত আসামী বেকসুর খালাস।"

বিরতির ঘণ্টা পড়ে গেছে। আদালত গৃহ প্রায় জনশূন্য। চিন্তান্বিত মিনা নিস্পৃহভাবে আসনে উপবিষ্টা। তার মনের ফাঁকা প্রাঙ্গনে বিরাট এক ক্ষত। নিস্পৃহ, নির্ব্বাক, নিষ্পন্দ মিনা। দৃষ্টি তার পলকহীন—ধূসর মেঘের গুরুভার তার মুখমণ্ডলে। শহীদ পাশে দাঁড়িয়ে বলে—ঘরে চল মিনা।

মিনা অশ্রু—সজল চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর শান্ত কণ্ঠে বলে—ঘর। কার ঘরে যাবো?

একে একে নাসির, মিঃ মুন্সী এবং আরও অনেকে মিনার পাশে এসে দাঁড়ায়। তাদের অনুরোধে মিনা আদালত গৃহ ত্যাগ করে।

কিন্তু পরদিন প্রত্যুষে দেখা যায় মিনার শয়ন কক্ষ শূন্য। পালঙ্কের ওপর একখানা পত্র। তাতে লেখা ছিল—"আদালত গৃহে গতকাল মিনার মৃত্যু হয়েছে। তার প্রাণহীন দেহ নিয়ে আর কাউকে কাড়াকাড়ি করতে হবে না নিঃশব্দে সবার মাঝ থেকে নিজেকে সরিয়ে কোথায় নিয়ে চলেছি, জানিনে।"

—ইতি, মিনা।

দীর্ঘ তিন বছর পরের কথা। গত তিন বছরে সফির জীবনে এসেছে নানা বিপর্যয়। স্নেহের বন্ধন তার ছিন্ন। যারা চলার পথে স্নেহজাল বিস্তার করে বাঁধনে জড়াতে চেষ্টা করেছিল তারাও আজ দূরে। আয়েশা তাকে ভুলে গেছে হয়ত, রিজিয়াকে সে বাধ্য হয়েছে ভুলে যেতে। আজ তার কিশোর জীবনের কথা মনে পড়ে যখন বাপ মা বেঁচে ছিলেন। আর মনে পড়ে সেই আনোয়ার ভাইকে। যিনি সফিকে লেখাপড়া শেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। পাগল! বদ্ধ পাগল সে এখন।

দারিদ্র্য! হ্যাঁ, দারিদ্র্য সফিকে বিব্রত ক'রে তুলেছে।

কিন্তু দারিদ্র্য যেমন মানুষকে পঙ্গু, ভীরু এবং দুর্ব্বল করে, তেমনি কোন কোন মানুষকে বেপরোয়া ক'রেও গড়ে তোলে। জীবনে দাম যাদের কাছে শুধু পরকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে, তারা দারিদ্র্যের অন্তরালেও পারলৌকিক সুখের চিন্তায় মগ্ন থাকে। ইহকালে ন্যায্য দাবীর সংগ্রামও তারা চায় না। অসহায়ের মত অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে মুখ বুঁজে সব অত্যাচার আর ক্ষতি সহ্য করে। কোনদিন নিজেদের দুঃখ দারিদ্র্যের প্রতিকারও চায় না।

কিন্তু সফি এধরনের নিছক অদৃষ্টবাদী নয়? তার দেহে আছে রক্তের উষ্ণতা—বুকে আছে সৎসাহসের দৃঢ়তা। মানুষের নিষ্পেষণ সহ্য ক'রে নীরবে তিলে তিলে সে মরতে চায় না।

১৯৪২ সাল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সে এক বিপুল জাগরণ। সাদা আদমীদের পোষ্য কালো আদমীরা কলকাতার বুকে সেদিন বিব্রত, ব্যতিব্যস্ত। আগষ্ট আন্দোলনে সমস্ত দেশ গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে।

হ্যারিসন রোডে গাড়ী চলাচল বন্ধ। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে ট্রামে আগুণ। বিদ্যুতের কাটা তারগুলো ঝুলে পড়েছে। টেলিফোনের তার রাস্তায় ছড়িয়ে আছে। পাইকারী হারে গ্রেফতার শুরু হ'ল। গাড়ীভর্তি পুলিশ এসে বিদ্যুৎস্তম্ভের ওপর থেকে সফিকে নামিয়ে ধ'রে নিয়ে গেল। স্কুল কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে বন্দীশালায় তার কাটলো একটা বছর। তারপর যখন মুক্তি হ'ল তখন সারা বাংলাদেশ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ! লক্ষ লক্ষ মানুষ কলকাতার বুকে অনাহারে ধুঁকে ধুকে মরছে। চতুর্দ্দিকে ক্ষীণকণ্ঠের আওয়াজ—অন্ন চাই, অন্ন চাই!

বৈকালী রোদে দেশপ্রিয় পার্ক চাকচিক্যময়। হাজার হাজার বিদুষী নারীদের সমাগম হয়েছে সেখানে! পত্রপুষ্পে বিনির্ম্মিত তোরণে বড় বড় হরফে লেখা আছে "নারী প্রগতি সঙ্ঘ।" বোম্বে ফিল্মের প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী মিনতি চৌধুরী প্রধান বক্তা।

মিনতি চৌধুরী! সেই হাস্য লাস্যময়ী, লীলা-পটিয়সী মিনতি অর্থহীন! একেবারে অর্থহীন। লাখো লাখো নরনারী যে দেশে অন্নবস্ত্রের অভাবে মরছে, সেদেশে আবার প্রগতি! অদ্ভুত!

রাসবীহারী এভিনিয়ের ফুটপাতে শত শত কঙ্কালসার মানুষ। ওরা যেন রাজধানীর বুকে অসংখ্য কেঁচোর মত কিলবিল করছে। ঘড় ঘড় শব্দে ট্রাম চ'লে যায়, হর্ণ বাজিয়ে বিদ্যুৎ বেগে ধেয়ে যায় মোটর গাড়ী। রুগ্ন ক্লান্ত রিক্সাওয়ালাদের সওয়ার হয়ে যায় কোন্ রায় বাহাদুর বা খান বাহাদুরের দল।

মিনতির সতেজ কণ্ঠ উচ্চকিত হয় লাউড স্পীকারের বুক চিরে। নারী স্বাধীনতার জিকির শুধু। সেদিকে সফির ভ্রূক্ষেপ নেই। তার দৃষ্টি আজ পথের ধূলোয়। উত্থানশক্তি রহিত নরনারী। একস্থানে দু'তিন বছরের একটা শিশুকন্যা চিপ্‌সে যাওয়া মায়ের বুকে মুখ

লাগিয়ে আছে। শীর্ণ-মলিন অস্থি চর্ম্মসার মানব শিশু। দরজার গরাদে চাপা পড়ে শুকিয়ে যাওয়া টিকটিকির মত। মা মৃত। মায়ের পয়োধর শুষ্ক। বক্ষপঞ্জরের মাঝে অস্তিত্বহীন হয়ে মিলিয়ে গেছে মাতৃস্তন্য। একদিন যে স্তন্য ছিল সুডৌল সুদৃঢ়, সুঠাম —সন্তানের জন্য আহার্য্যরসে পরিপুষ্ট।

রস-লেশহীন মৃত মায়ের বুক। ব্যর্থতায় শিশুকন্যা ক্ষীণকণ্ঠে কেঁদে ওঠে। গভীর নিশিথে শকুন শিশুর কান্না যেন! বিকৃত বিভৎস হয়ে পড়ে আছে মা। সফি অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে মানুষের চরম পরিণতি! কারা এর জন্য দায়ী? কাদের নিস্পেষণ তলে এমনি ক'রে মানুষ মরে? কাদের দুঃশাসনে শোসন উঠেছে বেড়ে। আসন রক্ষার জন্য কাদের ত্রাসন উঠেছে ফুটে?

বক্তৃতা চলেছে—নারীরা পুরুষের সম-অধিকার চায় বাঁচতে। নারী চায় বিশ্বের দরবারে স্বাধীনভাবে আসন প্রতিষ্ঠা করতে।

শিশু কন্যাকে বুকে তুলে নেয় সফি। উন্মাদের মত সে ছুটে যায় বক্তৃতা মঞ্চের দিকে। চীৎকার করে বলে—বক্তৃতা থামান। সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা থেমে যায়। হাজার হাজার নারীর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে সফির ওপরে। মিনতি বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্ন করে—কি চান আপনি?

শিশু কন্যাটিকে উর্ধে তুলে সফি বলে—বিশ্বের দরবারে যারা নারীর আসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যস্ত, তারা কি বলতে পারেন এ শিশু কন্যাটির আসন কোথায়? ফুটপাতের তলায় এর মায়ের মৃতদেহ পড়ে আছে। জানিনা সে দেহের সৎকার হবে কিনা! কাঙালিনীর মৃতদেহ। কোন্ জাতের কোন ধর্ম্মাবলম্বীর কেউ তার খোঁজ রাখা প্রয়োজন মনে করে না। ওরা যে নিজেরাই এক জাত। অর্থশালী এবং সম্পদশালী মানুষদের শোষণের তলে জগতে নতুন ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়েছে। সব ধর্ম্মের নিপীড়িত ও নিঃশেষিত জনগণ

আজ গোষ্ঠীবদ্ধ হ'তে চলেছে। ওরা চিরকাল ধরে নিপীড়ন সহ্য করে কি?

চশমাধারী এক যুবতী প্রতিবাদ করে—এটা মেয়েদের সভা। আপনাকে ভেতরে আসতে দিলে কে?

—অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশ্ন—

আর একজন বললেন—ওদের দেখার জন্য গভর্ণমেণ্ট সক্রীয় রয়েছে। নারী-প্রগতি সংঘের অন্য অনেক কাজ আছে। আপনি বাইরে যান!

দৃঢ়তা সহকারে সফি প্রতিবাদ করে—যে দেশে নারীত্ব লাঞ্ছিত, যে দেশে অন্ন-বস্ত্রের অভাবে নারীদের ইজ্জত বিড়ম্বিত—যে দেশে মানুষ শেয়াল-কুকুরের মত শুকিয়ে মরচে—সে দেশে নারী-প্রগতির এমন নির্লজ্জ, অর্থহীন সম্মেলন কল্পনা করতেও ঘৃণাবোধ হয়। আপনারা কি মানুষ?

মিনতি অপমানে জ্বলে ওঠে। লাউড স্পীকারের বুকে তার হুঙ্কার বাজে—"দেশের বর্ত্তমান সমস্যা কারও অবিদিত নয়। সে সমস্যার সমাধান করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ কাঙালকে অনাথ আশ্রমে বা নারী-মঙ্গল সমিতিতে স্থান দেওয়া যায় না। সুতরাং 'সক্ষমরাই শুধু বেঁচে থাকে।' এ নিয়মে জগত চলতে বাধ্য।"

সফি প্রতিবাদ করে—এ যুক্তি আমি মানিনে। আপনারা বিলাসের মাঝে মানুষ হয়ে বড় বড় কথা বলেন। কিন্তু বড় বড় কথার সময় এ নয়। ফিল্ম জগতে নাচানাচি করে বড় হয়েছেন। পয়সাও করেছেন। কিন্তু দেশের মরণোম্মুখ জনসাধারণের কথা ভেবেছেন কোনদিন?

মিনতির দু'চোখে আগুন ঠিকরে পড়ে যেন। সফির কণ্ঠ থেমে যায় পুলিশের লাঠির আঘাতে। তার কোল থেকে ছিনিয়ে

নেওয়া হয় শিশু কন্যাটিকে। ব্যর্থ ক্রন্দন, ব্যর্থ যুক্তিজাল। ওসব নাকি প্রলাপ।

আরও দু'বছর পরের কাহিনী। ধর্ম্মতলার ওপর রাস্তায় সেদিন জমেছে অসংখ্য তরুণের ভীড়। সম্মুখ দিকে পথ অবরুদ্ধ! সেথানে বৃটিশের আগ্নেয়াস্ত্রের বিপুল সমাবেশ। বেলা দশটার সময় জাতির মেরুদণ্ডের ওপর হামলা শুরু হ'ল। গুলির আঘাতে ঢ'লে পড়ল কত শত শত তরুনের দেহ। তাজা খুনে লাল হ'ল কালো পিচের রাস্তা। কিন্তু যোদ্ধা তরুণের দল ছত্রভঙ্গ হয়নি। দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মৃত্যু মহড়ায় তারা এগিয়ে গেল হাজারে হাজারে। কলকাতার প্রানকেন্দ্রে জমে উঠলো যান-বাহনের ভীড়।

ম্যাডান ষ্ট্রীটের ওপর উম্মত্ত এক যুবক! শত শত লোক তার রক্তাক্ত দেহের চারপাশে বেড়াজাল বিস্তার করে দাঁড়ায়েছে। কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না।

রাস্তার ওপরে অসংখ্য মোটর গাড়ী। তার একখানায় আটকা পড়েছে বিখ্যাত অভিনেত্রী মিনতি। মিনতি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যুবকের কণ্ঠস্বরে কার যেন পরিচিত কণ্ঠের দৃঢ়তা।

ধর্ম্মতলার রাস্তায় আবার চার পাঁচ রাউণ্ড গুলি হ'ল? আর্ত্ত-চীৎকার শোনা গেল। সে সঙ্গে নানা ধ্বনি উঠল আকাশ ফুঁড়ে। জনতা ঠেলে উম্মত্ত সফি বের হয়ে আসে। হাতে রিভলবার।
—আমি ওদের খুন করবো।

নিমেষে মিনতি তাকে চিনেছে। নারী প্রগতি সংঘের সভাতে এই যুবকই একদিন প্রতিবাদ তুলেছিল। এরই যুক্তির তলে মিনতির কণ্ঠ সেদিন গিয়েছিল থেমে।

উম্মত্ত যুবক। স্বাধীনতা আন্দোলনে, দেশাত্ববোধের জাগরণে যারা জীবন দিচ্ছে এ তাদেরই একজন। এমন দেশপ্রান, দৃঢ়-সঙ্কল্প মানুষের পায়ের তলায় মিনতির যে মাথা খুঁড়ে মরতে সাধ যায়।

মিনতি ছুটে যায় যুবকের কাছে। কিন্তু মুহূর্ত্তে একি হ'ল! যুবকের গুলির আঘাতে সম্মুখে গড়িয়ে পড়ল দু'জন গোড়া সিপাই। একজন রাইফেলধারী এগিয়ে আসছে উন্মত্ত বেগে। জনতা যুবককে আড়াল করে সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায়। ইত্যবসরে মিনতি তার হাত থেকে কেড়ে নেয় লিভালবার। টেনে নিয়ে যায় যুবককে তার গাড়ীতে। বিদুৎ বেগে অন্তর্হিত হয় তার গাড়ি।

তারপর?

তারপর হাসপাতালে সফির অনেকদিন কেটেছে? মিনতি তাকে প্রতিদিন এসে দেখে গেছে। নানা আহার্য্য খাইয়াছে, সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়েছে।

সফি বিছানায় শুয়ে মিনতির কথাই ভাবে। রোজ রোজ কেন সে তাকে দেখতে আসে? কেনই বা রাজ্যের ফলমূল এনে খাওয়ার জন্য জানায় আকুল অনুরোধ। মিনতির জীবনের কোন কোমল তারে রক্ত-পিপাসু সফির ভয়াল মূর্ত্তি সেদিন দাগ কেটেছে? শৌর্য্য বীর্যের মাঝে আজও কি জগতের নারী-মন মুগ্ধ হয়?

সফি ভাবে আর মনে মনে হাসে। দুর্লভ অভিনেত্রীর একি সুলভ আতিথ্য!

হাসপাতাল থেকে বিদায়ের দিন। মিনতি গাড়ীসহ প্রস্তুত।
—চল, গাড়ীতে ওঠো।
—কোথায় যেতে হবে?
—আমার ডায়মণ্ডহারবারের বাড়ীতে?

সফি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে—অসংখ্য ধন্যবাদ মিনুদি আমাকে বস্তীতেই ফিরে যেতে হবে।

তুমি আমাকে এমনিভাবে সম্বোধন করলে? মিনুদি! আজ হতে বস্তীতে তোমার স্থান নয়।

সহাস্যে সফি উত্তর দেয়—এতকাল যে সেখানেই বাস ক'রে

এসেছি। সৌভাগ্য দুয়ারে কড়া নাড়লেই কি পাতার ঘরকে ভুলতে পারি? আপনি যান। কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার কাছে।

মিনতির চোখ ফেটে অশ্রু আসে। কয়েক ফোঁটা গড়িয়ে পড়বার উপক্রম হয়। ব্যর্থতায় নীরবে মুখ ফিরিয়ে নিজকে সামলে নেয় মিনতি। তারপর শান্তকণ্ঠে বলে—তুমি আমাকে অভিনেত্রী ব'লে ঘৃণা কর, তা আমি জানি।

—ঘৃণা নয়, মিনুদি। দেশোদ্ধারের কাজ যে অনেক বাকী। যাবো। নিশ্চয়ই একদিন যাবো। ঠিকানা দিন।

মিনতি ঠিকানা দেয়। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় গাড়ীর দিকে। নাগরীর ব্যস্ততায় মিলিয়ে যায় অন্তরের অস্থিরতা। ওর কাছে এমন পরাজয়।

(১২)

কয়েকদিন আগে ঘুর্ণিবাত্যায় সমুদ্র উপকুলবর্ত্তী বহু জনপদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সেবক সমিতির কাজ চলেছে পুরোদমে। ডায়মণ্ডহারবারে এবং ক্যানিং-এ রিলিফ ক্যাম্প। শত শত যুবক কর্ম্মীদের অক্লান্ত সেবা। মিনতি পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেছে দুঃস্থ গৃহহারাদের জন্য। খবরের কাগজে বড় বড় হরফে এ দানের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

সে আজ নিজেই এসেছে রিলিফ ক্যাম্পে। নানা স্থান হ'তে এসেছে আরও মেয়েরা। তাদের মাঝে মিনতির অবস্থান একটু

বিসদৃশ। সে সেবিকা হ'তে আসিনি। এসেছে কারও অনুসন্ধানে। কিন্তু বিফলে ফিরতে হ'ল তাকে। সফি তখন সুদূর পল্লী অঞ্চলে —কাকদ্বীপে।

আজ আবার ঝড়ের পূর্ব্বাভাস। আকাশে ধূসর মেঘের ঘনঘটা। বঙ্গোপসাগরের সীমান্ত থেকে কালান্তক যমের মত কি যেন ছুটে আসছে। পৃথিবী প্রলয়-বন্যায় ডুবে যাবে নাকি?

দোতলায় খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মিনতি। দৃষ্টি তার রাস্তার জনস্রোতের প্রতি নিবদ্ধ। এক সময় গৃহ-ভৃত্যকে ডেকে মিনতি বললে—ওই কালো ব্যাজ পরা ভদ্দর লোকটিকে ডেকে নিয়ে আয়। বলবি—মিনুদির অসুখ।

ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে জগত জুড়ে। প্রলয়-প্রমত্ত পৃথিবী। মিনতির কেশ আলুথালু, পরণে মলিন সাদা শাড়ী, বিষাদ-ক্লিষ্ট মন। অভিনেত্রী সে বটে। মুহূর্ত্তে রোগী সেজেছে মিনতি। দৃষ্টি তার বলিষ্ট দেহ সফির প্রতি নিবদ্ধ। বেশ লাগে তাকে। ম্লান হাসি ফুটিয়ে মিনতি বলে—আর্ত্তের সেবা করে বেড়াচ্ছো। কিন্তু তোমার মিনুদি যে শয্যাশায়ী তার খোঁজ ত একবারও নাও না?

অদ্ভুত প্রশ্ন। মিনতির মুখের দিকে চাইতেই পারে না সফি। এমন করুণ কণ্ঠ, এমন অশ্রুপূর্ণ চাহনি সে কখনো দেখেনি। তাই নতপল্লবে উত্তর দেয়—কি করব বল? শত সহস্র মানুষ গৃহহারা হয়েছে। তাদের মাঝে আমরা না গিয়ে পারি?

—যেতে কি আমি নিষেধ করেছি? যাবে বই কি। আর্ত্তের সেবার মাঝেই ত দেশাত্মবোধের পরিচয়।

—হ্যাঁ। সে পরিচয় তুমি দিয়েছ মিনুদি। একদিন তোমায় ঘৃণা করেছি। কিন্তু আজ শ্রদ্ধায় মাথা আমার নুয়ে গেছে। তাই ত দেখতে এলাম।

—নইলে তুমি কোনদিন আসতে না, সে আমি জানি। একটু বসো। কিছু চা পানি খাও।

মিনতি চা ও খাবার নিয়ে ফিরে আসে। সফি প্রশ্ন করে—এ বাড়ীতে আর কেউ নাই নাকি?

—না। আমার বলতে জগতে আমি একা।

—একা! কেউ নেই তোমার? স্বামী? নেই! এমন নিঃসঙ্গ তোমার জীবন!

এতগুলি প্রশ্ন! মিনতি প্রতিটি প্রশ্নে হাঁপিয়ে ওঠে। তার জীবনতারে অকস্মাৎ কান্নার সুর ওঠে বেজে। নিঃসঙ্গ হয়ে মানুষ কি বাঁচতে পারে না? কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে মিনতি বলে—তুমি আমায় বিব্রত ক'রে তুলবে দেখছি। খাবার খাও। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে! কি ভাবছো বলত?

—তোমার ব্যর্থ জীবনের কথাই ভাবছি। এতদিনে বিয়েই বা করনি কেন মিনুদি?

মিনতি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে। অলক্ষ্যে চম্‌কে ওঠে সে। জীবনের সহজ সুরের আজ ছন্দপতন হবে নাকি? অভিনেত্রী সে। কিন্তু আজকার এ অভিনব বাস্তবও কি অভিনয়? মিনতি বলে—সে অনেক কথা। কিন্তু একটা অনুরোধ রেখো—তুমি আমার পরিচয় জানতে চেয়ো না। আমি বলতে শুধু আমিই। এর বেশী জানতে চাইলে দুঃখ পাব।

সফি চুপ করে থাকে।

মিনতি আবার বলে—আমার জন্য তোমার এত ভাবনা! সত্যি বড় অদ্ভুত কিন্তু। তবু জেনে সুখী হ'লাম যে এ জগতে আমার জন্য অন্তত একজন মানুষও ভাবে।

উভয়ের মাঝে কিছুক্ষণ মৌনতা বিরাজ করে। বাইরে ঝড় ক'মে এসেছে, কিন্তু বৃষ্টির অবিরল ধারা। মিনতির অন্তরের ঝড়ও

থেমে যাচ্ছে, কিন্তু অশ্রুর ফল্গুধারা কি প্লাবন বইয়ে দেবে? মিনতির দেহে অকারণ কম্পন। অস্থিরতায় ব'সে পড়ে সে।

সফি খাবার মুখে দিয়ে প্রশ্ন করে—তোমার চেহারা এমন হয়েছে কেন মিনুদি? নারী প্রগতি সঙ্গের মিটিং এ তোমার যে সুন্দর রূপ দেখেছিলাম সে রূপ কোথায় আজ?

মিনতি বাধা দেয়—থাক্। রূপের কথা আর নাইবা তুললে। আমার সত্যিকার রূপ তুমি দেখনি। আজ ত আমার কিছুই নেই। বিধাতা সব কেড়ে নিয়ে দিয়েছিলেন আমার রূপ। সে রূপ দেখলে তোমার চোখ ঝল্‌সে যেতো। মাঝে মাঝে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রূপ দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যেতাম। ভাবতাম এত রূপ যার, জীবনে কত যেন সুখ তার!

মিনতি আর বলতে পারে না। দীর্ঘশ্বাসে থেমে যায়। সফি বলে—তাহলে জীবনে সুখী হ'তে পারোনি?

—সুখী কতখানি হয়েছি জানিনে! যাক্। তুমি আমার সব কিছুই ত শুনলে। এবারে তোমার পরিচয়টা দাও।

সফি নিজেকে এতক্ষণে বিপন্ন মনে করে। কি ভাবে পরিচয় দিলে মিনতি সুখী হবে তাই ভেবে অস্থির হয়ে ওঠে সে। বলে—আমার পরিচয়? ভবঘুরে—স্রেফ্ একটা ভবঘুরে।

—আচ্ছা মেনে নিলাম তুমি ভবঘুরে। বাড়ী কোথায়?

— নদীয়ার রতনদিঘীর নাম শুনেছেন?

—রতনদিঘী! মিনতি থেমে যায়। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—সেই চৌধুরীদের বাড়ী যে গ্রামে?

সফি বিস্ময়-মাখা চোখে উত্তর দেয়—হ্যাঁ। চেনেন নাকি?

মিনতি কি যেন চিন্তা করে। তারপর স্বাচ্ছান্দ্য প্রকাশে বলে —চেনা—মানে শুনেছি। তুমি সেই গ্রামের ছেলে? যাক্—বলত কি নামে তোমায় ডাকবো?

—সফি। অবশ্য আর একটা নামও আমার আছে। ছোট বেলায় মা আমাকে চুণী বলে ডাকতেন।

—চুণী! বেশ সুন্দর নামত! আমার কাছে তুমি ওই নামেই পরিচিত থাক। কি বল?

ঝড় বৃষ্টির আবার প্রাবল্য। পৃথিবী তাণ্ডবের গর্জ্জনে ভীত। অশনি সংঘাতে দিগন্ত কম্পিত। কিন্তু মিনতি ভ্রূক্ষেপহীন।

মিনতি চিন্তামগ্ন। তার চিন্তার ধারা আজ আত্মকেন্দ্রিক। কী সুন্দর সুদৃঢ় সফির দেহ। কত পৌরুষ আছে ও-দেহে? মিনতি এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। যে নারী পুরুষের আধিপত্য অস্বীকার করেছে—সে আজ প্রমত্ত খেলায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়—ফিরে আসতে চায় ছোট্ট মিনাতে। সফির ব্যক্তিত্ব; পৌরুষ এবং অনাসক্তি তাকে মোহাবিষ্ট করে। সে যাচাই করতে চায় পুরুষের বাহুতলে নারীদের আত্মসমর্পণে কেন এত মাদকতা। কিন্তু সাবধানী সে। তার খেলা প্রলেপনে ঢাকা। তবু খেলতে সে চায়। নেউল যেমন সাপকে নিয়ে খেলে, ক্ষুধিত মার্জ্জার যেমন খেলে তার শিকারকে নিয়ে।

মিনতির আজ একি হ'ল? তার চোখে আজ কিসের উন্মত্ত নেশা? কোন্ কামনায় সে আজ অস্থির-চিত্ত? বুকে তার কোন যাতনা তুলেছে অসহ্য তুফান? দীর্ঘশ্বাস ত্যাগে নিজেকে হাল্কা করতে চেষ্টা করে সে। কিন্তু অন্তরের হাঁপরে যে অগ্নিবাষ্প ধূমায়িত তা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগে শেষ করা অসম্ভব। অসম্পূর্ণ মিনতি, অপূর্ণ তার কামনার সাধ; ব্যর্থ তার জীবন।

মিনতি ছুটে গিয়ে দরজা খুলে ভয়ঙ্করী পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করে। চিত্ত দোলায় যে কামনা গুমটের সৃষ্টি করেছিল, তা তাণ্ডবের ব্যাকুল আর্ত্তনাদে প্রাণ ফিরে পায়। যে ক্ষিপ্ত জৈব জাগরণ তার মনের কোনায় ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছিল, তা বিশ্বের প্রলয়ে প্রশান্তি লাভ করে। মেঘান্ধ প্রকৃতির অরূপ অঙ্গে অপরূপের জাল বিস্তার

করেছে বিদ্যুৎ! বজ্রগম্ভীর নির্ঘোষে হাহাকার ব্যক্ত করেছে যন্ত্রণাময়ী ধরিত্রী। ব্যথা-অশ্রু ঝরে পড়েছে বৃষ্টির ধারায় রূপ গ্রহণ ক'রে। বিশ্বের এ বিরাট আলোড়ন মাঝে মিনতি তার জীবনের অভিব্যক্তি খুঁজে পায়। সজাগ হয়ে, সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়ায় সে। চোখ ভ'রে চেয়ে দেখে সফিকে। চোখের ক্ষুধাও এত তীব্র হয়?

সফি বলে—এবার যাই মিনুদি।

শান্তকণ্ঠে আবেদনের সুরে মিনতি বলে—কোথায় যাবে? ঝড়-বাদলের রাত—মেঘের গর্জ্জন—বজ্রপাত হচ্ছে মুহুর্মুহু। এ দুর্যোগে পথে নেমে কেন বিপন্ন হবে?

—কিন্তু ক্যাম্পে আবার যে অনেক কাজ।

—থাক শত কাজ। তবু তুমি যেতে পারো না। কি করে যাবে বল? আর কেনই বা যাবে?

সফির শতচেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রকৃতির ঘনঘটা আর মিনতির চোখে মায়া তাকে আট্‌কে রাখে।

গভীর রাতে সফির ঘুম ভাঙে। বিশ্ব সংসারে তাণ্ডব তখন থেমে গেছে। সফি কত কি যে চিন্তা করে। মিনতির মত ঐশ্বর্য্যশালিনী একজন বোনকে পাওয়া যে কতবড় পাওয়া তাই চিন্তা করে সে। এ যে গুপ্তধন কুড়িয়ে পাওয়া।

প্রভাতে মিনতির ভারী কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল। বিস্রস্ত কেশে, পাণ্ডুর মুখে, ক্লান্ত চোখে মিনতি এসে দাঁড়াল। রাতের মানসিক ঝঞ্ঝায় সে কেমন যেন বিধ্বস্ত, বিক্ষুব্ধ, বিষণ্ণ। তার চোখে মুখে উদ্দাম ব্যক্তিত্বের ছাপ নেই—চঞ্চলতার চিহ্নমাত্র নেই। আছে শুধু আত্মসমর্পিতা নারীর সুমধুর স্থিরতা। সে আজ সত্যি মিনতি। মিনতি-মাখা তার চোখ, দেহময় সকরুণ মিনতির সুর ও ছন্দ। ম্লান মুখে স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে মিনতি। বলে—ভাল ঘুম হয়ত হয়নি তোমার!

—কেন, বেশ ত ঘুমিয়েছি।

—শীতে কষ্ট পেয়েছ খুব। যে বাদলা রাত!

—শীত। মোটেও না। কারুকার্য্য-খচির গাত্রাবাস দেখিয়ে সফি বলে—রাতে কখন যে বয় এটা দিয়ে গেছে ……

মিনতি মৃদু হেসে উত্তর দেয়—ওরা কেউ আসেনি। এসেছিলাম আমি। মাঝরাতে এসে দেখি হিমেল বাতাসে তুমি শীত অনুভব করছ। জড়সড় হয়ে বিছানার একপাশে পড়ে আছ। তাই আমার চাদরখানা দিয়েছিলাম তোমার গায়ে।

সফি বিস্ময় প্রকাশে বলে—তাহ'লে তুমি দিয়ে গেছ! সত্যি তুমি মহৎ মিনুদি।

মিনতি বাধা দেয়—মহৎ না ছাই! মিনতিও নারী, দেবী নয়।

—কিন্তু নারীও মহৎ হয়, উদার হয়—শ্রদ্ধেয়া হয়।

—মানি! কিন্তু সব কিছু হয়েও সে নারীই থাকে। নারীত্বের ওপরে নারী যা কিছু হয়, তার সবটুকুই যে বাড়াবাড়ি। আসলে সে রক্ত মাংসের দেহে একান্তভাবে নারী—শুধুই ভোগের সামগ্রী। নারীর রূপ লাবণ্য, তার দেহ সৌষ্টব—সব কিছু পুরুষের কামনা নিবৃত্তির জন্যই।

—তোমার এ যুক্তি আমি মানিনে।

—আজ না মানলেও একদিন বাস্তব জীবনে মানবে। মিনতি সহসা কথা ঘুরিয়ে নেয়। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—আমার কিছু টাকা আছে। নিয়ে একটা ব্যবসা আরম্ভ কর।

সফি বিস্ময় প্রকাশে বলে—আমার যে টাকার প্রয়োজন এ কথা কে বল্লে? আর আমি ব্যবসা করব, তাইবা কে বলেছে?

—আমার মন। তোমার চেহারায় রয়েছে দৈন্যের ছাপ। সারারাত ধ'রে তোমার কথাই চিন্তা করেছি। এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমুতে পারে নি।

—বড় অদ্ভুত কিন্তু।

শুধু অদ্ভুত নয়—মর্ম্মান্তিকও বটে ! কেনই বা এ মর্ম্ম বেদনা তাও জানিনে। আমার চলার পথে এতকাল যারা এসেছে তারা দু'হাতে দিতে চেয়েছে ঐশ্বর্য্য। কিন্তু তাতে মন বসেনি। নিজেকে বরং ভারী ব'লেই মনে হয়েছে। কিন্তু তুমি এসেছ রিক্ত হস্তে। তোমার মত এমন আর্থিক দৈন্য নিয়ে এবং মনের ঐশ্বর্য্য ঢেলে কেউ আমার জীবনপথে আসেনি। তাই তোমাকে ভুলতে পারি না। তোমার সৎসাহসকে, তোমার দেশপ্রেমকে, তোমার জীবনের কঠোর ব্রতকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। মৃত্যুকে যারা ভয় করে না তারাই পারে জাতির দেহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে। তারাই নবযুগের সৃষ্টি করে।

সফি বাধা দেয় —কি সব বড় বড় কথা যে বল মিনুদি। তুমি সত্যি অভিনেত্রী—চিত্র তারকা।

মিনতি উত্তর দেয়—চিত্রতারকা মিনতির মৃত্যুহয়েছে। আমি আর বোম্বে ফিরে যাবো না। কিন্তু তোমাকে আমি চাই। থাকবে আমার পাশে ?

সফি হাসে। বলে—আমাকে দিয়ে কি করবে তুমি ?

—অনেক কিছু। আমার জীবনে মোড় ঘোরাতে তুমিই শুধু পার। বল। যদি আপত্তি না থাকে—যদি নিজের ব্যক্তিত্বে আঘাত না পাও—যদি মনে কর মিনতি তোমায় খাটো। করে দেখবে না তাহ'লে আমার এখানেই তুমি থাক।

সফি চিন্তা করে—মিনতি কতো বড়। আরতীর কথা আজ তার মনে পড়ে। রাজবন্দী সমর মুখার্জ্জির বোন আরতী। দেশের জন্য মেয়েটির কত ত্যাগ। দেশকে যে ভালবাসে, দেশের জন্য যে জীবন উৎসর্গ করে, আরতী তারই কাছে নিঃসঙ্কোচে বিলিয়ে দেয় তার সব কিছু। ও যেন দেশবরেণ্যের পুরস্কার! সত্যি আরতীও তাকে এমনিভাবে মর্যাদার সঙ্গেই ভালবাসে ;

তার চিন্তার মাঝখানে মিনতি বলে—কই' উত্তর দাও।

সফি শান্ত কণ্ঠে সহাস্যমুখে বলে—এত মানুষের সেবককে তুমি একা কেন বেঁধে রাখতে চাও মিনুদি? আমি আসবো। অবসর মিললেই অসবো। কারণ তোমার মত নারীর সান্নিধ্য আমার একান্ত প্রয়োজন। তোমাকে ভুলতে পারবো না, মিনুদি।

(১৩)

খিদিরপুর ডকে শ্রমিক ধর্মঘটের আয়োজন চলেছে। সফি শ্রমিকদের বুঝিয়ে বললো—এ সংগ্রাম কারও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়—জতীয় স্বার্থের খাতিরে। রুটির জন্য সংগ্রাম—ন্যায্য অধিকার আদায় ক'রে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম। পৃথিবী কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। প্রকৃতির অজস্র সম্পদ। জীবকুলের প্রয়োজন মিটাবার জন্য মহান বিধাতার মুক্তহস্ত দান। সহস্র লক্ষ মানুষকে বঞ্চিত ক'রে মুষ্টিমেয় মানুষের বিলাস-শয্যা সাজাবার জন্য পৃথিবী নয়।

পঞ্চু যুবক হ'লেও বিরাট একদল শ্রমিকের সর্দার সে। পঞ্চু উত্তর দেয়—তা কখনই নয়। আমরা খেয়ে প'রে বেঁচে থাকার মত পারিশ্রমিক চাইব। আমাদের ন্যায্য দাবী হিসাবেই চাইব। আমরাই ত সব কিছু গড়ি।

সফি দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দেয়—হ্যাঁ, পঞ্চু। পৃথিবীতে যত সুরম্য প্রাসাদ দেখ, যত আশ্চর্য্য বস্তু দেখ—সে সবের সৃষ্টির মুলে রয়েছে তোমাদেরই শ্রম! তোমরাই দেশের আসল শক্তি! প্রতিটি

মানুষের শ্রম মিলিয়ে গড়া হয় নগর, জনপদ, প্রতিষ্ঠান। রাজপ্রাসাদ থেকে পর্ণ কুটির পর্যন্ত তোমরাই গড়েছ। কিন্তু স্বার্থন্ধ ওপরের মানুষগুলো কোনদিন চিন্তা করেনা, ক্ষুধিত নরনারীর কত শ্রম, কত নিঃশেষিত জীবনীশক্তি, কত ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে আছে তাদের প্রাসাদের ইটের স্তরে, প্রতিষ্ঠান সমুহের প্রতিটি অংশে।

পঞ্চু তার সঙ্গীদের লক্ষ্য ক'রে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে – হ্যাঁ, সেই কথাই ওদের জানিয়ে দেবো। ভাইসব! কাল আমরা মিছিল বার করবই। তাতে আমাদের মৃত্যু হয় হোক! তিলে তিলে অনাহারে মরার চেয়ে একবারে মরা অনেক ভাল।

সফি উৎসাহ দেয়—আমিও তাই বলি। মরণের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সবাইকে! তোমাদের এ মৃত্যুর মাঝে আছে ভবিষ্যত বলিষ্ঠ জীবনের সন্ধান। ত্যাগের মাঝে গ'ড়ে উঠুক জাতীয় জীবনের উন্নতির সোপান। মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন মৃত্যুর মাঝে নব জীবনের সাড়া দিয়ে যাও। জেনো, কারও অভাবে পৃথিবীর কোন সংসার অচল হয় না। শুধু সাময়িক অভাব-বোধ মাত্র। জীবনী শক্তির উৎকর্ষের মাঝেই জীবন। লোলচর্ম্ম, পঙ্গু এবং স্বাস্থ্যহীন মানুষের মাঝে নতুন জীবনের সন্ধান নেই। ওরা ক্লান্ত।

ব্যাপক ধর্ম্ম ঘটের আভাস পেয়ে সরকার পক্ষ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কঠোর দমন নীতির পক্ষপাতি তারা।

কিন্তু গোলামী মানুষকে অমানুষের পর্যায়ে নিয়ে যায়। শ্বেতাঙ্গ মনিবদের ইঙ্গিত পেয়ে এদেশি পোষ্যেরা কর্ম্মব্যস্ত হয়ে উঠলো। আত্মঘাতী কর্ম্মের মাঝে তারা চাক্‌রীর উন্নতির সন্ধান খুঁজলো। ফলে কুলি বস্তীতে এক অন্ধকার রাতে জ্বলে উঠলো আগুন। জাতীয়তাবোধ যাদের জাগেনি স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করা, আর অশিক্ষিত, প্রেম সম্বন্ধে অজ্ঞ কিশোরীর সঙ্গে প্রেমে মত্ত হওয়া সমান বিপদজনক।

শত শত বস্তীগৃহ পুড়ে শেষ হয়ে গেল। নগরীর দমকল গুলোকে ভালভাবে কাজে লাগাতে দেওয়া হ'ল না! নানা মিথ্যা কৈফিয়ত দিয়ে দমকলের অসুবিধার কথা জনসাধারণকে খবরের কাগজের মারফতে পরের দিন জ্ঞাত করান হ'ল। সত্যকে ঢাকবার জন্য মিথ্যার বেশাতী আরম্ভ হ'ল দিনের পর দিন! লাক্ষ লাক্ষ কাগজ ছাপা হল এবং বিতরণ করা হ'ল—যার প্রয়োজন ছিলনা মোটেই। জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার হ'ল এমনিভাবে। এ অপব্যবহারের কৈফিয়ত চাওয়াও নাকি অপরাধ!

বস্তীগুলো পুড়ে গেল। সংগ্রামী মানুষের দল স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে বিব্রত হ'য়ে পড়লো। ওদের দাবীর কণ্ঠ নির্ম্মমভাবে করা হ'ল রুদ্ধ। হাজার হাজার মানুষের ক্ষতির মাঝ দিয়ে ধর্ম্মঘট বানচাল ক'রে শাসক সম্প্রদায় উল্লাসে খালি করলো মদের বোতল।

কুলিদের দুঃখে সাড়া দেয় দরদী মানুষের দল। সাহায্য ভাণ্ডারে অর্থ জমে উঠে। পোড়া মাটির বুকে আবাস গৃহের হয় নব পত্তন। বৃক্ষতল থেকে বিশীর্ণ নরনারীরা আবার একদিন নতুন বস্তীগৃহে বিছায় তাদের শয্যা। পুরাতনের ধ্বংসস্তুপ মাঝে নতুনের মহাজাগরণ। তারা বুঝতে পারে—তারের জন্য দরদ দেখাবার মত একদল মানুষ গড়ে উঠেছে এদেশে—যারা স্বার্থন্ধ নয়—যায়া জাতির ভিত্তিমূল গ'ড়ে চলেছে নিঃশঙ্কচিত্তে।

তাহ'লে মরতে ভয় কেন? মৃত্যুর মাঝেই ত জীবনের সাড়া। সত্য ও ন্যায়ের দাবী জানাতে গিয়ে একটা মানুষের মৃত্যুই জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট। লাখো লাখো মানুষ নিত্য মরে, কিন্তু তাদের জন্য সবার শোক নয়। জন-গণ-মন তারই জন্য শোকার্ত্ত হয়, যে জনগণের জন্য বিলিয়ে দেয় নিজেকে।

পক্ষান্তরে আর একদল নরপশুর চাষ হয়েছে এদেশে। তারা বিগত কয়েকশো বছর ধ'রে বেড়ে উঠেছে আত্মসর্ব্বস্ব হীনতা নিয়ে।

নিজেদের লাভের অঙ্কে যে তৃপ্তি আসে তাতে অপরের চরম ক্ষতির যে কি যন্ত্রণা; তা কোনদিন বুঝতে চায় না তারা। নিজ নিজ মা-বোনকে লজ্জা ঢাকাবার জন্য যারা ব্যস্ত, তারাই অপরের মা-বোনদের উলঙ্গ দেখে পায় আনন্দ! এ হীনতা, এ জঘন্যতম পাশবিকতা! আশ-পাশের মানুষদের মাঝে নানাভাবে অভাব সৃষ্টি ক'রে স্বার্থসিদ্ধির নীচতা। ওরা নরপশু! ওরা জাতীয় জীবনের পরম শত্রু।

কুলি বস্তী নির্মাণের জন্য মিনতি পাঁচটি হাজার টাকা গুণে দেয় সফির হাতে। বলে—যত শীঘ্র পার ওদের বাসস্থান তৈরী করে দাও।

সফি বিস্ময়-বিমূঢ় কণ্ঠে বলে—এত মহৎ তুমি মিনুদি। তোমার অর্থ আছে—তাই এভাবে দান করতে পারো।

মিনতি হেসে উত্তর দেয়—তোমার অর্থ নেই—আছে দেশত্ববোধ। তাই নিজেকে উৎসর্গ করেছ অকাতরে, সবার জন্য। তুমি মৃত্যুহীন, তাই ত তোমাকে ভালবাসি।

—ভালবাস?

—হ্যাঁ, সত্যি তোমাকে ভালবাসি। সে কথা তুমি বিশ্বাস করতে পার না?

—বিশ্বাস আমার আছে। তুমি আমায় ভালবাস, স্নেহ কর, আমার পথের কাঁটা সরিয়ে দাও, তা, জানি। তুমি যে আমার মিনুদি। পঞ্চু কি বলে জান?

—কি?

—ও নতুন বিয়ে করেছে। বউটি ওকে নিমেষের জন্য বাইরে যেতে দেয় না। ধর্মঘটের নামে মেয়েটি যেন হাড়ে হাড়ে চটা। —কখন কোন হাঙ্গামায় স্বামী বেচারাকে হারাতে হয়, তাই ওকে ঘরের কোণায় আগ্‌লে রাখে।

—পঞ্চু কি করে তখন ?

—বাইরে যাবার যার ডাক আসে সে কি মিথ্যে প্রেমের খেলায় মেতে থাকে ? পঞ্চু বাইরে চ'লে যায়। ছোট্ট ঘর সাজানোর চেয়ে যে সমগ্র দেশকে সাজানো অনেক বড়, সে কথা পঞ্চু জানে।

মিনতি প্রতিবাদ করে—পঞ্চু ছাই জানে। তোমার মতই সে-ও মোহগ্রস্ত—অসাফল্যের পেছনে মোহগ্রস্ত। যারা ঘরকে চেনে না তারাই পরকে চেনার ভান করে শুধু। তাদের সাফল্য আসতে অনেক দেরী। আগে ঘর দেখতে শেখো।

সফি বিমূগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। মিনতি কোথায় আঘাত দিচ্ছে ?

—তা'হলে তুমিই বা দেশের জন্য এত দান কর কেন ? তার মাঝে কি দেশাত্মবোধ নেই তোমার ?

—না। তারমাঝে জড়িয়ে আছে বিরাট এক স্বার্থ। আমি এ দানের মাঝে চাই প্রতিদান ; যদিও নিজে কোনদিন কারও দানে প্রতিদান দিইনি। আমি চেয়েছিলাম বড় হ'তে। কিন্তু বড় হ'তে গিয়ে ছোটই হয়েছি। নানা ঘাত প্রতিঘাতে আমার মাঝে এসেছে দারুন পরিবর্ত্তন। আমি আজ পঞ্চুর ছোট্ট বউয়ের মত, ঘর বাঁধতে চাই ; আত্মকেন্দ্রিক হয়ে।

—বেশত। শুরু কর ঘর-সংসার। কে তোমাকে বাধা দিচ্ছে ? চিত্র তারকারা তোমারই মত পেশাগত জীবনের ওপর বিতশ্রদ্ধ হয়। তারপরে চায় ঘর বাঁধতে—সংসারী হতে।

কথার মাঝে কে একজন সংবাদ দিয়ে গেল ; ডকের কুলি-বস্তীতে গুলি চলেছে—বহুলোক হতাহত। সফি রাস্তার দিকে মুখ বাড়ায়।—তাইত ! টেলিগ্রাম বের হয়েছে। রাস্তায় হকারের দল চীৎকার ক'রে টেলিগ্রাম বিক্রী করছে। সফি মূহূর্ত্তে প্রস্তত হয়। মিনতির বাধা ঠেলে সে ছুটে যায় কলকাতার পথে। মিনতি

অসহায়ের মত চেয়ে থাকে। অকারণে তার বুক দুরু দুরু ক'রে কেঁপে ওঠে। অমন করে বুক কেন কাঁপে? মিনতি নিজকে নিজেই প্রশ্ন করে।

চারদিন পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সফি ঘরে ফিরে এলো।—সব ব্যর্থ মিনুদি। সব ব্যর্থ। বিশ্বাসঘাতক বেঈমানের দল? ধরিয়ে দিলে—সবাইকে এমনিভাবে ধরিয়ে দিলে!

শান্ত কণ্ঠে উত্তর দেয় মিনতি—কি হয়েছে সব আমি শুনেছি। কিন্তু পঞ্চুর বউয়ের কি করলে বল?

—কি করতে পারি আমি? মাত্র ছ'মাস আগে ওদের বিয়ে হয়েছিল। স্বামীর মৃতদেহের ওপর বৌউটির সে কি করুণ হৃদয়-বিদারক কান্না। পঞ্চুকে আমিই উদ্বুদ্ধ করেছিলাম দেশের কাজে। কচি মা-বাপহারা মেয়েটি। সংসারে এখন আর কেউ রইল না ওর। আমাকে দেখে বললে—তুমিই ত আমার স্বামীকে মারলে। তোমারই জন্য সে দিনরাত স্বদেশী ক'রে বেড়াত। এত বড় সর্ব্বনাশ আমার কেন করলে?

আমি উত্তর দিতে পারিনি। নীরবে চ'লে এসেছি। আমাদের দলের অনেকে গ্রেফতার হয়েছে। আমারও নাকি···

মিনতি উঠে বসে। বলে—জানি। পরোয়ানা বের হয়েছে। এখন উপায়? কি করবে বল?

—কিছুই ভাবতে পারছি না।

মিনতি গত কয়েকদিন ধ'রে সুযোগের সন্ধানে ছিল। চুণীকে একান্ত ক'রে পেতে হ'লে তাকে ভিন্ন পরিবেশে গড়ে তুলতে হবে। এখানকার স্বদেশী আন্দোলনে মেতে থাকলে তাকে জয় করা অসম্ভব। তাই তাকে কোথাও সরিয়ে নেবার! চেষ্টায় ছিল

মিনতি। চুণীর বর্ত্তমান অবস্থা তাকে সে সুযোগ এনে দিল। মিনতি বলে—হ্যাঁ, ভাববার সময়ও এটা নয়। গুপ্তচরের দল ভয়ানক সজাগ। তুমি ধরা পড়লে সব কিছু ভেঙ্গে যাবে। ওদের অনুপ্রেরণা যোগাবার কেউ থাকবে না। আর শুধু শুধু জেল খেটে লাভ কি? তার চেয়ে আমার সংগে চল। পশ্চিমে কিছুদিন কাটিয়ে আসবে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের রাজনীতি সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানও বাড়বে।

—প্রস্তাব ভাল। কিন্তু কবে ফিরবে? (পঞ্চুর বউটার কিছু একটা ক'রে যেতে হয়)

মিনতি মৃদু হেসে উত্তর দেয়—যদি নাই ফিরি ক্ষতি কি? সবখানেই অশান্তি। বেঁচে থেকেই বা কি লাভ বল?

সফি উদাসীর মত উত্তর দেয়—সত্যি, এমনভাবে বেঁচে থেকেও লাভ নেই। এতবড় বিশ্বাসঘাতকের দেশ, এত আত্মভোলা জাতি। এখানে বেঁচেও লাভ নেই। ওই ত পঞ্চু গেল, রহমান গেল, ভিখু গেল। কি হবে এসব করে? সারা জাত যেখানে নিষ্ক্রিয়, অসার মৃত, সেখানে কি হবে দেশের নামে আত্মবলি দিয়ে? আমি যাবে তোমার সঙ্গে! সত্যি কিছুদিনের জন্য কোথাও যাব?

—কিন্তু পঞ্চুর বউয়ের কি করবে?

—কিছুই করব না। শুধু কিছু টাকা কারও মারফতে পাঠিয়ে দেবো। বড় দুঃখ যে বউটি সন্তান-সম্ভবা।

—বল কি? সর্ব্বনাশ!

—সর্ব্বনাশ নয় মিনুদি। জাতির বুকে এমন লাখো লাখো সর্ব্বনাশের মাঝে জাগবে জাতিয়তাবোধ। অনাগত শিশুর মা সে। বুকে তার নির্ম্মম আঘাত-ব্যথা। জ্বলে পু'ড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে যুবতী মায়ের বুক। তাই অন্তর্দাহ সংক্রামিত হবে বংশপরম্পরায় সন্তান-সন্ততির মাঝ দিয়ে। তারাই হবে খাঁটি স্বদেশ-প্রাণ মানুষ।

—কি সব পাগলের মত বলছ তুমি ?

—ঠিকই বলছি মিনুদি। অসংখ্য একক জীবনের সমষ্টিগত ক্ষোভ জাতীয় জীবনে একদিন সত্যিকার আঘাত হানবে। সেদিন দেখতে পাবে মৃতপ্রায়, আত্মভোলা জাতি আবার সজাগ হয়েছে! কিন্তু সে জাগরনের মাঝে এতকালের অপদার্থ স্বার্থবাদীদের চিনে রাখতে হবে। নইলে তারাই যদি দেশের ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তা হয়, তবে আজকের আর সেদিনের মধ্যে তফাৎ থাকবে না এতটুকুও। সব ব্যর্থ হবে—কায়েম হবে বিভীষিকার রাজত্ব।

(১৬)

মধ্য ভারতের এক জনবহুল শহর। যুদ্ধের বাজারে আমেরিকান ও বৃটিশ সৈন্যদের দৌরাত্ম্যে এ শহরের পুরাতন সভ্যতার আবিলতা দেখা দিয়েছিল। সেদিনও তার জের চলেছে পুরোদমে। শহরের অনেক ভদ্র পরিবারে ঢুকেছে অনাচার। বারবণিতায় ভ'রে গেছে অলি-গলি।

চুণী এখানে এক কণ্ট্রাকটরের অধীনে কাজ করে। স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করতে সে বদ্ধপরিকর। মিনতির নিষেধ সে শোনে না। মিনতির অর্থও সে গ্রহণ করে না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত চুণী ঘরে ফিলে এলো। তাকে লক্ষ্য ক'রে মিনতি বলে—ইস্! তোমার চেহারা যে পোড়া কাঠ হয়ে গেছে অসুখ করেনি ত।

—অসুখ ত বটেই। তবে দেহের চেয়ে মনের। রাস্তাঘাটে আর চলবার উপায় নেই। যুদ্ধের বাজারে এ দেশের মেয়েরা সতীত্বের বিনিময়ে এমন জঘন্যভাবে অর্থ উপার্জ্জনে মেতেছে ভেবে আশ্চর্য্য হতে হয়।

মিনতি উত্তর দেয়—আশ্চার্য হবার কিছুই নেই। এর জন্য দায়ী আমাদের সমাজ। সে সমাজ নারীকে রক্ষা করতে জানে না। চিরকাল ধরে আমাদের সমাজপতিরা নারীকে নিয়ে খেলেছে ছিনিমিনি। অসহায়, অক্ষম করে রেখেছে নারীকে।

—হ'তে পারে। কিন্তু তাই ব'লে অসভ্যপনা করতে শেখায়নি। সমাজদেহে দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনা ওরা।

মিনতি হাসি ফুটিয়ে বলে—যাদের জীবনকে পঙ্গু ক'রে পতিতা ব'লে বাইরে ফেলে দিয়েছে তারা ত সত্যি আবর্জ্জনা। আর সে আবর্জ্জনা থেকে দুর্গন্ধ বের হবে তাতেই বা আশ্চার্য্য কি! কিন্তু সে দুর্গন্ধ তাদের জীবন-ক্লেদের নয়, তার জন্য দায়ী অনাচারে এবং অবিচারে ভর্ত্তি আমাদের সমাজ ব্যবস্থা।

—এ তোমার মিথ্যে আক্রোশ মিনুদি। প্রত্যেক ধর্ম্মই কিন্তু সত্য ও সনাতন।

মিনতি ব্যঙ্গের স্বরে উত্তর দেয়—সনাতন ধর্ম্মই বটে! যে ধর্ম্মে নারী ও পুরুষের হেতুহীন বিভক্ত নিয়ম, যে ধর্ম্মে নারী মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিতা—যে ধর্ম্মের কুশাসনে নারী ডুকরে কাঁদে, সে আবার সনাতন ধর্ম্ম! ফুটন্ত যৌবন নিয়ে যে নারী বিবাহিতা জীবনে সর্ব্বস্ব সঁপে দিল স্বামীর চরণে—সেই নারীই তার স্বামীর অকাল-মৃত্যুতে ভবিষ্যৎ জীবনের সর্ব্বসুখে হবে বঞ্চিতা। বিধবার সহজ চলার পথে সমাজ খাড়া করে নিষেধের প্রাচীর! আমৃত্যু বৈধব্য তার জীবনের অভিশাপ। অথচ স্ত্রী বিয়োগের পর পুরুষদের বারংবার স্ত্রী গ্রহণে নেই একটুও বাধা।

মিনতিকে উত্তেজিত করে চুণী—তবু ওদের নারীদের সংযমের দিকটা ভাবো একবার।

মিনতি প্রতিবাদ করে—তা আবার ভাববো না। যারা লোকচক্ষুর অন্তরালে দৈহিক ক্ষুধা মিটিয়ে বড় বড় বুলি আওড়ায় তারাই বড় সংযমী, বড় সাধু। অনূঢ়া জীবনে ভ্রূণ হত্যা ক'রে পরবর্ত্তী কালে সমাজ জীবনে আদর্শ সতী হয়ে আছেন এমন অনেক নারীর সন্ধান আমি রাখি। কুলটা নারীদের যৌন-জীবন তলে অবাঞ্ছিত আত্মহুতি দিয়ে বহু পুরুষকে সাধু সাজার ভান করতেও দেখেছি। তবে বড়ঘরে সবই চাপা পড়ে। শুধু গরীব, দুর্ব্বল-যারা চিরন্তনী দেহের কামনায় পাপ (?) করে লুকোবার বুদ্ধি রাখে না, তারাই সমাজের রূঢ় শাসনে হয় পতিতা। তারপর প্রয়োজনের তাগিদে অনন্যোপায় হয়ে বাজারে বিক্রী করে তাদের ঘৃণ্য অরুচির দেহ। সমাজের কর্ণধাররা তখন এসব পতিতাদের বুকের মাঝে বিলাসের অবসর খোঁজে। সমাজ পরিত্যক্তা নারীর সর্ব্ব অঙ্গের ছাপ গায়ে মেখে গৃহে ফিরে এসে সতী অঙ্কলক্ষীর পূত দেহে সেই কলুষ দেহ মিলিয়ে দিতে তারা এতটুকু সঙ্কোচও বোধ করে না তখন। রক্ত মাংসের দেহে আবার কলুষিতা।

চুণী উত্তর দেয়—আচ্ছা মেনে নিলাম তোমার সব কথা। কিন্তু সমাজ পরিত্যক্তা হ'লেই যে বারবণিতার জীবন যাপন করতে হবে একথা কি শাস্ত্রে লেখা আছে?

—শাস্ত্রের কথা আর বলো না। শাস্ত্র ত প্রয়োজনের তাগিদে শ্রেণীবিশেষের সুবিধার্থে লেখা। ও নিয়ে আর তর্ক করোনা। সমাজ জীবনে ব্যর্থ হয়ে সব মেয়েরা ওপথে যায় না। তারই কুপথে যায়, যাদের অন্য কোন উপায় থাকে না। তা'ছাড়া যৌন-ক্ষুধা মিটিয়ে ত আর পেটের ক্ষুধা মেটানো যায় না। পেট আমৃত্যু ক্ষুধার ভাণ্ড নিয়ে হাহাকার করে। যৌনক্ষুধা উত্তেজনার তৃপ্তি কামনা করে

কিন্তু পেটের ক্ষুধা নিজ নিজ অস্তিত্বের প্রয়োজন ঘোষণা করে। বার্দ্ধক্যের সাথে সাথে যৌন-ক্ষুধার শৈথিল্য আসে, কিন্তু পেটের আগুন থাকে আমৃত্যু প্রজ্জলিত। তাই বলছি—দৈহিক তৃপ্তির জন্য ওরা ওপথে যত না নেমেছে, তার চেয়ে জীবিকার প্রয়োজনে নেমেছে অনেক বেশি ক'রে।

মিনতির দীর্ঘ বক্তৃতায় বিরক্ত হ'য়ে চুণী বলে—এবারে থামো। রাত অনেক হয়েছে।

মিনতি উঠে দাঁড়ায়। অপ্রতিভ কণ্ঠে বলে—সত্যি, অনেক তর্ক হয়েছে। বসো। ওদিকে রান্নার তাগিদ দিয়ে আসি। নতুন ঝি। কি যে করছে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে। খাবার ঘর থেকে মিনতি ফিরে এলো। চুণী তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম। নিঃশ্বাস প্রশ্বাশে কত যেন কষ্ট। চুণীর পায়ের দিকে দৃষ্টি পড়তেই মিনতি অবাক হয়ে চেয়ে থাকে—বাবুর যে জুতা খুলার অবসরও জোটেনি। এদিকে হাত ঘড়ির কাঁচ ভেঙে বন্ধ হয়ে গেছে। এমন হাস্যকর অবস্থান লক্ষ্য করে মিনতি মুখ বাড়িয়ে ডাকে—কামিনী! ও কামিনী। তোর বাবুর কাণ্ড দেখে যা একবার।

কামিনী দেতালায় উঠে আসতেই মিনতি বলে—বলত, এখন কি করি? না রেখেছে ঘরে যাবার রাস্তা' না পাচ্ছি ঘুম ভাঙাবার সাহস। এমনি করে পা মেলে রেখেছে যে—

মাত্র কয়েক দিন হ'ল কামিনী এ বাড়ীর কাজে লেগেছে। কিন্তু এ অত্যল্প সময়ের অবসরে সে অনেক কিছু লক্ষ্য করেছে। প্রথমতঃ এদের উভয়কে দম্পতি ভাবলেও উভয়ের পৃথক শয়ন-ব্যবস্থা তার যথেষ্ট সন্দেহের কারণ হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়ত দাম্পত্য-জীবনে বাবুটির অনাসক্তি সে লক্ষ্য করেছে। এ বয়সে এমন বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস বড় অসামঞ্জস্য বলে মনে হয়। কিন্তু চাকরাণী সে। এদের

দাম্পত্য জীবন নিয়ে আলোচনা করার কি প্রয়োজন তার? তাই মৃদু হেসে কামিনী বলে—বাবুর মেজাজ বুঝি খুব চড়া? কথা ত বলেন বেশ মিষ্টি মিষ্টি।

মিনতি উদ্দীপ্ত মুখে বলে—তা আবার নয়। কিন্তু এ কয় দিনেই দেখছি বাবুকে তুই চিনে ফেলেছিস্!

কামিনী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। অকারণে নিজের ইতিহাস বলতে থাকে—মানুষ চিনতে আমার সময় লাগেনা মা। কত মানুষ দেখলাম, কত ছেলেমেয়ে মানুষ করলাম। প্রথম যে বাড়ীর কাজে লেগেছিলাম তাদের ছেলে এখন জেলার হাকিম। সে হাকিমকে আমিই কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছিলাম। তারপর আরও কত ছেলে-মেয়ে মানুষ করেছি। তারা আজ বড় হয়েছে—পয়সার লোক হয়েছে। কিন্তু কামিনীর দুর্ভাগ্যের দিকে ফিরেও তাকিয়ে তারা দেখিনি কোনদিন।

কিছুক্ষন মৌন থেকে কামিনী আবার বলে—তোমাদের যদি একটা ছেলে থাকতো। আমি বুকে পিঠে ক'রে মানুষ করতাম মা। তোমাদের দু'জনের যা চোখ মুখ—আর গায়ের রঙ! ছেলে থাকলে ঘর আলো হয়ে থাকতো।

কামিনীর কথায় মিনতি অন্তরে জ্বালাবোধ করে। তার পরিপূর্ণ যৌবনে আগুন জলে ওঠে। কামিনী কি সব বলে। এতদিনের বন্ধ দুয়ার কামিনী এবার আল্‌গা ক'রে দেবে নাকি? মিনতি দৃঢ়ভাবে বাধা দেয়—তুই থাম্ কামিনী।

—এ কি আমার একার কথা? ছেলে-মেয়ে না হ'লে কি মা-বাপের সাধ পূর্ণ হয়? মা' না হ'লে মেয়েদের জন্মই বৃথা?

মিনতি শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে—তোর ছেলে মেয়ে ছিল?

কামিনী অশ্রু-সজল হয়ে ওঠে। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—হঁ্যা মা। একটা ছেলে আমার ছিল। সে পাঁচ বছরের হয়ে মারা

গেছে। তার মুখে 'মা' ডাক শুনে আমি তন্ময় হয়ে যেতাম। মনে হ'ত খোকা যেন আমার অঙ্গের পরতে পরতে জরিয়ে আছে! কতো আশা আমার। কিন্তু খোকা ঘুমিয়ে গেল। তাই ত আমার দাসীবৃত্তি। নইলে আমিও ভদ্রঘরের মেয়ে। লেখাপড়াও কিছু শিখেছিলাম। মা হওয়ার যে কি আনন্দ তা তুমি কেমন ক'রে বুঝবে মা। বুঝেছিলাম আমি।

কামিনী অশ্রুমুছে নীরব হ'ল। কিন্তু মিনতির নারী হৃদয়ে সে আজ কিসের সারা জাগাল? তার অন্তরের গহীন তলে কোন্ অনাগত শিশু আত্মপ্রকাশের জন্য আকুলি বিকুলি করছে? দেহের অণুতে পরমাণুতে কোন্ শিশুর 'মা মা' ডাকে গুমরে মরছে! কার কাল্পনিক জাগরণ মিনতির যৌবন তটে জাগায় আলোড়ন?

অস্থির-চিত্ত মিনতি নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—আমার আর বুঝে কাজ নেই কামিনী! রাত হয়েছে। তুই ঘরে যা।

কামিনী প্রস্থানের পর মিনতি অনেকক্ষন স্থানুর মত বসে থাকে। তার মনের প্রাঙ্গনে বেদনার কৃষ্ণমেঘ। সেখানে ব্যর্থতার অশ্রু বাদল। হৃদয়ের চাপা কান্নার অব্যক্ত আওয়াজ মিনতি স্পষ্ট যেন শুনতে পায়।

নারীত্বের আসল রূপ মাতৃত্বে। কামিনী আজ যা কিছু শুনিয়ে গেল তা অতি পুরানো কথা। তবুও যুগ যুগ ধরে এই পুরাতন চির নতুনের সাড়া জাগায় নারীর বসন্ত জীবনে। মিনতি নারী। তাই শাশ্বত এই বাণী তাকে আলোড়ন দিয়ে গেল। জীবনে সে কত মাকে দেখেছে—কত সন্তানকে মায়ের বক্ষ শোষন করতে দেখেছে। সন্তানের মুখে মায়েরা নিঃশেষ হয়ে গেছে, সন্তানেরা ফিরেও দেখেনি। অথচ সন্তানের মৃত্যুতে মায়েরা চিরকাল ধরে কেঁদেছে। কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছে—বধির হয়েছে। তবুও নারীর মা হবার বাসনায় ইতি পড়েনি আজও। অদ্ভুত মাতৃত্ব।

মিনতি শুধু মিথ্যে অভিনয় করে চলেছে। মিনার মৃতদেহের মাঝে সে একদিন চিত্র জগতে মিনতি রূপে জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু আজও কি তার অভিনয় করবার বয়স আছে? জোয়ারে দুকুল ভাষায়ে যে নদী একদিন সাগরের স্বপ্ন দেখেছিল তার উচ্ছ্বাস প্লাবন থেমে গেছে। আজ সে গত দিনের বহির্মুখী শাখা প্রশাখার নালা বেয়ে ফিরে এসেছে আপন গহ্বরে! আজ তার তীরে তীরে শ্যামলের আহ্বান—বন-বিহঙ্গের কলকণ্ঠ গীতি।

মিনতি আজ ছোট হয়ে মিনাতে চায় ফিরে যেতে। কিন্তু সেখানে বাস করে এক দাম্ভিক, নিষ্ঠুর প্রেমহীন কল্প-লোকের মানুষ। সে স্বামীকে ত্যাগ করেছে—বাপের সংসারে প্রীতির বাধন করেছে ছিন্ন, শত শত প্রেমিকের প্রেমকে করেছে প্রত্যাখান। তবু তার গত দিনের দৃষ্টি আজ ক্ষীণ। তার দৃষ্টি আজ বিশাল দিগন্তে নয়, গৃহের বাসর শয্যায়।

মিনতি অভিনয় করতে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেই বাঁধা পড়েছে। তার অন্তরের মণিকোঠায় কখন যে ভালবাসার অমর বীজ দৃঢ়ভাবে শিকড় গজিয়েছে তা সে নিজেই জানে না। সংসারে যে নারী পুরুষের আধিপত্যকে ঘৃণা করতো—যে নারী নারীর যৌন-জীবনকে জঘন্য বৃত্তির প্রশ্রয় মনে করতো—যে নারী নিজেকে স্বাবলম্বী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবতো, সে আজ ভেঙ্গে পড়তে চায় রুচির অতলে, নোংরা পাশবিকতার চূড়ান্ত খেলায়। অন্তরে তার প্রমত্ত কামনার ঝড় - সর্ব্বদেহে তীব্র আলোড়ন। নিপীড়িত হ'তে চায় সে ফেনীল তরঙ্গে। গত জীবনের কর্ম্মের জন্য সে অনুতপ্ত নয়। সম্মুখের বাস্তব খেলার আশাবাদী সে।

পাপ-পূণ্যের বিচার সে জানেনা। যা একদেশে পাপ, তা অন্য দেশে পাপ নয়; যা এক সময় পূণ্য, তা আবার কালের গতিতে পরিণত হয় পাপে। সুতরাং পাপ-পূণ্যের বিচার মিনতি করে না।

তার চিন্তা এগিয়ে যায় জীবনকে নিয়ে, যৌবনকে নিয়ে। সমাজ জীবনকে নিয়মের নাগপাশ তার কাছে যন্ত্রণাদায়ক মনে হয় সে ভাবে- ভোগের সামগ্রী সামনে রেখে অনাহারে শুকিয়ে মরা কি পাপ নয়? ক্ষুধার্ত্তকে আহার্য্য ভিক্ষে দিয়ে মানুষ পূণ্য অর্জ্জন করে। কিন্তু কামনার ক্ষুধায় কাতর জনকে দৈহিক তৃপ্তি দান ক'রে কেউ কি পাবে না এতটুকু পরকালের সঞ্চয়? আত্মীয় পরিজনের ভরণপোষণ ক'রে মানুষ কর্ত্তব্য পালন করে শুধু, কিন্তু আত্মজনের বাইরে, নিতান্ত অনাত্মীয়ের প্রতি অকুণ্ঠ দান করে তবে সে পায় পূণ্য। সেই দানের আহ্বানে একান্ত আকাঙ্ক্ষা তলে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে মানুষ কি পাবে শুধু ঘৃণা, শুধু দুর্ণাম, কলঙ্কের কালো দাগ? শুধু জৈব প্রয়োজন নিয়ে মানুষ মানুষ নয়। পবিত্র আকাঙ্খার পরিতৃপ্তিতে তার জন্মগত অধিকার। আত্মার বাসনা চরিতার্থ না করার নামই পাপ। ক্ষুধা-কাতর দেহ লোক-লজ্জার ভয়ে উপভোগ্য বস্তুর সময়োচিত ব্যবহার না করাই মূর্খতা। এক কথায় আত্মার পরিতৃপ্তিই জীবনের সার্থকতা—তার অপূর্ণতাই ব্যর্থতা। মিনতি আজ এ সত্যকে চরমভাবে উপলব্ধি করে। এতদিনের বিভ্রান্ত গতিকে থামিয়ে দিয়ে সে সত্যিকার জিবনকে উপভোগ করতে চায় সেই ত চিরন্তনী, সেই ত বাস্তব। সেই ত নশ্বর জীবদেহে অবর্ণনীয় সুখ।

মিনতি এতসব চিন্তা ক'রে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় ঘুমন্ত চুণীর কাছে গভীর উদগ্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে তাকে। কী সুস্থ সবল বাহু, কী বলিষ্ঠদেহ চুণীর। এ বাহু-তলে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে মিনতি নিপীড়িত হ'তে চায়। জীবনের বসন্ত খেলায় কেমন আবেশ মত্ততা—কত সুখ তাতে—সব কিছুই মিনতি উপলব্ধি করতে চায়। তার রুদ্ধ যৌবন ছাপিয়ে জাগে কামনার জোয়ার। রোমাঞ্চ-ঢেউ ওঠে প্রতিটি অঙ্গে— শিরা উপশিরা হয় চঞ্চল।

মিনতি অস্থির হয়ে ওঠে। সে নিজেকে পারে না আর ধরে রাখতে ? তার সর্বদেহে কামনা শিহরণ—অসহায়, অপারগ, অক্ষম মিনতি। সহসা মানসিক দুর্বলতায় সে আত্মসমর্পণ করে। চুণীর পদতলে ছিন্ন লতিকার ন্যায় বিলিয়ে দেয় নিজেকে। অদ্ভুত তার পরাজয়। সুউচ্চ পর্ব্বত চূড়ায় সমুদ্র গর্ভে নিমর্জ্জন যেন। ফণাময় কাল নাগিনীর মন্ত্র-মুগ্ধ প্রণতি যেন। অদ্ভুত। অপরূপ কল্পনাতীত। প্রশান্ত আবেশে চুণীর পা দু'খানা মিনতি বুকের মাঝে তুলে ধরে। হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করে ব্যর্থ-বিবশ নতমুখের নিস্পলক চাহনি দিয়ে। ধীরে, সন্তর্পণে পাদুকা উন্মোচন ক'রে চুণীর পদ-যুগলে মিলিয়ে দেয় মাংসল কপোল। গর্ব্বন্নোত শির আশ্রয় খোঁজে কোন্ জীবন সোপানে তা নিজেই পারে না সে বুঝতে।

সহসা চুণীর তন্দ্রা ছুটে যায়। নারীদেহের একান্ত পরশ সে অনুভব করে আপন দেহমাঝে। মিনতির উন্মত্ত দেহের মহাপ্রণতি লক্ষ্য করে বিস্ময়ে অভিভুত হয় চুণী। ত্বড়িৎ গতিতে পা সরিয়ে নিয়ে উঠে বসে সে। বলে—ছিঃ। একি করলে মিনুদি। তুমি আমায় পাতকি করবে নাকি ?

মিনতি সামলাতে পারেনা নিজেকে। তার উদ্বেল হৃদয় ছাপিয়ে কোথা হ'তে উঠে আসে অশান্ত ক্রন্দন। ব্যথা-অশ্রু ঝরে পড়ে বিশ্রী প্রবাহে। সে হারিয়ে ফেলে তার ব্যক্তিত্ব, এতকালের গর্ব্বিত আত্মবিশ্বাস। তারপর আকসাৎ শিশুর মত ডুকরে কেঁদে উঠে।

- একি ? তুমি কাঁদছ ? বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠে চুণী প্রশ্ন করে।

মিনতি নিরুত্তরে বারান্দায় চলে যায়। তারপর নিজেকে আয়ত্বে এনে কাছে এসে বসে—চল, খাবার খেতে চল।

চুণী প্রশ্ন করে—আগে বল, অমনভাবে কাঁদলে কেন ?

মিনতি উত্তর দেয় না। নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে শুধু। কি উত্তর দেবে সে ?

খাবার গৃহে দু'টি নিঃশব্দ প্রাণী! গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে সারাটি গৃহে। অব্যক্ত ক্রন্দন যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে মিনতির অন্তর ছেপে! পরিব্যাপ্তি তার গৃহের আনাচে কানাচে। ম্লানমুখী মিনতির প্রতি চেয়ে চুণী বলে—সংসারটি আমাদের বেশ হয়েছে, না, মিনুদি?

মিনতি বিপরীত দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে—হ্যাঁ।

—আর কিছু বলবার নেই?

না। তেমন মনের অবস্থা আমার নয়।

—কেন? মনের আবার কি হ'ল? তোমার মনে ত আবেগ চঞ্চলতা আসেনা কোনদিন।

মিনতি প্রতিবাদ করে—বকিয়ো না। শরীর খারাপ। খাবার খেয়ে ঘরে চল।

চুণী মৃদু হাসে। মিনতির কি হয়েছে আজ?

রাত অনেক হয়েছে। চুণী সবে এইমাত্র আলো নিবেয়ে দিল মিনতি নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল ঘরের মেঝেতে। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় চতুর্দ্দিকে আলোকিত। মনের সঙ্গে অনেক দ্বন্দ্ব করেছে মিনতি। কিন্তু কোন সমাধান মেলেনি। তাই আবার কাছে এসেছে মৌণ প্রশ্ন নিয়ে। আলুথালু কেশা. ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ মিনতি। বেদনার গাঢ় অন্ধকার তার সারাটি মুখে।

কি? কিছু বলবে বুঝি?

মিনতির কণ্ঠে ফুটে উঠে স্পষ্ট দৃঢ়স্বর—হ্যাঁ। সারাটা সন্ধ্যে কামিনীর কথাই ভেবেছি। ও পাগলের মত কি যে সব বলে।

—কি বলে?

—অনেক কিছু। ও বলে—আমাদের যদি একটা সন্তান থাকতো তাহ'লে ও নাকি কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করতো! ও ভেবেছে আমরা স্বামী-স্ত্রী।

চুণী হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে ওঃ! এই কথা! ও আমাদের জানেনা, তাই!

মিনাতি মিথ্যে অভিযোগের সুর তোলে— তুমি হয়ত তেমন কোন পরিচয় দিয়েছ কামিনীকে। নইলে

চুণী বাধা দেয়—নইলে কি? পাগল আর কি। আমি কেন অমন মিথ্যে বলতে যাবো?

মিনতি প্রেম-নিবেদন সন্তর্পনী। সে অনেকদিন ভেঙ্গে পড়তে চেয়েছে—কিন্তু সফল হয়নি। আজও তার প্রশ্নের সমাধান মিলল না। নীরেট মূর্খ, অপদার্থ চুণী! ওর মাঝে কি জীবনবোধ নেই? যৌবনের কোন আবেগ নেই? পাষাণ, একেবারে পাষাণ ও।

মিনতি আহত অভিমানে জ্বলে ওঠে সবই মিথ্যে! মিথ্যের ওপরই আমাদের সংসার চলছে। কিন্তু এ মিথ্যের খেলা আর কতদিন খেলবো বল?

অদ্ভুত প্রশ্ন? এমন প্রশ্ন কেন তার মিনুদির মুখে? যার অভিজাত্যের কাছে, দানের কাছে, ঐশ্বর্য্যের কাছে, অমায়িক ব্যবহারের কাছে চুণীর শির শ্রদ্ধাবনত, তার মুখে একি সকরুণ অর্থহীন প্রশ্ন! মিনতির ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে চুণী অভিভূত হয়ে পড়ে। শান্ত ধীর ভাবে বলে—তোমার শরীর হয়ত ভাল নেই। রাতও অনেক হয়েছে। এবার ঘরে যাও মিনুদি।

মিনুদি! জড়, পাষাণ, অপদার্থ নিষ্ঠুর। মিনুদি! ব্যর্থ-বিবস, ক্লান্ত মিনতি নিঃশব্দে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়।

শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ আলো ঢেলেছে আঙ্গিনায়। ঘুমন্ত পৃথিবী চন্দ্রালোকে উজ্জল। কিন্তু মিনতির জাগ্রত যৌবন প্রাঙ্গনে আজ একি প্রগাঢ় অন্ধকার। চাঁদের অকৃপণ আলো সেখানে পৌঁছায়নি কেন? মনের এ গাঢ় অন্ধকার কবে দূর হবে? কেকা রবে কবে নাচন শুরু হবে শিখির? কুহুধ্বনি কখন জাগাবে বসন্তরাজ?

চিন্তার স্রোত বয়ে চলে মিনতির মনের সাগরে। এলোমেলো বিক্ষিপ্ত চিন্তা—পৃথিবীর অনেক ইতিহাস—পুরানো দিনের অনেক কথা। ক্রমে অতীত ভারতের এক জীবন্ত আলেখ্য ফুটে ওঠে তার মানস নয়নে। মোগল সম্রাজ্যের সে এক গৌরবময় দিন—বিশ্ব সুন্দরী নুরজাহানের অমর প্রেমানুভূতির অদ্ভুত রূপান্তর সম্রাট জাহাঙ্গীরের অপূর্ব্ব জীবনদর্শন। জাগতিক প্রেমের অন্তরালে বিশ্ব-প্রকৃতির স্পন্দন অনুভূতি-সমৃদ্ধ মহামিলনের কাহিনী।

গৃহে আলো জ্বেলে দেয় মিনতি। তারপর নিঃশব্দে টেবিলের ওপর থেকে তুলে আনে একখানা গ্রন্থ—প্রেমের খেলায় সম্রাটের অবিস্মরণীয় ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার ইতিহাস। চুণীর সম্মুখে মিনতি এগিয়ে ধরে পুস্তকের খোলা বুক। যেন নিজেরই যৌবনদীপ্ত সুদৃঢ় বুকের অবরণ দেয় খুলে। খুলে দেয় হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার—জীবনের শত আচ্ছাদন একই সঙ্গে। কান্নাজড়িত করুণ কণ্ঠে বলে—এখান থেকে পড়—আমি শুনি। বেদনামাখা অনুরোধ তার কণ্ঠে—প্রশান্ত মিনতি তার দৃষ্টিতে।

চুণী সহাস্যে প্রশ্ন করে—কি আছে এতে ?

—অনেক কিছু—পড়।

চুণী পাঠ করে—

"প্রেম স্বর্গীয়, তাতে অপরিসীম আনন্দ—সুখ। আবার প্রেম দেয় মানুষকে কঠিন আঘাত। সে আঘাতে মানুষের আসল রূপের হয় প্রকাশ। জীবনের রূঢ় বেদনা ফুটে ওঠে কামনার অতৃপ্তিতে। প্রেমের বেদন-দহনে পুড়ে মানুষ তখন হয় সত্য ও সঠিক।

বিশ্বের সেরা সুন্দরী নূরজাহানকে একান্তভাবে পাবার আকাঙ্খায় জাহাঙ্গীর হত্যা করেছিল নূরের স্বামীকে—রাজ প্রসাদে পেতেছিল তার জন্য রাজ্যেশ্বরীর শাহী শয্যা। কিন্তু আঘাত-বিক্ষত পতিপ্রাণা নূর শাহীশয্যায় সেদিন সুখ খুঁজে পায়নি। সেখানে সে দেখেছিল

হত্যার বিভৎসতা মাঝে স্বামীর রক্তাপ্লুত মুখ। তাই তার জীবন বসন্তে নেমেছিল আমানিশার গাঢ় অন্ধকার। লাবণ্যময়ী সুন্দরীর সুস্মিত মুখ ম্লান হ'ল বিরহ ব্যথায়। দিবাবসানে সূর্য্যমুখীর ম্লান মুখের মত। বার্থ হ'ল সম্রাটের প্রেমভিক্ষা—চাওয়া ও পাওয়ার আকাঙ্খার এলো কঠিন আঘাত—ব্যর্থতার ব্যথা।

কিন্তু সম্রাট ছিলেন সৃষ্টিধর্ম্মী কবি। তাঁর কবি মন নিখুঁত সত্যসন্ধি। সম্রাটের অপরাজিত মন প্রকৃতির সহজ গতির মাঝে খুঁজে পেয়েছিল বিদ্রোহীমনা নুরের চিকিৎসার নির্ভুল ইঙ্গিত। তাই কালের চলন্ত স্রোত তলে বেদনা-দগ্ধ নূরকে আরোগ্য প্রাপ্তির জন্য দিয়েছিল প্রচুর সময়ে অবসর। স্বামী বিরহে কাতরা নূর। ঘাতক জাহাঙ্গীকে সে পশুরও অধম জ্ঞানে ঘৃণা করতো। সম্রাট জানতো নূরকে একান্তভাবে পেতে হ'লে ভুলিয়ে দিতে হবে তার সমস্ত অতীতকে—অতীতের গৌরবময় স্মৃতিকে। তারপর নতুন পরিবেশে—নতুন আবেশ পরশণে জাগাতে হবে তার সুপ্ত বাসনাকে। বল প্রয়োগে দেহ ভোগ করা যায়, কিন্তু হৃদয় জয় করা যায় না কোনদিন। হৃদয় জয় করতে হ'লে বিজয়ী হওয়ার সাধনা প্রয়োজন—সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন।

তাই সম্রাটের সাধনা হয়েছিল শুরু! ক্ষণে ক্ষণে দিন—দিনে দিনে বছর হ'ল শেষ। কিন্তু নিঃশেষ হল না সম্রাটের আকাঙ্খা, তার প্রেমময় জীবনের সহনশীলতা। তাই বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি কাশীরের সুপ্রসিদ্ধ শালিমার বাগ নির্মাণ করালেন। তারপরে এলো সেই পরীক্ষার দিন। জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন অত্যাশ্চর্য্য এ শালিমার বাগ। এরই সুউচ্চ প্রাসাদ কেন্দ্রে সম্রাট আর নূর উপবিষ্ট। পাখীর কুজনে, ফুলের সুবাসে মায়া-কানন মুখরিত। বিচিত্র বর্ণের পত্র পুষ্পে ও তোরণে চতুর্দ্দিক পরিশোভিত। স্তব্ধ-বিস্ময়ে চেয়ে থাকে নূর। কোন্ দিগন্তে যেন

তার প্রাণের হয় বিনিময়। বিহ্বল তার দৃষ্টি—প্রকৃতস্থ তার বিদ্রোহী মন—শান্ত শিশুর পরিবেশ তার সমস্ত অঙ্গ জুড়ে।

সত্যসন্ধি দার্শনিক সম্রাট ভুল করেন নি। প্রশান্ত' সুধীন, মধুর আবেশে তিনি আবেষ্টন করেছিলেন নূরের বাহুপেলব। তারপর ত্যাগ করেছিলেন তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। সে দীর্ঘশ্বাসের সজোর ধাক্কায় উন্মুক্ত হয়েছিল নুরের অবরুদ্ধ যৌবনের অন্তর্দ্বার। তার দেহের অণুতে পরমাণুতে জেগেছিল যৌবনের ঢেউ জাগরণ। ঘুমভাঙ্গা কিশোরী বধুর ন্যায় অভিভূত কণ্ঠে নূর প্রশ্ন করেছিল—সম্রাট। কোথায় এনেছেন আমায়? এত সুন্দর এ পৃথিবী? বিশ্ব প্রকৃতির এত রূপ আমি কখনো দেখিনি সম্রাট।

সাফল্যে উদ্দীপ্ত দিল্লীশ্বর সহাস্য মুখে উত্তর দিলেন—তোমারই জন্য অজস্র রূপের এ অপূর্ব্ব সমাবেশ নূর! রাজকোষের বিপুল অর্থ ব্যয়ে এ মায়া-কানন গড়েছি শুধু তোমারই জন্য প্রিয়ে।

উভয়ের মাঝে গভীর মৌনতা বিরাজ করে। সম্রাট পরিতৃপ্ত। দৃষ্টি তার নুরের লজ্জাশীলা আনত মুখের প্রতি। কী মধুর নিখুঁত সৃষ্টি। বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সম্রাট। অনেকক্ষণ কেটে যায় নীরব ব্যাকুলতায়। তারপর হয় দৃষ্টির বিনিময়—হৃদয়ের বিনিময়। সুধীর আবেশে নূরকে কাছে টেনে তন্ময় কণ্ঠে সম্রাট ডাকেন—নূর।

—বল সম্রাট।

—আমি আজ আর সম্রাট নই, নূর! আমি ভিখারী, তোমার প্রেমের দীনতম ভিখারী।

প্রশান্ত চোখে মধুর হেসে নূর বলে—কি ভিক্ষা তোমায় দেবে। হে মহান সম্রাট? তুমি আমায় অফুরন্ত জীবনের সন্ধান দিয়েছ আজ। অনন্ত জীবন, অবিশ্রান্ত তার গতি। এত প্রান আছে-এত রূপ আছে—এত গান আছে পৃথিবীতে? জরা মৃত্যু, ব্যাধি, শোক, হাহাকার, মর্ম্মযাতনা কিছুই কি নেই এ কোলাহলময় পুরাতন পৃথিবীতে?

—না। সে সব কিছু আজ নেই নুর। আজ আছে শুধু প্রাণ আর অফুরন্ত প্রাণের উৎস। শুধু অনুভূতির জাগরণ—অবলুপ্তির মাঝে ম্লান মৃত্যুর দিন আজ নয়!

কিছুক্ষণ আবার নিঃশব্দে কাটে। নূর প্রশান্ত দৃষ্টিতে সম্রাটের প্রতি চেয়ে থাকে নত শিরে। লজ্জা-রাঙা তার মুখ। সম্রাট শান্ত মধুর কণ্ঠে ডাকেন—নূর।

তৃপ্তির আনন্দ অভিভূত সম্রাটের কণ্ঠস্বর।

—বলুন সম্রাট! এ কি মর-জগত? এ নতুন জগতের আকাশ তলেডুবে গেছে আমার সমস্ত অতীত। কোথায় নিঃশেষ হ'ল অতীতের দুঃখময় জীবন? এ মধুর মুহূর্তে তুমি আমায় গ্রহণ ক'রে একেবারে সত্তাহীন করে দাও সম্রাট। এ আনন্দ অনুভূতির মাঝে তোমার নূরকে নিয়ে যাও সেখানে যেখানে আকাশে ও ধরণীতে হয় কোলাকুলি—বাতাসে বাতাসে কানাকানি—বনমর্ম্মরে ওঠে সঙ্গীত ধ্বনি। সেখানে, যেখানে দিগন্তের অন্তহীন সীমায় মহাকালের হয় শেষ পৃথিবীর হয় মহা বিলুপ্তি। আর নিয়ে যাও সেখানে, যেখানে—

আকাশের নীলে আর ধরার শ্যামলে
মহামিল হয় প্রিয় কঠিনে কোমলে।

প্রগাঢ় চুম্বনতলে সিক্ত হয় নূরজাহানের গোলাপী কপোল। সুগভীর আলিঙ্গনে তৃপ্ত হয় সম্রাটের মরু-হৃদয়। নূরকে আবক্ষ আবেষ্টন করে সম্রাট বলেন—তোমাকে এমনিভাবে একান্ত ক'রে পাওয়া যে কতবড় পাওয়া তা তুমি জানবে না নূর।

—তুমিও জানবেনা সম্রাট, এমন ক'রে জীবনের বিপুল ক্ষতিকে ভুলে যাওয়ায় কত সুখ! তুমি কবি, অন্তর্যামী—সত্যিকারের স্রষ্টা

তুমি। তাই বাস্তবকে একেবারে সপ্ন করে দিয়েছ—আর স্মরণকে ঢেকেছ বিস্মরণের যবনিকায়।

জাহাঙ্গীর সেদিন একান্তভাবে পেয়েছিল সুন্দরী শ্রেষ্ঠা নূরকে আপন বুকে। প্রকৃতির আরামকুঞ্জে কালের গতিতে আরোগ্য প্রাপ্তা নূর সম্রাটের কামনাতলে বিলিয়ে দিয়েছিল দেহ-মন।

সত্যি, মহাকালের গতি তলে প্রকৃতির চিকিৎসা বড়ই নির্ভুল! এ চিকিৎসায় মৃত্যুপ্রায় মানুষ পায় নবজীবনের সন্ধান।

পড়া শেষ করে চুণী প্রশ্ন করে—এবারে বল' কি পেলে এতে?

মিনতি শান্ত-কণ্ঠে উত্তর দেয়—পেয়েছি! অনেক, অনেক পেয়েছি আমি। বিশ্বচরাচরে ক্ষতির মাঝেই লাভের বীজ নিহিত থাকে—হারাবার মাঝে যেমন থাকে পাবার আশ্বাস—ভুলের মাঝে যেমন সংশোধনের পথরেখা, অসম্ভবের মাঝে যেমন সম্ভাবনার নির্দ্দেশ। পেয়েছি! অনেক অনেক পেয়েছি। চিরকাল ধ'রে পাবার জন্যই ত জীবন। নইলে জীবনের জের টানবার কি প্রয়োজন বল! অপ্রয়োজনই ইতি—কিন্তু ক্ষতিতেই নয় বিরতি। বিশ্বাসেই নিঃশ্বাস—বিস্বাদে নিঃশেষ। যাত্রা করি বলেই যাত্রী, জপে বসি বলেই ঋষি।—পেয়েছি—অনেক পেয়েছি।

মিনতির চোখে অশ্রু—হৃদয়ে আবেগ-চঞ্চলতা—মুখমণ্ডলে উদ্ভূত রূপান্তর। অভিভূত আপনভোলা মিনতি—অবচেতন মিনতি। ধীর শান্তপদে এগিয়ে গেল সে বাইরের দিকে। গভীর বিষাদ মাখা তার বিদায়ের দৃশ্য।

মিনতি গমন পথের দিকে বিস্ময় বিহ্বলতায় চেয়ে থাকে চুণী। কিন্তু মিনতিকে আর দেখা যায় না। নৈশ স্তব্ধতার বুকে ধ্বনিত হয় ব্যাকুল ক্রন্দন। দখিনা হাওয়ায় ভেসে আসে মিনতির বুকভাঙা কান্নার উচ্ছ্বাসময় আওয়াজ।

(১৫)

কালের প্রবাহ এগিয়ে চলে সম্মুখ পানে। পেছনের প্রতি মহাকালের থাকে না এতটুকু দুর্ব্বলতা। তাই যাত্রা তার থামেনি কোনদিন। সে গতিশীল রথচক্রে কোথায়; কোন্ পথচারী গুঁড়িয়ে নিঃশেষ হয়ে গেল, কোন জীবন্তিকার হ'ল অবসান—তা দেখবে অনাগত যাত্রীরা। পথের মেলায় তারা এগিয়ে যাবে ইতিহাস লিখে—পৃথিবীর পুরাতন জীবন গতির ইতিহাস। কিন্তু জীবনে ক'টি কথাই বা ইতিহাসে স্থান পায়? সামান্য একজন মানুষের জীবন নিয়ে লেখা যায় হাজার হাজার গ্রন্থ।

আমারাও এগিয়ে চলেছি দু'টি তরুণ নরনারীর জীবনানুভূতির কাহিনী লিখে। চাওয়া-পাওয়ার চিরন্তনা পুরনো কাহিনী—নতুন শুধু চেতনাবোধের বিচিত্রতা।

মিনতির নিষেধ সত্ত্বেও চুণী এক কণ্ট্রাক্টরের অধীনে চাকরী নিয়েছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর রোদে-পোড়া আধখানা দেহ নিয়ে চুণী ঘরে ফিরে আসে। তার শুষ্ক-মলিন চেহারা দেখে মিনতি রাগে, দুঃখে অভিমানে মুখ ফিরিয়ে থাকে। ক্রোধ দমন করে বলে—অমন চাকরী কি না করলে—চলে না? আমার এত থাকতে তুমি পরের চাকরী করে কি লাভ পাও বলত?

চুণী উত্তর দেয় না। মৃদু হাসে শুধু।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় শুষ্ক মুখে চুণী ঘরে ফিরে এলো। মিনতি কাছে গিয়ে বলে—পোড়া কাঠ হয়ে এলে যে!

চুণী উত্তর দেয়—তবু যে ফিরে এসেছি—এ-ই ত ভাগ্য! নইলে লোহার বড় পাইপটা আর একটু স'রে গেলেই নদীর গভীর জলে ছিট্‌কে পড়তাম। আর অত উঁচু থেকে পড়লে কি রক্ষে ছিল!

মিনতি শিউরে ওঠে। সে যেন দিব্য চোখে ক্ষত-বিক্ষত চুণীর নিমজ্জিত দেহ দেখতে পায়। তার অমঙ্গল চিন্তা ক'রে অস্থির হয়ে ওঠে মিনতি। সহসা একখানা হাত আপন মুঠোয় আঁকড়ে ধরে বলে—আমার মাথার দিব্যি রইলে, আর যেয়োনা ওকাজে।

চুণী হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে—কাজ ত ক'রে খেতে হবে। তোমার মাথায় বসে কতদিন খাবো বল? তোমার পয়সায় ত আর আমার চলবে না। তা'ছাড়া তুমি বোম্বে চ'লে যাবে। তখন কি আমি অকূলে ভাসবো?

চুণীর এ হেন উক্তিতে মিনতি মর্ম্মাহত হয়। ভাবে—হায়রে! যার জন্ত বাসর সাজিয়ে ব'সে থাকি সে কেন বুঝতে চায় না? ম্লান মুখে মিনতি বলে—অকূলে ভাসবে কেন? স্বাধীন মানুষ তুমি চাকরী ক'রে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছ। কি এত ভাবনা তোমার? কিন্তু একথা তুমি কেমন ক'রে বললে যে আমার পয়সায় তোমার চলবে, না? কার জন্ত এতসব? আর আমি যে তোমায় ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবো একথা কে বলেছে? তুমি এমন ক'রে ভাবো?

চুণী উত্তর দেয় না। নীরবে বসে থাকে শুধু।

গ্রীষ্মের দুপুর। শান্ত চতুর্দ্দিক। কিন্তু অশান্ত মিনতির মন। চুণী প্রবল জ্বর নিয়ে ঘরে ফিরে এলো। তার অবসাদ-ম্লান চেহারা লক্ষ্য ক'রে মিনতি বলে—ফিরে এলে যে! অসুখ করেছে নিশ্চই।

চুণী রলিংয়ের ওপর ঢ'লে পড়তেই মিনতি তাকে এস্তগতিতে ধ'রে ফেলে। মিনতির কোলের ওপর ক্লান্ত-পশুর মত সে হাঁপাতে থাকে। কপালে উত্তাপ অনুভব ক'রে মিনতি ব'লে-ইস্, গা যে পুড়ে যাচ্ছে। এতজ্বর নিয়ে ছিলে কোথায়? আমার নিষেধ ত আর শুনবে না। আমি পর। সেই পরের পয়সায় তোমার চলবে কেন? চাকরী যে তোমার করাই চাই।

চুণী একটা কথারও উত্তর দেয় না। তার অস্থিরতা লক্ষ্য ক'রে মিনতি উচ্চকণ্ঠে ডাকে—কামিনী ও কামিনী! শীগ্‌গীর জল নিয়ে আয়—বাবুর মাথায় ঢালতে হবে।

উভয়ের দৌরাত্ম্যে বারান্দায় জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। মিনতির দামী শাড়ীখানা ভিজে একাকার হয়ে যায়। ব্যস্ততার মাঝে ছিঁড়ে যায় শাড়ীর এক পাশ। তবু খেয়াল থাকেনা মিনতির।

কামিনী বলে—মা, কাপড়খানা ফেটে গেল যে।

—যাক্। তুই বাতাস কর। আমি ততক্ষণ কাপড়টা বদলে আসি। মিনতি আঁচলে ঘাম মুছতে থাকে।

একদিন দু'দিন করে দশদিন কেটে গেল, কিন্তু চুণীর জ্বর বন্ধ হ'ল না। শহরের বড় ডাক্তার বলে গেলেন—টাইফয়েড জ্বর। ভাল নার্সিং প্রয়োজন। নার্সিংয়ের ওপরই এ রোগের আরোগ্য নির্ভর করে। সুতরাং ঘরে যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্ভব না হয় তবে হাসপাতালে পাঠানোই সঙ্গত।

—হাসপাতালে না, না। আমি নিজে ওঁর শুশ্রূষার ভার নেবো। বলুন পারবো না?

মৃদু হেসে ডাক্তার বলেন—নিশ্চয় পারবেন! স্বামীর অসুখে স্ত্রী-ই ত শ্রেষ্ঠ সেবিকা। নার্সদের সেবা শুধু পয়সার বিনিময়ে আর স্ত্রীর সেবা ইহকাল পরকালের তাগিদে। স্বামী যে!

ডাক্তার চ'লে যায়। মিনতি অভিভূতির মাঝে তন্ময় হয়ে ব'সে ভাবে—স্বামী! হ্যাঁ' স্বামী নয়ত কি! দেহ-মন যার প্রতি একান্তভাবে উৎসর্গীকৃত সেই ত স্বামী। কামনার অন্তরালে চুণীর অজ্ঞাতসারে এতদিন প্রচ্ছন্নভাবে এই স্বামীকেই যে মিনতি মনে-প্রাণে বরণ করে নিয়েছে। যার মাঝে নিজের সত্তার বিলুপ্তি—সেই ত সত্যিকার স্বামী!

মিনতি নার্স ! মিনতি অর্দ্ধাঙ্গিনী। মিনতি প্রিয় দয়িতা। চুণীর রোগমুক্তির জন্য মিনতি অর্থভাণ্ডার খুলে দিয়েছে। তার আহার নিদ্রা বন্ধ। চুণীর শয্যাপাশে কাটে তার দিন আর রাত। কখনো আশায় বুক বাঁধে, আবার কখনো নিরাশায় ভেঙে পড়ে সে। কামিনী গৃহকর্ম্ম শেষ করে খাবার নিয়ে ব'সে থাকে। মিনতি ক্লান্ত চোখে বলে—তুই খেয়ে শুতে যা কামিনী। আমি পরে খাবো। কিন্তু পরদিন দেখা যায় সমস্ত খাবার তেমনিভাবে পড়ে আছে। প্রশ্ন করলে মিনতি বিরক্তির সঙ্গে বলে—তোর কাজ তুই কর কামিনী আমার জন্য তোকে ভাবতে হবে না।

ক্রমে অনাহারে, অনিদ্রায় মিনতির সোনার দেহ মলিন হয়ে যায়। তার উদ্দাম যৌবন-তটে দেখা দেয় বার্দ্ধক্যের ছাপ। তবু তার সেবার শেষ নেই—বিরামহীন, অক্লান্ত তার সেবা। মিনতি যেন যমের সঙ্গে লড়াই শুরু করে।

দীর্ঘ একুশ দিন পরে জ্বর বন্ধ হ'ল। শেষ রাতের দখিনা বাতাস তখন স্নিগ্ধ পরশ দিচ্ছে। জানালার মুক্ত পথে জেগেছে প্রভাতের সাড়া। ঊষার স্নিগ্ধ আলোয় পূর্বাঙ্গন উজ্জ্বল। সে আলোর রঙে ভেসে ওঠে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত মিনতির শুষ্ক মুখখানা। তার রুক্ষ—ম্লান মুখমণ্ডলে সহসা সাফল্যের হাসি ফুটে ওঠে।—জ্বর নেই ? সত্যি ? তৃপ্তিসুখে মিনতি ঝুঁকে পড়ে চুণীর মুখের ওপর! আনন্দ আবেগে চুম্বন-রসে সিক্ত করতে চায় তার বিশীর্ণ মুখখানা। ঠিক সে সময়ে চুণী ডাকে—মিনুদি। মুহূর্ত্তে মিনতির কামনা উদ্দাম ম্লান হয়ে যায়। মুখ ঘুরিয়ে অন্তরের অশ্রুতে বুক ভাসায় সে।

দিন যায়। দিনে দিনে সপ্তাহ পার হয়। চুণী বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভগ্ন স্বাস্থ্য মিনতিকে লক্ষ্য করে। একি চেহারা তার! চুণীর সেবার মাঝে মিনতির যে বিপুল ক্ষতি হয়ে গেছে।

চুণী শান্তকণ্ঠে ডাকে—মিনুদি।

মিনতি কাছে এসে দাঁড়ায়। মৃদু হেসে বলে—কিছু বলবে?
—হ্যাঁ, কাছে এস।

মিনতি সহাস্যে বলে—এইত এসেছি। বল।
শীর্ণ- দুর্ব্বল হাতে মিনতির হাত আঁকড়ে ধরে চুণী। বলে—তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আজ আমার নেই। তুমি শ্রদ্ধেয়া, দেবী। কোন্ পুর্ণ্যবলে এমন দেবীর একান্ত আত্মীয় হওয়া যায়, জানিনে।

মিনতি উত্তর দেয় না। নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে শুধু।

চুণী আবার বলে—তোমার এ অক্লান্ত সেবার ঋণ জীবনে শোধ দিতে পারবো না।

মৃদু হেসে মিনতি বলে—ও ঋণ শোধ না হওয়াই ভাল।

আরও কয়েকদিন পরে।

চুণী বেশ একটু সবল হয়ে উঠেছে! প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। গভীর রাত। মিনতির কোলে মাথা রেখে চুণী ঘুমিয়ে পড়েছে। মিনতিও ক্লান্ত দেহে তারই পাশে অবসাদ ঘুমে নিমগ্ন। নিস্তেজ লতিকার প্রণতি-শয়ন যেন।

গুমোট-ক্লান্ত পৃথিবী সবে সেদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে। নিথর বাতাস তখন মন্দবহা—মুক্ত বাতায়ন পথে তার ভীরু আনাগোনা-পত্রপুষ্পে লাজুক পরশন—নৈশ স্তব্ধতায় বিরতি গুঞ্জন। গভীর রাতে চুণীর ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু গায়ের ওপর কার যেন কোমল দেহের অবস্থান অনুভব করে। সে দেখতে পায় স্খলিত বসনা মিনতি তার পায়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। তার বাহুদ্বয় সতেজ লতিকার ন্যায় জড়িয়ে ধ'রে আছ চুণীর পদযুগল। এমনিভাবে পায়ে মাথা রেখে মিনতি কেন ঘুমিয়েছে?

মিনতির বিলুণ্ঠিতা দেহের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে চুণী

শিথিল-বসনা যৌবনময়ী তরুণী। আত্মসমর্পিতা উদ্দাম বসন্তরাণী অভিনেত্রী মিনতি নয়, বধূবেশী বাসর-শোভিনী মিনতি। চুণী সন্তর্পণে সরিয়ে নেয় তার পা। একপাশে স'রে গিয়ে উভয়ের মাঝে সে খানিকটা ব্যবধান সৃষ্টি করে।

নিদ্রামগ্ন নারী। তার বিলুণ্ঠিত দেহের একাংশ বিস্রস্ত রাশিকৃত কেশে আবৃত। অনাবৃত কুসুম-দেহের একটুখানি আড়াল যেন। এত রূপ মিনতির—এত সুন্দরসুঠাম এবং সুদৃঢ় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এমন নয়ন-ঝলসানো যৌবন-শ্রী! নিদ্রাতুরা অর্দ্ধনগ্ন নারী। নগ্নতায় এত সৌন্দর্য্য! নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে মিনতির ঢেউভাঙা বুকে কিসের লহর-দোলা?

ঘুমন্ত শ্লথ-বসনা নারী। কাঁচলির বাঁধন গেছে ছিড়ে—আঁচলের আড়াল গেছে সরে। নারীঅঙ্গ হয়ে আছে উন্মুখ। বিকসিত প্রস্ফুটিত মিনতি। অঙ্গ—সুষমায় মহিমান্বিত মিনতি।

এতদিনে চুণীর দুর্ব্বল দেহ জাগে দুরন্ত কামনা? আত্মহারা উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। হিংস্র পাশবিতায় ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু পরক্ষণেই অদ্ভুতভাবে আত্মবল ফিরে পায়। এ কি কলুষ জাগরন তার শিরা-উপশিরায়? এ কি অবিশ্বাস্য জীবন অনুভূতি তার নির্লজ্জ কামনায়! সেকি এমন করে শ্রদ্ধাশীলা মিনুদির কাছে ছোট হবে? এমনি ক'রে কলুষিত করবে তার জীবন দাত্রীর পবিত্র দেহ! এমন কৃতঘ্ন হবে সে? অদ্ভুত! মিনতির অজ্ঞাতসারে সেকি এমনি ক'রে দেখবে তার দেহের উলঙ্গ প্রকাশ? এ যে রুচিহীনতা, দুর্ব্বলতা—কলুষ মানসিক বৃত্তির প্রশ্রয়।

বিলুণ্ঠিত' অবচেতন তন্বী তরুণী। পুরুষের কামনা তলে বিলিয়ে দেওয়া সহজভোগ্যা নারীদের। জাগ্রত পশুবৃত্তি চরিতার্থ করার বাধাহীন প্রশস্তি। কিন্তু মিনতি যে অনেক মহৎ—সে যে তার মিনুদি। এমন চিন্তাও কি তার মনে স্থান পায়?

মিনতির অক্লান্ত সেবা যত্নে চুণী জীবন ফিরে পেয়েছে। তার কাছে কত ঋণী সে। মিনতি যে স্বর্গের। এ স্বার্গীয় তন্বী সুন্দরীর পুত-পবিত্র দেহের রূপ-সৌন্দর্য্য এমন অজ্ঞাতসারে উপভোগ করাও যে পাপ। শয্যার অপর প্রান্তে সরে যায় চুণী। তারপর ধীরে ধীরে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

মনুষ্যত্বের কাছে পশুত্বের হয় পরাজয়।

প্রভাত কাকলীর সাড়ায় আবার যখন চুণীর ঘুম ভাঙে তখন নৈশ অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এসেছে, কিন্তু জীবনের নির্ম্মল বসন্তে একটু ঘোলাটের ছায়া যেন জমাট বেঁধেছে। উভয়ের একি অদ্ভুত আবেশ আবেষ্টন। ঘুমের ঘোরে উভয়ে উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন ক'রে কখন এমন নিবিড় হয়ে শুয়েছে? মিনতির ছন্দায়িত বাহু সুদৃঢ় আবেশে জড়িয়ে আছে চুণীর সবখানি দেহ। আবার চুণীর বাহুতলে স্পন্দিত হচ্ছে মিনতির জীবন কেন্দ্রে। দুটি হৃৎপিণ্ড যেন জমাটবাঁধা একত্বে লীন হয়ে গেছে।

—ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! ব্যস্ত হয়ে উঠে বসে চুণী। সুকৌশলে শান্ত আবেশে মিনতির বাহুমুক্ত হয়ে উঠে বসে সে। মৃদু আবেশে শিথিল গাত্রাবাস মিনতির অনাবৃত অঙ্গে দেয় টেনে। তারপর মৃদু কণ্ঠে ডাকে—মিনুদি, ও মিনুদি।

ত্রস্তে জেগে ওঠে মিনতি। সে জাগরণে জাগে তার লজ্জাবোধ। মুহূর্ত্তে রাঙা হয়ে উঠে তার সলাজ মুখ। নিজের নগ্নতাকে লক্ষ্য ক'রে অসংযত গাত্রাবাস টেনে মিনতি দিতে চায় আবরণ। কিন্তু কি প্রয়োজন? কার কাছে লজ্জার আড়াল? যার অনুভূতি সারাটি যৌবনে, তার পরশে জাগুক হৃদয়ের গহীন আঙিনা। তবু লজ্জা! তবু সঙ্কোচের বেড়াজাল—বিলিয়ে দিয়ে আবার গুটিয়ে তোলার ব্যস্ততা। ছিঃ! ছিঃ? কি যে ভেবেছে চুণী। এমনভাবে নিজের পরাজয় স্বীকার করতে মিনতির বাধে। তাই সে নত পল্লবে, জড়িত

কণ্ঠে বলে—ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! সারাটা রাত যে এখানেই কেটে গেল। ছোট খাট। ঘুমুতে পারোনি নিশ্চয়?

স্বচ্ছন্দ্য ফুটিয়ে চুণী বলে—কে বললে? বেশ ত ঘুমিয়েছি।

তবু একত্রে রাত্রবাস জনিত লজ্জায় মিনতি কেমন যেন ছোট হয়ে যায়। মুখ তুলে চুণীর দিকে চাইতেও তার খুবই লর্জ্জাবোধ হয়। সেই ভাবান্তর লক্ষ্য করে চুণী বলে—এক গণক আমার হতে দেখে কি বলেছিলে জানো?

—কি?

—বলেছিল আমার নাকি আশি বছর পরমায়ু। সত্যি, বাঁচবো অনেক দিন।

মিনতির দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়। মুখ তুলে বলে—আশি বছর কেন একশ বছর পরমায়ু হোক তোমার। তুমিই ত আমার··

সহসা থেমে যায় মিনতি। চুণী বলে—থাকলে যে?

নিজেকে সামনে নিয়ে লজ্জারুণ হাসি হেসে মিনতি বলে—এমনি। নিজের কথা এমন করে কেন যে ভাবি।

—মিথ্যে কথা। নিজের জন্য তুমি ভাব না। তোমার যত ভাবনা আমাকে নিয়ে।

—হবে হয়তো। মিনতি দীর্ঘশ্বাসে উঠে যায়।

চুণী পাশে গিয়ে বলে—সত্যি মিনুদি। তুমি না থাকলে এ দূর প্রবাসে এতদিন কোথায় যে মিশে যেতাম, কে জানে।

মিনতি উত্তর দেয় না, অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শুধু? অন্তরে তার কি যে ভাবের উদয় হয় তা সেই-জানে। অনন্ত আশায় বুক বাঁধে সে। ঐশ্বর্য্যশালিনী নারী ভিখেরীর কাছে খোঁজে আশ্রয়।

মিনতি নিজেই জানেনা চুণীকে সে কত ভালবাসে। চুণীর অজ্ঞাতসারে মিলন-লগ্নের-সৌধ গড়ে সে মনে মনে! কিন্তু অসার নিষ্ঠুর, অনসক্ত চুণী।

মিনতি গৃহ সাজিয়েছে পরিপাটি ক'রে। কিন্তু মনের গভীরে বিশ্রী বিশৃঙ্খলা—বিরাট শূন্যতার হাহাকার। সেখানে ব্যর্থতার ক্লেদ—অতৃপ্তির বেদনা। মিনতির দুঃখ কেউ বোঝে না—কারও কানে তার অন্তর বেদনার হাহাকার গিয়ে পেঁৗছায় না।

চুণীকে একান্ত ক'রে পাবার জন্য মিনতি সক্রীয় হয়। কিন্তু অনাসক্ত, দুর্বোধ্য চুণী-হৃদয়! নিব্বিকার ভাবে বিনা প্রতিঘাতে আঘাত এড়িয়ে স'রে যায় চুণী। মিনতি নিপীড়িত হতে চায়—নিষ্পেষিত হ'তে চায়। কিন্তু ব্যর্থ হয় তার প্রতিটি প্রচেষ্টা। প্রচণ্ড বাত্যাঘাতে সাগরে যেন উন্মত্ত দোলা জাগে—মৌনতার বুকে যেমন অকথিত বাণী সমারোহ সৃষ্টি করে, তেমনি মিনতিও চায় উন্মত্ত যৌবন সাগরে উর্মিমালার সৃষ্টির মাঝে জীবনের সহস্র সুরের গর্জ্জন তুলতে। তার অতৃপ্ত বাসনা, কামনা, সবকিছু চায় জাগ্রত জৈব অনুভূতি—চরম পাশবিকতার পুলক অনুভূতি।

দুর্দ্দমনীয় কামনার হুতাশন। তাতে নিত্য ঝল্‌সে যায় মিনতির জীবাত্মা। কিন্তু চুণী-হৃদয় ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তাই তার অনাসক্তির কঠোরতার কাছে মিনতিকে সামলে চলতে হয় প্রতিক্ষণে। এত সত্ত্বেও মিনতির প্রয়াসের অন্ত নেই।

প্রশান্ত মহাসাগরের মতই মিনতি স্থির, চঞ্চল। চুণী সেখানে ঝ'ড়ো হাওয়ার উন্মত্ত মাদকতা। ঝড় যেমন আপন বেগেই মত্ত, বোঝেনা সে মত্ততায় বিশ্বের বিপুল ক্ষতির কথা, চুণীও তেমনী বেগে মিনতির প্রশান্ত হৃদয়ে কামনার আলোড়ন দিয়ে জাগায় সর্ব্বনাশা তরঙ্গের আঘাত। ঝড় থেমে যায়, কিন্তু রোষমত্ত সাগর থামে না। তাকে থামতে অনেক সময় লাগে।

অথবা চুণী যেন প্রচণ্ড ঘুর্ণীবার্তা। মিনতিকে কেন্দ্র ক'রে চক্রশক্তির আবর্ত্তনে উচ্চে তুলে মুহূর্তে বিদ্যুৎ গতিতে তাকে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করে চ'লে যায়। ঘুর্ণী চলে যায়, কিন্ত আঘাত-বিক্ষত জীবন মুহ্যমান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। কতবার যে মিনতি এমনি ভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তবু চুণী তার কোন ব্যথাই বোঝেনা—বুঝতে চায়না।

বাদ্যযন্ত্রের ছিন্ন তারের মতই মিনতি সুরহীন। তার উদগ্র যৌবন-স্রোত চুণীকে দিতে চায় প্রমত্ত আলোড়ন। কিন্ত শান্ত, সুবোধ, অনাসক্ত চুণী নিতান্ত বালকের ন্যায় ডেকে ওঠে—মিনুদি প্রতীক্ষমান মনের সমস্ত রঙ নিমেষে মুছে যায়। আশা—বৃক্ষ পত্র পুষ্পহীন হ'য়ে ঢ'লে পড়ে। যৌবন দোলার ফেনিল তরঙ্গ নিমেষে যায় শুকিয়ে। চুণীর সশরীর অবস্থান তখন আগুনের ফুলকি হয়ে জলে ওটে। তবু আকিঞ্চন, তবু প্রাণপণ।

মিনতি ভাবে—চুণী পঙ্গু, অপদার্থ, পৌরুষহীন, জড়। দুর্বল রক্তহীন, পাষান সে। পুরুষ নামের নিতান্তই অযোগ্য সে। এহেন নারীকে যে যুবক একান্তভাবে কাছে পেয়েও হাত বাড়াতে জানে না সে পৌরুষহীন. ক্লীব। মিনতি ক্লীবকে কেমন করে যৌনবোধ জাগিয়ে সক্রিয় ক'রে তুলবে?

প্রশান্ত দুপুর। নগ্নবক্ষে ঘুমিয়ে আছে চুণী। বিস্তৃত বিশাল তার বক্ষ—প্রদেশ। একরাশ কালো চুল ভিড় জমিয়েছে সেখানে। কচি ধানের চারা বুকে একখানা ক্ষেত যেন। তার কণ্ঠ হতে নাভি পর্যন্ত বিশাল প্রদেশ। কী সতেজ, সুগঠিত তার দেহ! মাংসপেশীগুলো কত দৃঢ়। কত মজবুত তার দেহের গটন। মিনতি গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে চুণীকে। নিৰ্জ্জনতা মানুষকে প্রলুব্ধ করে নানাভাবে, নানা চিন্তায়। নির্জ্জন গৃহে মানুষ যৌবনকে অনুভব করে অনেক বেশী ক'রে। সেই নির্জ্জনতায় মিনতি চঞ্চল হয়ে উঠে।

উঠানের পেয়ারা গাছে দুটো পাখী পরস্পর চঞ্চুতে চঞ্চু দিয়ে মাখামাখি শুরু করেছেন। কত কথা যে ওরা ব'লে—নির্ব্বিবাদে ওরা উপভোগ করে, জীবনকে, যৌবনকে। মিনতির অন্তরে জ্বলে ওঠে কামনার আগুন। সে আগুনে মুখ বুঁঝে পুড়তে পারেনা মিনতি। উত্তেজনায় সে ছুটে যায় চুণীর ঘুমন্ত দেহের পাশে। বিশ্রী জৈব নেশা তার সর্ব্বদেহে। প্রমত্ত আবেগে সে ঝুঁকে পড়ে চুণীর মুখের ওপর। বিনা দ্বিধায় নিঃসঙ্কোচে তার ওষ্ঠপুটে মিলিয়ে দেয় নিজের ক্ষুধার্ত্ত ওষ্ঠধর। দু'হাত আঁকড়ে ধরে চুণীকে। উন্মাদ আকর্ষণ! প্রাগাঢ় চুম্বন! কামনা-ক্ষীপ্ত বেপোরোয়া নিবিড় আবেষ্টন। উচ্ছৃখল হয়ে উটে মিনতি। উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে সে। ক্লান্ত পশুর মত তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস।

চুণীর ঘুম ভেঙ্গে যয়ে। আকস্মিক ভাবে মিতির নেশাও যায় ছুটে। তার প্রবল উত্তেজনা এবারে চরম অভিমানে জড়িয়ে আসে। মিনতি মুহূর্ত্তে পাশে সরে যায়। রুক্ষ-কেশা শিথিল-বসনা কামনাক্ষিপ্ত মিনতি। মুখমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘাম, বুকে প্রলয়ের পরাক্রম—অবাধ্য হৃদয় বেদনায় কাতরা নারী। এই কি মিনতি? মিনতির চোখে আজ কিসের আগুন? নিঃশ্বাস প্রঃশ্বাসে কেন এত দ্রুততা? কিসের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছ লাজুক নারীদেহ? মিনতি অসংযত, অসম্বৃত—কামনাক্ষিপ্ত। মিনতির রূপ এ-ই। আশ্চর্য্য! অবিশ্বাস্য! কি সে চায় চুণীর কাছে? কামনার আগুনে মিনতিও বিবেক হারায়?

একটু একটু ক'রে বিস্ময়ের হাসি ফুটিয়ে তোলে চুণী সে বুঝতে পারে সব কিছু। কঠিন বিদ্রূপের হাসি তার মুখ মণ্ডলে। এহাসির দুঃসহ শর মিনতিকে বিষাক্ত জ্বালা দেয়। সে নিজেকে সামলাতে পারে না। প্রমত্ত বেগে ছুটে গিয়ে চুণীর বুকের মাঝে লুঠিয়ে পড়ে আকুলভাবে কাঁদতে থাকে। আবগের কান্না অতৃপ্ত

বাসনার কান্না—পরাজয়ের কান্না—অতৃপ্ত যৌন-বৃত্তির ব্যাকুল কান্না। এমন কান্নাও মানুষে কাঁদে।

মিনতির এ নগ্ন, কামনাক্ষিপ্ত রূপ চুণী কিন্তু কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। সে যে তার মিনুদি, শ্রদ্ধেয়া। শান্ত আবেশে মিনতিকে তুলে ধরে চুণী তার অশ্রু-ভেজা চোখের দিকে লক্ষ্য ক'রে বলে—ছিঃ! মিনুদি। তুমি দিনে দিনে কেমম যেন বদলে গেছ। অমন করে ভেঙে পড়া কি ভাল?

মিনতির সমপিত দেহমন নিমেষে লজ্জায়, ক্ষোভে, হতমানে সঙ্কুচিত হয়ে আসে। রাগে, দুঃখে-অভিমানে সে অস্থির হয়ে উঠে। ঝড়ের বেগে ছুটে যায় আপন কক্ষে। সেখানে প্রাণভ'রে কাঁদে। পরাজয়ের গ্লানিতে ভেঙ্গে পড়ে সে। লজ্জা! লজ্জা! নিদারুণ লজ্জা! চুণীকে এমুখ সে দেখাবে কেমন ক'রে?

আর এক দুপুর। মিনতি ম্লানমুখী। তার গাত্রাবাস মলিন আর অযত্ন রক্ষিত। পাগলিনী মিনতি। তার মনের প্রাঙ্গন জুড়ে জমেছে বিষাদের কালো মেঘ। চুণী পাশে দাঁড়িয়ে বলে—তুমি যে দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছ মিনুদি। তোমার সে চাঞ্চল্য সেই, আনন্দ নেই। আগের মত আমার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বল না, কেন?

মিনতি উত্তর দেয় না। চুণী আবার বলে—দিনে দিনে কেমন যেন তুমি দুরে স'রে যাচ্ছ।

শান্তকণ্ঠে উত্তর দেয় মিনতি—দুরে সরে যাওয়াই ত ভাল।

চুণী বিস্ময় প্রকাশে বলে—মানে? এমন ক'রে বলতে পার যে দূরে স'রে যাওয়াই ভাল! আমি কখনো তোমার ব্যাথার কারণ হয়েছি বলে জানিনে! অথচ—

—অথচ দুরে কেন স'রে যাচ্ছি, এ-ই ত! একটা প্রশ্ন তোমায় করবো। কোনদিন কি যৌবনের সাড়া অনুভব করেছ? সে চেতনা তোমার আছে?

অদ্ভুত প্রশ্ন। নিঃসঙ্কোচ, অনাড়ম্বর, নির্লজ্জ প্রশ্ন। মিনতির মুখের দিকে চেয়ে থাকে চুণী। ব্যঙ্গপূর্ণ প্রশান্ত কণ্ঠে বলে—রক্ত-মাংসের মানুষ আমি। ওসব থাকাই ত স্বাভাবিক।

ক্রোধ দমন করে মিনতি বলে—রক্ত-মাংসের মানুষ তুমি মোটেই নও—একেবারে নিরেট পাষাণ। তোমার মাঝে যান্ত্রীক জীবন ছাড়া আর কিছুই নেই। এর বেশী কি বলব, বল?

এমন উলঙ্গ কামনা তলে চুণী নিজেকে বড় বিব্রত বোধ করে। এসব কল্পনাতীত প্রশ্নের কি উত্তর সে দেবে? তবু নত মস্তকে বলে—তোমাকে ঠিক বুঝতে পারিনে মিনুদি।

মিনতি সক্রোধে উত্তর দেয়—বুঝতে কোনদিন চাওনা—তাই ছন্নছাড়া একক জীবনে বিতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাই সাধারণ নারীর মত আমি সংসার বাঁধতে চাই।

—কেন তা চাও? বেশ ত আছ।

—বেশ আছি, একথা কে বললে তোমায়? জীবনের ব্যর্থতায় আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। নারীত্বের পূর্ণ কামনা জেগেছে আমার মাঝে। আমি মা হবো।

—মা হবে!

—হ্যাঁ, নারী জীবনে যে মাতৃত্বই একমাত্র কাম্য। এর বেশী চাওয়ায় দৈহিক সুখ মেটাতে পারে কিন্তু কম হলে নারী ব্যর্থ হয় জীবনে—যেমন ফুল ব্যর্থ হয় ফলে রূপ দিতে না পেরে।

চুণী মৃদু হেসে উত্তর দেয়—শুধু মাত্র ফুল হয়েও ত সার্থকতা আসে মিনুদি। সব ফুলেই ত আর ফল হবার কথা নয়। গোলাপ বেলি, টগর, যুঁথী—এরা ত ফুল হয়েই জগতে আসে, ফুলই থেকে যায়—তারপর ফুল থেকেই একদিন ঝ'রে যায়।

মিনতি প্রত্যুত্তর ক'রে—সে যে সৃষ্টির আদিতেই ফুল। কিন্তু নারী ত আর তেমন ফুল নয়। জীবনে ফল ফলানোই তার কাম্য।

এতে নারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু দুঃখ সে পায় না, মৃত্যুকে সে ভয় করে না। মাকড়সার মত নারী সন্তানের জন্ম দেয় তার মরনের মাঝ দিয়ে। নারী প্রদীপ শিখার মত শুধু শুধু পুড়ে নিঃশেষ হ'তে চায় না। মৃত্যুর অন্তরালে নতুন জীবন শিক্ষার জন্ম দিয়ে সে হতে চায় সার্থক। এক দীপ শত দীপে রূপান্তর গ্রহণ করুক—একের মাঝে বহুর প্রকাশ হোক, এই চায় নারী।

চুণী উত্তর দেয়—সব নারীই কি তাই চায় মিনুদি? অনেক নারী আছে যারা শুধু দৈহিক ভোগ-সম্ভোগ চায়। তারা চায় না জৈব তৃপ্তির মাঝে কোন সৃষ্ট সুন্দরের আগমন। যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার বন্যা বইয়ে দেয় তারা। ফলে জীবনের পুত-পবিত্রতায় আসে আবিলতা। নিয়মে-আবদ্ধ পৃথিবীতে পুঞ্জীভূত হয় কলুষ আবর্জ্জনা। মা হ'তে চাও? বেশত। কে তোমায় বাধা দিচ্ছে? বিয়ে করে সংসার ধর্ম্ম কর। মাতৃত্বই নারীত্ব তা আমিও জানি।

মিনতি অস্ফুটে উচ্চারণ করে—হ্যাঁ জানবে বইকি।

আর একটা রাত।

প্রশান্ত, মমতামাখা কণ্ঠে মিনতি বলে—স্বাধীনতা আন্দোলনে এতদিন মেতে ছিলে। সে স্বাধীনতা ত পেতে চলেছ। এরপরে কি করবে বল? বৃটিশের শ্রমিক মন্ত্রীসভার অন্তরে বেশ রহস্য আছে বলতে হবে।

—তা আছে বইকি। কিন্তু এ রহস্য আনতে অনেক রক্তক্ষয় হয়েছে মিনুদি।

—জানি। একটা মরা জাতকে সুস্থ সবল ক'রে তুলতে হ'লে অনেক রক্তক্ষয় প্রয়োজন। স্বাধীনতা পাবার পর দেশের সামনে আসবে নানা সমস্যা। সুতরাং গঠন-মূলক কাজে আত্মনিয়োগ কর। স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যত কষ্টসাধ্য—তার মর্য্যাদা রক্ষা করা তার চেয়েও কঠিন। কি যে করবে তোমরা!

—কেন ! কি করবো মানে।

—দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে অখণ্ড ভারত না হলে ভাল। মিঃ জিন্নার দাবীর পেছনে বিরাট জনমত। সে দাবী ঠেলতে পারবে না কোনমতেই। কারণ হিন্দু ও মুছলমানদের মধ্যে অনেক তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে—অনেক পার্থক্য আজ।

চুণী প্রতিবাদ করে—কোন পার্থক্যই থাকবে না। স্বাধীনতা পাবার পর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যারা এতকাল ধ'রে স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রাণপাত করেছেন, নিষ্ঠুর নির্য্যাতন ভোগ ক'রে দেশকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন'—তাঁরা মানবতার প্রতীক। তাঁরা সব পার্থক্য দুর করতে সমর্থ হবেন।

—পরলে ভাল। আমি কিন্তু সত্যি সন্দেহ প্রকাশ করি। তা' ছাড়া জাগ্রত মুসলমান সমাজকে তোমরা চিরকালের মত পরাধীনতায় আটকাতে পারবে না।

চুণী প্রতিবাদ করে—সে প্রশ্নই ত ওঠে না। স্বাধীন দেশে স্বাধীন নাগরিক হয়ে থাকবে সবাই। তারাও ত এদেশেরই সন্তান।

—জানি। কিন্তু তবু ধর্ম্মগতভাবে, কৃষ্টিগতভাবে এবং জাতীয় বৈশিষ্টে মুছলমানেরা সম্পূর্ণ আলাদা এক জাত। দুটো বিপরীতমুখী শক্তির একত্রে মিলন ঘটাতে গেলে সংঘর্ষ হবে প্রচণ্ড। তাতে সাম্যের মন্ত্রে মুখরিত ভারতবর্ষে হিংসার বীজ অঙ্কুর লাভ করবে আরও বেশী করে।

কিন্তু আমার মতে মুছলমানদের এ দাবীর যৌক্তিকতা অসার। তারা পৃথকভাবে রাষ্ট্র গ'ড়ে কি টিকতে পারবে ?

—কেন পারবেনা বল ? জনসংখ্যায় তারা প্রায় দশ কোটি। পৃথিবীর বড় বড় শক্তির জনগণের অনুপাতে এই দশকোটি সংঘবদ্ধ মানুষ যে একদিন মহান এক জাতিতে পরিণত হবেনা তাই বা কে বলতে পারে ! জঙ্গী জাতি হিসাবে তাদের সুনাম আছে দুনিয়ায়।

তা'ছাড়া যারা সাতশ' বছর ভারতের বুকে রাজত্ব করতে পারলো তারা রাষ্ট্র গঠন ক'রে বেঁচে থাকতে পারবে না ? বল কি !

চুণী উত্তর দেয়—হয়ত পারবে কিন্তু পৃথকভাবে রাষ্ট্র গঠন না হওয়াই ভাল। একটা শক্তিশালী মহান জাতিকে কল্পনা ক'রেই আমরা এতদিন সংগ্রাম করেছি। উগ্রপন্থী গোঁড়া হিন্দুদের কথা অবশ্য চিন্তা করা সমীচিন হবে না। এদের মাঝে মুছলিম বিদ্বেষ অনেক। কিন্তু সাধারণ জীবনে ভারতের হিন্দুরা মুসলমানদের পিছিয়ে রাখবেনা সে বিশ্বাস আমার আছে।

মিনতি প্রতিবাদ জানায়—তোমার সে বিশ্বাস কতখানি সত্যে পরিণত হবে জানিনে। তবে আমার বিশ্বাস মুসলমানদের প্রতি আধিকাংশ হিন্দু বিজাতীয় ঘৃণা পোষণ করে। তারা অন্তরে বাইরে কখনই এক নয়।

—সবার বেলায় একথা প্রযোজ্য তা আমি বিশ্বাস করিনে।

—বিশ্বাস আমিও করতাম না ! কিন্তু অনেক দেখেছি। দেখে দেখে সেই ধারণাই আমার মাঝে বদ্ধমূল হয়েছে।

—আশ্চর্য্য ! আচ্ছা' মুসলমানদের প্রতি তোমার এত দরদ কেন বলতে পার ?

মিনতি সহাস্যে বলে—তোমার প্রতি দরদের কথা ভাবলেই তার উত্তর পাবে। আমি মুসলমানদের সত্যি ভালবাসি।

—মিনুদি ! চুণী বিস্ময় প্রকাশে উচ্চারণ করে।

মিনতি শান্ত কণ্ঠে বলে—তোমার মিনুদিকে এখন ছোট্ট মিনা ক'রে নিতে পারো না ?

—মিনা ? না, না। ও নামটাকেই আমি ঘৃনা করি। ও নামের মেয়েগুলোকেও।

—কেন ? এ ঘৃণার কারণ ?

—সে অনেক কথা। চুণী কিছুক্ষণ মৌন থাকে। মিনতিও

তারপর বলে—ওই জঘন্য নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রতনদিঘীর আনোয়ার ভায়ের দুর্ভাগ্য। চুণী কি যেন চিন্তা করে। তারপর বলে—আচ্ছা' মুসলমান জেনেও তুমি আমাকে ভালবাস?

—হ্যাঁ, আমি শুধু তোমাকেই ভালবেসেছি--কোন ধর্মকে নয়।

চুণী অবাক হয়ে থাকে। বলে—আশ্চর্য্য করলে মিনুদি। তুমি যেন কেমন স্বপ্নের জাল বিস্তার ক'রে আমাকে মোহাচ্ছন্ন করে তুলেছ। যাক, চল এবারে আমরা কলকাতায় ফিরে যাই—এখন আর ধরা পড়ার ভয় নেই।

চুণীর এ প্রস্তাবে মিনতি অভিষ্টসিদ্ধির নতুন পথ খুঁজে পায়। বলে—হ্যাঁ, সেই কথাই গত কয়েকদিন ধরে আমি নিজেও চিন্তা করছি। কলকাতায় রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে আমার এক প্রিয় বান্ধবী আছে। তার বাড়ীর একাংশে গিয়ে আমরা উঠবো। সেখানে গ'ড়ে তুলবো এক সোনার সংসার। শুধু তুমি আর আমি।

—শুধু আমি আর তুমি! আর কেউ থাকবে না?

—থাকবে? হ্যাঁ, থাকবে শুধু কামিনী। তারপর তোমার আর আমার মাঝ দিয়ে আসবে কয়েকটা সুন্দর কচি মুখ। ওরা শিশু হয়ে আসবে—বড় হবে—তারপর আমাদেরই মত জীবনের বসন্ত খেলায় ঠিক এমনি ক'রে একদিন বলবে—"তুমি আর আমি"। আমরা তখন বুড়ো হয়ে যাবো—শিথিল হয়ে যাবে আমাদের খেলার আসরে বাসরের সফল আয়োজন।

মিনতির মুখের প্রতি চেয়ে থাকে চুণী। মিনতি বারে বারে কি এত কথা বলে! তার মিনুদি মাঝে মাঝে পাগল হয় নাকি?

১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে সফি ও মিনতি ফিরে এসেছে কলকাতায়। সারকুল্যার রোডের এক পুরাতন গলিতে রাজবন্দী সমর মুখার্জ্জীর সঙ্গে আকস্মাৎ সাক্ষাৎ হ'ল।—আরে সফি যে! কোথায় ছিলে এতদিন?

—সে আর শুনবেন না। তা কেমন আছেন সমর দা?

—দেখতেই পাচ্ছিস। চল, আমাদের আড্ডায় চল।

ছোট্ট গলির মোড়ে চায়ের রেষ্টুরেণ্ট। সেই পুরাতন আড্‌ডা। সমরের সঙ্গে এখানেই সফির সময় কাটতো।

রেষ্টুরেণ্টে লোকের যথেষ্ট ভীড়। নানা রাজনৈতিক আলোচনায় মত্ত সব মানুষের দল। ঘরের এক কোণে যুবকেরা চা পান করছে। ওপাশে জানালার ধারে একদল পক্ককেশ বৃদ্ধ। তারা খবরের কাগজ সামনে ধ'রে উত্তেজনা প্রকাশ করছেন। শক্ত সামর্থ্য খদ্দর পরিহিত এক বৃদ্ধ ঘৃণা-ব্যঞ্জক মুখভঙ্গী ক'রে বললে—ডাইরেক্ট এ্যাকসন! বেটা কায়েদে আযম নয় কায়দার যম! ডাইরেক্ট এ্যাকসন দেখিয়ে উনি আদায় করিবেন পাখীর ঠ্যাং (পাকিস্তান)। কোত্থেকে এক ভুঁইফোড় ফড়িং বসে চিটিং চিটিং ক'রে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।

দ্বিতীয় ব্যাক্তি বাজখাঁই গলায় বলে উঠল—সব লাফানো থেমে যাবে। আসতে দে ষোলই আগষ্ট। সব বেটার ঠ্যাং ভেঙ্গে লট্‌পটি খাইয়ে তবে ছাড়বো। কলকাতার বুকে মোছলমানেরা চালাবে ডাইরেক্ট এ্যাকসন! শ্যাম মুকুজ্যে সবাইকে হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। এক ধারসে সাবার করতে হবে! ডাইরেক্ট এ্যাকসন! ফু!

সমর চায়ের অর্ডার দেয়। বৃদ্ধদের লীগ বিরোধী আলোচনা লক্ষ্য ক'রে সে অন্য কথা পাড়ে—কোথায় ছিলি এতদিন?

সফি এতক্ষণ উত্তেজনাপূর্ণ অবাঞ্ছিত আলোচনা কান পেতে শুনছিল। সমরের প্রশ্নে অন্যমনস্কভাব কাটিয়ে বললে—ও, হ্যাঁ। ছিলাম মধ্য ভারতের এক শহরে।

—সি, পি, তে? কবে ফিরেছিস?

—দিন পনেরো হ'লো।

—পনেরো দিন! এর মধ্যে দেখাটি পর্য্যন্ত করলিনা। যাকগে সিগারেট খাওয়া ভুলে গেছিস নাকি? বয়কে পয়সা দে সিগারেট নিয়ে আসুক।

টেবিলে শুধু চা এলো দেখে বিস্ময়মাখা কণ্ঠে সমর বলে—সে কিরে! শুধু চা খাওয়াবি নাকি? সমর খালি চা কোনদিন খায়না সে ত তুই বেশ জানিস।

সফি কিছু বলার আগেই বয়কে ডেকে সমর বলে—যা শীগ্‌গীর চপ্‌, কাটলেট, ডিমের পুডিং, মুরগীর কোরমা আর দুটো করে চারটে মোগলাই পরেটা নিয়ে আয়। আর শোন। চায়ের বদলে হয় কফি' নয় ওভালটিন, বুঝলি?

সমর এক নিঃশ্বাসে এতগুলো খাবারের অর্ডার দিয়ে দ্রুত বের হয়ে গেল। সফি অবাক হয়ে ভাবতে থাকে—সমর করলো কি! সত্যি, গায়ে হাত বুলিয়ে পয়সা খসাতে জানে সমর!

বৃদ্ধ ও বয়স্কদের উত্তেজনাপূর্ণ নানা আলোচনা। সবাই বড় বড় রাজনীতিবিদ! মাঝের টেবিলে একদল যুবক। তাঁরাও উত্তেজনা কম প্রকাশ করেছে না।—সব সব ভেস্তে দেবে। ওই জিন্না বেটাই সব ডোবাবে। মুসলমান জাতকে কি আর বিশ্বাস আছে। গরু খেকোর দল আবার রাজত্ব করবে।

আর একজন উত্তর দিল—রাজত্ব! ফু! একবার কোনমতে শালা ইংরেজকে তাড়াতে পারলে হয়। তারপর যাঁতা কলে পিসে ডাল ভাঙ্গা ক'রে ছাড়বো। মোচলমান আবার করবে রাজত্ব' সারা

কলকাতা প্রস্তুত। মা কালীর নামে পাঁঠা বলি দেবার জন্য শ্যামা গোঁপ ফুলিয়ে রেখেছে। আসতে দে'না ১৬ই আগষ্ট।

চা খেয়ে বাইরে এসে সফি বলে—কলকাতার একি আবহাওয়া সমর দা? সবার মুখে একি দারুণ পরিস্থিতির পূর্ব্বাভাষ?

সব কথা চাপা দিতে চায় সমর। বলে—না, না। ওসব কিছু নয়। তোদের কায়েদে আজম ডাইরেক্ট এ্যাকসন ডে পালন করার নির্দ্দেশ দিয়েছেন—তাই।

—ডাইরেক্ট এ্যাকসন ডে পালন হবে সে কথা ত সবাই জানে। কিন্তু তোদের কায়েদে আজম' বলার মাঝে আজ যথেষ্ট শ্লেষের পরিচয় পেলাম সমর দা। তোমার মত খাঁটি কংগ্রেসীর মুখে এমন শ্লেষ কেন প্রকাশ পেল ভেবে পাইনে। দেশের মুক্তি আন্দোলনে আমরা কম লড়িনি। জনসংখ্যার অনুপাতে মুছলমানরা একেবারে কম ত্যাগ স্বীকার করেনি। গরীব, অশিক্ষিত এবং পিছিয়ে-পড়া সমাজের কাছে এর চেয়ে বেশী আশা করাও তোমাদের ভুল। তবু দেশের মুক্তি সংগ্রামের জন্য এদের সহযোগিতার মূল্য অনেক। তোমরা পিকেটিং করেছ, তারা নির্দ্দেশমত স'য়ে গেছে। তোমরা স্কুল কলেজ বন্ধ করার কথা বলেছ, তারা নির্ব্বিবাদে শিক্ষায়তন ত্যাগ ক'রে সহযোগিতা করেছে। তোমরা বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করতে বলেছ—তারা হাসি মুখে তাই মেনে নিয়েছে। একদিনে কলম ছাড়বার আবেদন তোমাদের চাকরীজীবিরাই সফল হ'তে দেয়নি। তোমাদেরই সরকারী পোষ্যের দল হাজার হাজার নর নারীর দাবীর কণ্ঠ রোধ করেছে গুলির আঘাতে—কারা প্রাচীরের অন্তরালে নানা নির্যাতনের মাঝ দিয়ে। অথচ মুসলমান সমাজ কোনদিন বিরুদ্ধাচারণ করেনি। সাধ্যমত তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু, তবু কেন আজ তোমাদের মাঝে এত পরিবর্ত্তন?

সমর বাধা দেয়—আরে তুই যে ক্ষেপে গেলি। নানাজনের নানা বাজে কথা কান দিস কেন?

—কান কোনদিন দিইনি, আর দিতেও চাইনে। কিন্তু যে সব আলোচনা শুন্‌লাম তা অতি ভয়াবহ এবং বেদনাদায়ক পরিস্থিতির আভাস দিচ্ছে।

সমর বাধা দেয়—ওসব কিছু না। অমন আলোচনা অনেক হয়ে থাকে। তবে একথা সত্য যে জিন্নার 'টু নেশন থিওরী, ভারতের জাতীয় জীবনে বিরাট ক্ষত সৃষ্টি করবে। একই দেশের মানুষ হয়ে মুছলমানেরা পৃথক একটা রাজত্ব গঠন করুক এ কোন সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি সমর্থন করবে না?

সফি উত্তর দেয়—আচ্ছা, তর্কের খাতিরেই যদি বলি—কেন সমর্থন করবে না?

সমর বলে—করা কি সত্যি উচিত? এতবড় একটা মহান দেশ যদি কারও জিদের ফলে ভাগাভাগী হয়ে যায় তাহ'লে ভবিষ্যতে কতবড় ক্ষতি হবে তা তোর মত স্বদেশহিতৈষীকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। আরতী কি বলে জানিস? ওর মতে—সত্যিকার দেশপ্রাণ মুসলমান কখনও জিন্নাকে সমর্থন করবে না। জিন্নার দাবিকে তারা অসার ব'লে প্রতিপন্ন করবে। আরতী তোর কথা প্রায়ই বলে।

সফি উত্তর দেয়না। সমর আবার বলে—তোর মাঝে কি যে দেখেছে আরতী। চল, একবার ওকে দেখে আসবি।

—না। আজ থাক সমর দা। অনেক কাজ রয়েছে।

সমর হেসে উড়িয়ে দেয়—তোর আবার কাজ! আরতী তোকে কত ভালবাসে জানিস?

—আরতী আমাকে ভালবাসে! বলেন কি?

—সত্যি কথাই বলছি! চল না, গিয়ে নিজেই একবার প্রমান করে আসবি। তোরা দেশের জন্য—সমগ্র জাতির এত দুঃখকষ্ট

ভোগ করতে পারিস আর তার মূল্যস্বরূপ ওর মত মেয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। এই সমর মুখার্জ্জির বোন সে তা'ত জানিস। ডাক্তার জামালকে অনিতা সেন স্বেচ্ছায় স্বামীত্বে বরণ করে নিল। সত্যিকারের স্বদেশসেবী ডাক্তার বটে। জিন্নার 'টু নেশন থিওরি' প্রকাশিত খবরের কাগজ খানা সে সেদিন হাজার লোকের সামনে জুতোর তলায় মাড়িয়ে বললে—হিন্দু আর মুসলমান বলে ভারতে দুটে জাত নেই। মহান ভারতবর্ষে আছে শুধু ভারতবাসী। ভারত মাতার সন্তান সবাই। সুতরাং জন্মদাতৃ মাকে যেমন ভাগ ক'রে নেওয়া যায়না, তেমনি ভারত মাতাকেও কোন মতে খণ্ড বিখণ্ড করা চলে না। আগে আমার দেশ- তার পর ব্যক্তিগত ধর্ম্ম। কি সুন্দর যুক্তি ভদ্রলোকের।

সফি বলে—হ্যাঁ, সেই যুক্তিই ত স্বাভাবিক।

পরদিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সমরের সঙ্গে আবার দেখা। আবার আর একদিন দেখা হ'ল বালিগঞ্জ লেকে। এদিন সমরের সঙ্গে তার ছোট বোন আরতীও ছিল। আরতী এতদিনে অনেক বড় হয়েছে। সুন্দরী তন্বী আরতী অপরূপ সাজে সজ্জিত—উচ্চ শিক্ষিতা আরতী। প্রথম দর্শনেই সফির অন্তরে বিস্ময় জাগে। সেই দীর্ঘ দেড় বছর আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। কতদিন কতভাবে আরতী তাকে স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে যাবার জন্য অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। কত ভাবে সংগ্রামী সফিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। দেশাত্মবোধের চেতনা জাগাতে গিয়ে অনেক সময় উদারতার আতিশয্যে আত্মদানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। নিজকে নানাভাবে বিলিয়ে দিয়ে আরতী চেয়েছে যুবকদের মনে আগুনের তেজ বজায় রাখতে। আহত সফিকে সে একদিন নিঃসঙ্কোচে বুকে আবেষ্টন করেছিল। একদিন সদ্য জেল-মুক্ত সফিকে শত শত লোকের মাঝে প্রগাঢ় চুম্বন দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল। আর একদিন নির্জন আড়ালে তাকে পেয়ে

দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছিল—সফি দা, তোমার পায়ে একটু খানি ঠাঁই আমায় দেবে? তোমাকে অন্তরের অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করতে বড় সাধ হয়। সফি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল—একথা কেন বলছ? আরতী উত্তর দিয়েছিল—নারীত্ব যেখানে সংগ্রামী পুরুষের কাছে আত্মাহুতি দেয় সেখানে প্রশ্ন চলে কি? দেশাত্মবোধের মূর্ত্ত প্রতীক তুমি। তুমি দেবতার মত মানুষ। তাই তোমার জন্ম অর্ঘ্য সাজাতে চাই সারাটা জীবন ভ'রে। নেবে তুমি আমার পূজার ফুল?

সফি সেদিন বিস্ময়ে হতবাক। আরতীর মানসিক দুর্ব্বলতা লক্ষ্য ক'রে হেসেছিল সে।—বলে কি দুরন্ত মেয়েটি!

তারপর দেড়টা বছর তার সুদূর প্রবাসে কেটে গেছে। কেমন ক'রে কোথা দিয়ে, আরতীর জীবন-বসন্তে এত রূপ-রসের সঞ্চার হয়েছে—কেমন করে অদেখার অন্তরালে সে লোভনীয় আকাঙ্খার জন হয়ে উঠেছে—সেকথা ভাবতেও সফির বিস্ময়বোধ হয়। আজ আরতী সপ্তদশী। যৌবনরসে বিকসিত তার অঙ্গরাগ—অনুরাগে জাগে যত সুগন্ধী পরাগ!

সে ভাবলো আরতী আজও কি তেমনিভাবে তাকে ভালবাসে? কেন বাসবেনা? সে যে কংগ্রেসী। জীবন তার দেশের কাজে বিসর্জিত। সত্যি, আরতী তাকে একটুও ভোলেনি! প্রথম দর্শনেই বিমুগ্ধ আরতী বলে—আরে সফিদা যে! কবে নাকি তুমি কলকাতা এসেছ কিন্তু একদিন দেখতেও গেলে না? এমনি করে ভুলে যাবার মানুষ ত তুমি ছিলে না।

সফি উত্তর দেয়—সত্যি, একেবারে বদলে গেছি, না? তা তুমি কেমন আছ আরতী? অনেক বড় হয়ে গেছে যে।

আরতী উদ্ভাসিত মুখ নত করে। সাবলীল গ্রীবা ভঙ্গী ক'রে বলে—হ্যাঁ, অনেক বড় হয়েছি। তবে তোমার মনের পরিধি ছাপিয়ে বিরাট কিছু হইনি।

কি একটা কাজের অছিলায় সমর চলে গেল—তোরা কথা বল. আমি সাউথ এণ্ড পার্ক থেকে ঘুরে আসি।

ভালই হ'ল—মনে মনে ভাবে আরতী। সফির প্রতি মুখ ফিরিয়ে বলে—কি? অমন ক'রে কি দেখছ, বলত?

—দেখছি, আজও তোমার মাথায় সিঁদূর জাগেনি কেন?

—জাগবে নিশ্চয়ই। নিজ হাতে দাওনা একদিন পরিয়ে। দেশ-বরণ্যের হাতের সিঁদুর—সেই ত আমার কাম্য। চল, ফাঁকা নির্জ্জন স্থানে গিয়ে বসি। কেমন কচি কচি ঘাস। লেকের শান্ত নীল জল অবধি ঘাসের সবুজ গালিচা। চল।

ফাঁকা নির্জন স্থান। জনবহুল লোকের বুকে একটুখানি আড়ালও বটে। উভয়ে অর্দ্ধশায়িত। আরতীর শাড়ীর আঁচল শ্যামল ঘাসের ওপর ছড়িয়ে আছে। বাম বাহুর ওপর ভর দিয়ে অভিনব ভঙ্গীতে বসেছে আরতী। হাতের শুভ্র-কোমল কব্জিতে সোনার ঘড়ি। অপরূপ সুডৌল সুঠাম তার হাত দু'খানা। প্রতিটি লোমকূপ ভেদ ক'রে রক্তের লাল কণিকাগুলো যেন বের হয়ে আসতে চায়! এমন সুন্দর চোখ ঝল্‌সানো রঙ আরতীর।

সফি নীরব নিষ্পলক। আরতী অপাঙ্গে চেয়ে দেখে তাকে। কি যেন চিন্তা করে সে। তারপর সহসা বলে—আমি তোমায় বিয়ে করতে পারি, তা জান?

—বিয়ে! আমাকে! অদ্ভুত প্রস্তাব! এ-ও কি সম্ভব?

—কেন, বিশ্বাস হয় না?

—বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। এযে অসম্ভবের সম্ভাবনা।

আরতী দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দেয়—কিছুই আজ অসম্ভব নয়। দাদা বলেন—সত্যিকার স্বদেশ সেবিদের মাঝে তুমিও একজন। কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা নেই তোমার মাঝে! দেশের লাখো লাখো মুসলমান যখন পৃথক রাষ্ট্র গঠনের জন্য ক্ষিপ্ত, তখনও তুমি সমগ্র ভারতের মুক্তি

কামনা কর। দাদার মুখে একথা শুনে সবার চেয়ে বেশি গর্ববোধ করেছি আমি। তাইত তোমাকে এত ভালবাসি।

সফি শান্ত কণ্ঠে বলে-এ ভালবাসা তোমার উচিত নয় আরতী। তা'ছাড়া তোমার আর আমার মাঝে রয়েছে অনেক ব্যবধান। তুমি উচ্চবংশীয় হিন্দুর মেয়ে। দেহে তোমার ভিন্ন রক্তের ধারা। আমার মত ঐশ্বর্য্যহীন ভবঘুরে মুসলমানের সঙ্গে তোমার রক্তপ্রবাহ মেশাতে হ'লে অনেক ত্যাগের প্রয়োজন। ধর্ম্মগত, জন্মগত এবং সমাজগত সংস্কার এক নিমেষে ত্যাগ ক'রে অজানার পথে নেমে আশা অনেক বাধা বহুল। তুমি তা পারবে না। আর তা পারা উচিত বলে ও আমি মনে করি না।

আরতী ব্যথা ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বলে—এর কি উত্তর দেব, বল? তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার না?

—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়।

সহসা সফির একখানা হাত আঁকড়ে ধরে আরতী বলে—তুমি ভেবেছ আমার অন্তরে উদারতার অভাব। কিন্তু কতখানী পারি তাই তোমায় দেখাব। আরতী নিমেষে প্রবল আকর্ষণে সফির হাতখানা টেনে নেয় বুকের মাঝে। বলে—পরীক্ষা কর। আরতী কতখানী পারে, একবার পরীক্ষা কর।

কী দুরন্ত মেয়ে! সফির বুক কেঁপে ওঠে। শূন্য আকাশতলে সন্ধ্যা-সমাকীর্ণ। জনবহুল পথের ধারে কী ভয়াবহ অবরোধ'! একি দুরন্ত ক্ষিপ্ততা! ছি! ছি! ছি! সফির মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে। অস্ফুটে উচ্চারণ করে—আরতী! ছি একি করছ তুমি?

নিমেষে আরতী কেমন যেন ছোট হয়ে যায়। তবু স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ ক'রে বলে—তোমার অনুভূতির অভাব ছিল—তাই। আরতী ভুল করেনি।

—ভুল করনি! কিন্তু এ-ও কি সম্ভব?

সফি ভাবে—সত্যি হয়ত আরতী ভুল করেনি। কেন সে ভুল করবে? সে যে দেশবরণ্যের হাতে পরতে চায় বরণ মালা। কী কোমল মস্থণ আরতীর কুসুম দেহ। সপ্তদশী যুবতীর উষ্ণ-চঞ্চল বক্ষদেশ। তারই ত্বড়িৎ প্রবাহের ভীরু আস্বাদন। সফি ভাবতেও পারে না আরতী এনিভাবে নিজেকে বিলাতে পারে।

সন্ধ্যার ধূসর এখন আঁধারে বিলীন। গোধূলির রঙে নামে অন্ধ যবনিকা! সমর এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে—কিরে? অমন চুপ ক'রে তোরা বসে আছিস কেন?

আরতী ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়! অপ্রতিভ কণ্ঠে কান্নার সুরে উচ্চারণ করে—দাদা।

আর কিছু বলতে পারেনা সে। শত অপরাধে অপরাধী যেন। তার ব্যক্তিত্বে আজ হীনতার গ্লানিমা। ব্যর্থ-বিবশ বোনের প্রতি চেয়ে সমর মৃদু হাসে।

সফি ঘরে ফিরে যায়। আরতীর অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ তাকে বিস্মিত করে। এমন ক'রে পারে আরতী? না, না, এ প্রহসন। এ শুধু ভুলিয়ে রাখা। কতজনকে ওরা এমনি ক'রে ভুলিয়ে রাখে। ওরা যে ভুলিয়ে কাজ আদায় করে।

নিস্তব্ধ দুপুর। ছুটতে ছুটতে ঘরে ফিরে এসে কামিনী বলে—এই রইলো তোমার টাকা। বাববা, খুব বেঁচে গেছি! টাকা রেখে কামিনী হাঁপাতে থাকে।

মিনতি প্রশ্ন করে—কি হ'ল তোমার?

কামিনী বলে—সেই যে—গত কাল—যে পাগলটা সন্দেশ কেড়ে নিয়েছিল—সেই—ধ'রে ফেলেছিল আর কি!

মিনতির কৌতুহল বাড়ে। বলে—চল্। কেমন পাগল একবার দেখে আসি।

যানবাহন বিরল রাস্তায় দুরন্ত বালকের দল পাগলকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে। তাদের প্রস্তরাঘাতে পাগলের পৃষ্ঠদেশ ক্ষত বিক্ষত। সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ছাপ। মিনতি কাতরকণ্ঠে উচ্চারণ করে—আহারে এমন ক'রে কে মারলে ওকে?

বাইশ তেইশ বছরের একজন স্ত্রীলোক মাথায় ঘোমটা টেনে কাছে বসে বলে—এ পাড়ার ছেলেগুলো ভারী বদ। নানা লোকে ওঁর মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছে—তাই। নইলে উনিও একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন।

মিনতি প্রশ্ন করে—উনি তোমার কে, বোন?

—স্বামী। আমার ইহকাল পরকালের সাথী।

মিনতি অস্ফুটে আপন মনে উচ্চারণ করে—স্বামী। ইহকাল পরকালের সাথী।

পাগল এতক্ষনে কাছে এসে দাঁড়ায়। মিনতি গভীরভাবে পথর করে দেখে তাকে। মুহূর্ত্তে তার গত জীবন মিনাতে ফিরে যায় সে। তার পরিত্যক্ত স্বামী আনোয়ারের বিকৃত রূপ নয়ত?

হ্যাঁ, সেই ত ! পাগল মিনতিকে লক্ষ্য ক'রে অদ্ভুত হাসি হাসে । মনে মনে সহস্র বিদ্রুপের আঘাত হানে সে ! সে-আঘাত মিনতির জীবন-তারে বেজে ওঠে রোদনের সুর । তার বুক ফেটে কান্না বের হয়ে আসে । শান্ত, অবরুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে মিনতি বলে—এমন পাগলকে নিয়ে ঘর করেও তুমি আজ সুখী বোন ।

পাগল আরও কাছে এগিয়ে আসে । বলে তোমাকে চিনেছি । ঠিক চিনেছি । কিন্তু কি বিশ্রী চেহারা তোমার । কি জঘন্য তুমি ! তোমার সারা দেহে দুর্গন্ধ । হাঃ হাঃ হাঃ !

পাগল আকাশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে সজোর নিঃশ্বাসে বুক ফুলায় । তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলে—আমি সত্যের চাবুক ! আমি বিচারক ! ন্যায়দণ্ড আমারই হাতে । আমি প্রতিশোধ নেবো, শাসন করবো কঠোর ভাবে শাস্তি দেবো ।

কিছুক্ষণ আকাশের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে সে । তারপর সহসা উন্মাদনায় কেঁদে ওঠে—না না ! আমি অক্ষম অমি দুর্ব্বল । পারিনে ! এতটুকু কঠোর হয়ে শাস্তি দিতেও পারিনে ।

মিনতি শান্ত বেদনাতুর কণ্ঠে প্রশ্ন করে—তোমার স্বামীর কোন চিকিৎসা করাচ্ছ, বোন ?

—কে করাবে তার চিকিৎসা ? রতনদীঘির চৌধুরীবাড়ীর ছেলে উনি । কিন্তু কেও নেই ওঁর । আমার বাপের অবস্থাও তেমন স্বচ্ছল নয় । তবু অনেক চেষ্টায় কিছু পয়সা জুটিয়ে কলকাতায় এনেছিলাম চিকিৎসা করাবো ব'লে ।

কোথায় উঠেছ তোমরা ?

রাস্তার বাঁকে একখানা ভাঙা বাড়ী দেখিয়ে মেয়েটি বলে—ওই ওখানে । মসজিদের পাশের বাড়ীতে ।

সঙ্গে সঙ্গে পাগল উৎকট হাসি হেসে অঙ্গুলী সঙ্কেতে আকাশ দেখিয়ে বলে—উ—ই ওখানে । যাবে ?

মিনতি অভিভূতের ন্যায় উত্তর দেয়—হ্যাঁ, যাবো। তুমি নিয়ে যাবে আমায় ?

পাগল দৃঢ়কণ্ঠে বলে—তোমাকে ! না, না ! তুমি পাপী ! তুমি অপবিত্র। কী বিশ্রী, জঘন্য তুমি !

পাগল ঘৃণা ভরে মিনতির গায়ে একমুটো ধূলো নিক্ষেপ ক'রে রাস্তার অপরপ্রান্তে ছুটে যায়। মিনতি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। পাগলের কঠিন বিদ্রূপে সে ভেঙ্গে পড়ে।

আর একদিন পাগল আসে বাড়ীর সামনে। মিনতি কামিনীকে বলে—পাগলটাকে বাড়ীর ভেতরে আনতে পারিস ? যেমন করে হোক একবার নিয়ে আয়।

কামিনী ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। ফলে মিনতি নিজেই এগিয়ে যায় সদর দরজায় ! তাকে-দেখে পাগল এগিয়ে এসে করুণ ভাবে হাত পাতে—একটা পয়সা আমায় দেবে ?

শান্ত, আদর-মাখা কণ্ঠে মিনতি জিজ্ঞাসা করে—পয়সা নিয়ে কি করবে বল ?

খেলা করবো। দাওনা একটা পয়সা।

পাগলের চোখ কোঠরগত। নির্গত লালায় তার মুখ-গহ্বরে বিকট দুর্গন্ধ। বিশ্রী নোংরা তার দেহ। দেশের এতবড় দার্শনিকের প্রতি মিনা এমন জঘন্য অবিচার করেছে।

নিমেষে অশ্রু সজল হয়ে ওঠে সে। আর্দ্র কণ্ঠে মিনতি জানিয়ে বলে—এস, আমার ঘরে এস। অনেক টাকা তোমায় দেবো।

মিনতির গলায় মুক্তার মালা। পাগল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে মালা লক্ষ্য করে একগাল হাসি হেসে বলে—ওটা আমায় দেবে ?

—হ্যাঁ, সব তোমায় দেবো। কিছু খাবে ?

পাগল আগ্রহ প্রকাশ করে—কি ? সন্দেশ ?

—হ্যাঁ' সত্যি আমার ঘরে অনেক সন্দেশ আছে। এস।

পাগল মাথা নেড়ে দৃঢ়তার সঙ্গে অসম্মতি জানায়। রাজসিক কায়দায় সে মিনতির দরজায় ব'সে আপন মনে সুর ক'রে গান গায়। ব্যর্থতায় হাঁপিয়ে ওঠে মিনতি। অনন্যোপায় হয়ে কামিনীর সাহায্যে সন্দেশ এনে প্লেটখানা পাগলের সামনে তুলে ধরে। কিন্তু পাগল ঘৃণাভরে দূরে স'রে যায়। বলে—উহুঁ! কিছু খাবো না। শুধু একটা পয়সা আমায় দাও।

মিনতির মুখ ফুটে কথা বের হয়না। অবাধ্য ব্যথা-অশ্রু নামে ধারা নিয়ে? ঘর থেকে অনেকগুলো দশ-টাকার নোট এনে সে পাগলের হাতে দেয়। পাগল উল্লাসভরে কাগজের নোটগুলো নাড়াচাড়া করে। গম্ভীর হয়ে তন্নতন্ন ক'রে কি যেন খোঁজে সে। ক্ষণিকে তার চোখ-মুখ ছেপে ফুটে ওটে অদ্ভুত হাসি। হাসি নয়, বিকট অট্টহাসি বিভৎস কর্কস কণ্ঠের গর্জ্জন যেন। মুহূর্ত্তে তার চোখে-মুখে কাঠিন্য ফুটে ওঠে। ঘৃণায় কুঞ্চিত হয় পাগলের মুখ। নোটগুলো ছুঁড়ে ফেলে সে মিনতির গায়ের ওপর। চীৎকার ক'রে বলে—কী বিশ্রী ময়লা টাকাগুলো। তোমার গায়ে জঘন্য দুর্গন্ধ। নেবো না' তোমার টাকা কখনো নেবো না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পাগল মধুর হাসি হাসে। মিনতির জীবন তরঙ্গে লাগে তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাতে। সে ত্বড়িৎ গতিতে ছুটে যায় পাগলের কাছে। অনুনয়-কাতর কণ্ঠে বলে—ন', না! অমন ক'রে বলো না। একটা সন্দেশ অন্তত খাও। তুমি যে সন্দেশ চাইলে। খাও।

মিনতির হাতে সন্দেশের প্লেট। অনেকগুলো টাটকা সন্দেশ তাতে সাজানো। পাগল গভীর দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে সেগুলো। তারপর কি যেন চিন্তা করে একখানা তুলে নেয় হাতে।

মিনতি মিনতি করে—খাও। এ গুলো সব খাও। আরও আছে, সব এনে দেবো।

মিনতির অনুনয়-ক্লান্ত মুখের প্রতি পাগল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। সে দৃষ্টিতে অসীম শক্তি। তীক্ষ্ণধার বাণ যেন। মিনতি মুখ তুলে তাকাতে পারেনা। তার সর্ব্ব শরীর কাঁপতে থাকে। অস্থির হয়ে উঠে মিনতি। এক গাধা থুথু নিক্ষেপ ক'রে পাগল অকস্মাৎ ছুটে আসে মিনতির একান্ত কাছে। সে কি উল্লাস পাগলের!

কিন্তু একি হ'ল! প্লেটের সন্দেশগুলো মাটিতে ফেলে পাগল পায়ে দ'লে চ'লে গেল যে! সবগুলো সন্দেশ সে এমনিভাবে পথের ধূলায় ফেলে গেল!

পাগল ছুটে চলেছে! আনন্দ-উল্লাসে গগন বিদারী হাসি হেসে চলেছে! কী দুরন্ত ওর গতিবেগ! কী কর্কশ ওর হাসির আওয়াজ। প্রাসাদে প্রাসাদে জাগে সে হাসির প্রতিধ্বনি।

মিননি ভেঙ্গে পড়ে। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কাতর কণ্ঠে ডাকে—কামিনী। একবার এখানে আয় দেখি।

কামিনী সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে। বলে—কি মা?

আর্দ্র কণ্ঠে মিনতি বলে—ওযে একখানা সন্দেশও খেলনা কামিনী। ওই দেখ, সবগুলো সন্দেশ পায়ে দ'লে রেখে চলে গেল। টাকাগুলো পর্যন্ত্য পথে ছড়িয়ে দিয়ে গেল। বললে—আমার গায়ে নাকি জঘন্য ময়লা—বিকট দুর্গন্ধ।

দলিত মথিত সন্দেশগুলোর প্রতি কামিনী সকরুণ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে উত্তরে বলে—না বলে মা। ওযে বদ্ধ পাগল।

—পাগল! হ্যা, সত্যি পাগল! তুই আমায় ঘরে নিয়ে চল কামিনী। আমার মাথা ঘুরছে—কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে।

কামেনী কাছে এসে দাঁড়ায়। মিনতি হাত বাড়িয়ে অবলম্বন খোঁজে। নিজের অস্তিত্বকে সে যেন হারিয়ে ফেলেছে।

রাস্তায় দশ টাকার নোটগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে আছে। এক ঝলক দমকা হাওয়ায় সেগুলো খস খস শব্দে আলোড়িত হয়ে এদিক ওদিক উড়তে থাকে। কামিনী ছুটে গিয়ে দু'হাতে নোটগুলো কুড়াতে আরম্ভ করে।

মিনতি ম্লান মুখে বেল—টাকা! টাকা দিয়ে কি হবে কামিনী? উড়ে যাক, সব উড়ে যাক্।

কামিনী বলে—তাই ব'লে এতগুলো টাকা—

মিনতি উত্তর দেয়—হ্যাঁ, সব। সব কিছু এমনি ক'রে উড়িয়ে দেবো। ওর মত সবকিছু পায়ে দ'লে চ'লে যেতে পারবো না কামিনী? ওই পাগলের পেছনে পাগলিনী হয়ে ছুটে গিয়ে কি ধরতে পারবোনা ওকে? বল, বল্‌, কামিনী সত্যি ক'রে বল্?

মিনতি ছিন্ন লতিকার ন্যায় কামিনীর গায়ের ওপর গিয়ে ঝুঁকে পড়ে। কামিনী যেন তার অস্থির দেহের অবলম্বন।

—তুমি অমন করছ কেন মা? অসুখ করেনি ত?

ম্লান, মুমূর্ষের হাসি ফুটে ওঠে মিনতির পাণ্ডুর মুখে। ক্লান্ত কণ্ঠে বলে—অসুখ! হ্যাঁ, অসুখই হয়েছে। কিন্তু কোনদিন এমন অসুখ আমার ছিলনা কামিনী। আজই হ'ল। এ বড় কঠিন অসুখ রে। এর ওষুধ জানিস?

মিনতির আকস্মিক এবং দুর্ব্বোধ্য ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে কামিনী বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। কোন উত্তর দিতে পারেনা। মিনতির হাতে সন্দেশশূন্য চিনেমাটির প্লেট। অশ্রু-বিগলিত চোখে শূন্য প্লেটের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মিনতি। শিথিল হয়ে আসে তার হাত দু'খানা। ক্ষণ-ভঙ্গুর প্লেট সান বাঁধানো ফুটপাতে পড়ে আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে। ফিরেও তাকিয়ে দেখেনা মিনতি। অভিভূতের ন্যায় সে এগিয়ে যায় ঘরের দিকে। পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে যায় খণ্ড বিখণ্ড চীনা প্লেটের অংশগুলো।

কামিনী বিস্ময়ে হতবাক্। বলে—দামী প্লেটখানা এমন করে ফেলে ভাঙলে মা?

মিনতি মৃদু হাসি ফুটিয়ে বলে—এমনি করে সব কিছু ফেলে কবে যে আসল পথে এগিয়ে যেতে পারবো তাই ভাবছি কামিনী। সেখানে না গেলে আমার অসুখ আর সারবে না।

সিঁড়ির ধারে গিয়ে বসে মিনতি। বিড়বিড় ক'রে বলে-ও আমার সবকিছু ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে গেল! কিছু গ্রহণ করলো না! আমার ঐশ্বর্য্য, রূপ, যৌবন—আমার আবেদন মিনতি কিছুই ওর মনে দাগ কাটতে পারলো না। মিনতি সহসা কাকে যেন লক্ষ্য করে নিজ মনে বলে—হ্যাঁ—হ্যাঁ—ওযে অনেক বড়। মস্ত বড় দার্শনিক। ও জানে সত্যিকার পথের সন্ধান, জানে শাসন। ওযে অনেক বড়। আজ বুঝতে পারছি ওর কাছে কত ছোট আমি। দার্শনিকরা এমনি ক'রেই উদ্ধত মানুষদের শাসন ক'রে থাকে। এ যে আমার কত বড় শাস্তি তা কেউ বুঝবে না কামিনী, কেউ বুঝবে না।

মিনতির ম্লান মুখের প্রতি কামিনী চেয়ে থাকে। পরাজয়ের গ্লানিতে ভরা সে মুখ। এক মুহূর্ত্তে বদলে গেছে সে।

(১৯)

১৯৪৬ সালের ষোলই আগষ্ট। আকাশে একখণ্ড মেঘ নেই, বাতাসে উদ্বেগ-চাঞ্চল্য নেই—পৃথিবীর আদি রক্তে উষ্ণতার চিহ্নমাত্র নেই। প্রতিদিনের বাসর জাগিয়ে স্ত্রীরা লজ্জারুণ মুখে, চকিত পদে

শয্যা ত্যাগ করেছে, মায়েরা সন্তানের মুখ থেকে স্তন্য কেড়ে নিয়ে সন্তর্পনে স'রে গেছে সংসারের কর্মব্যস্ততার মাঝে। বালক বালিকাদের দুষ্টুমীতে মুখর হয়ে উঠেছে প্রভাতের শান্ত আঙিনা। নাই, কোথাও আসন্ন ঘুর্ণী ঝড়ের চিহ্নমাত্র নাই। আত্মজনদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির—মানবাত্মার আকুল আর্ত্ত-ক্রন্দনের—মৃত্যুমহড়ায় নিষ্ঠুর নৃশংসতার কোন পূর্ব্বাভাস নাই।

কিন্তু ছিল সবই। গোপনে, পর্দ্দার আড়ালে নর-পশুদের ক্রুর হিংসানল ছিল সতেজে প্রজ্জলিত। তাদের মনুষ্যত্বের বুকে পশুত্বের নির্ম্মম আয়োজন ছিল দিনের পর দিন ধরে। লক্ষ লক্ষ নরনারীর ধ্বংস সাধনে কোলকাতার সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরীকগণ সেদিন মেতে উঠেছিল দারুণ বিভৎসতায়।

সূর্য্য তখন প্রায় মধ্য গগনে। নগরীর যান বাহন অন্য দিনের মতই সেদিনও স্বাভাবিক। মহানগরীর আওতায় পুষ্ট সমস্ত জনপদ ডাইরেক্ট এ্যাকসন ডে'পালনের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তারা সমবেত কণ্ঠে জানাবে পাকিস্তান অর্জ্জনের দাবী—কেন তারা পৃথকভাবে চায় রাষ্ট্র গড়তে—তারই দাবী। বিপুল জনসমাগম হবে গড়ের মাঠে। সেখানে জমায়েত হবার জন্য নগরী উৎসুক হয়ে উঠেছে। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবার মুখে সাজ সাজ রব। কোন্ অজানিত অমঙ্গল মাঝে সেদিন মায়েরা, বধুরা, বোনেরা তাদের প্রিয়জনদের সহাস্য মুখে, শঙ্কাহীন চিত্তে নিজেদের কর্ম্মক্ষেত্রে যাবার জন্য বিদায় দিয়েছিল কে জানে। আজরাইলের প্রস্তুতি তলে খোদার সেকি বিচিত্র ইঙ্গিত। অলক্ষ্যে অমঙ্গলও সেদিন ক্রুর হাসি হেসে ছিল। কিন্তু কেউ দেখেনি সে গোপন হাসি।

জীবনের চলমান স্রোত আরও সজিব হয়ে উঠলো। নগরীর স্নায়ুকেন্দ্রে, রাজপথের শাখা প্রশাখা ধরে এগিয়ে চলেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। মুখে শিশুর সারল্য নিয়ে, দাবীর ঝাণ্ডা ব'য়ে জাতীয়

ঐক্যের প্রতীক হাতে ওরা এগিয়ে চলেছে। ভাবতেও পারেনি এতকালের সৌহার্দ্যে কখন যেন ছেদ পরে গেছে—ধুরন্ধর একজাত মানুষের ছুরির তেজ গেছে বেড়ে।

গভীর থমথমে আবহাওয়া। আকাশে বাতাসে অযুত কণ্ঠের ঐক্য ধ্বনি। মিছিলের পর মিছিল এগিয়ে চলেছে নগরীর শিরা উপশিরায় রক্তকণিকার সতেজ গতি যেন। অবিরাম অবিশ্রান্ত ধ্বনি, উল্লাস মুখর গতি। আকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো মহানগরীর বুক। স্বাভবিক জন কোলাহল ছাপিয়ে শ্রুত হ'ল ক্রন্দন রোল। মুমূর্ষ মানুষদের কণ্ঠে ফুটে উঠলো কলেমা শাহাদৎ, আহত আত্মায় জাগলো বিস্ময় বিপুল। অকারণে আকস্মাৎ একি নির্ম্মম গজব।

মৃত্যু মহড়ায় জীবনের নিষ্ঠুর আহুতি শুরু হয়ে গেল। এমন মৃত্যু কেউ দেখেনি। এমন নিষ্ঠুরতার কথা কেউ কোনদিন শোনেনি। দু'ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকার সারি, মাঝখানে মিছিলরত লক্ষ লক্ষ্য মানুষ। শিলাবৃষ্টির মত প্রতিটি বাড়ীর ছাদ হ'তে ঝ'রে পড়ল আগুনের মশাল—অংসখ্য ইট পাথরের টুকরো। সম্মুখে, পেছনে ডাইনে, বামে—কোনদিকে আত্মরক্ষার পথ খোলা নাই। গগন বিদারী আর্ত্তনাদ ওঠে। প্রাণভয়ে দিশাহারা ছুটাছুটি শুরু হয় চতুর্দ্দিকে। কিন্তু অমঙ্গল মুখ ফিরিয়ে হাসে। ক্রুর হিংস্র মানুষের দল অবাধে নিষ্ঠুরভাবে অমানুষিক বর্ব্বরতায় হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে বোমার প্রচণ্ড আঘাতে, গুলির অন্তর্ভেদী অজস্রতায় হাজার হাজার নিরীহ মানুষ শহীদ হ'য়ে গেল। তাদের তাজা খুনে রাজপথ হ'ল কলঙ্কিত বাতাস দূষিত হ'ল দগ্ধ নরদেহের গন্ধে। জীবনের সহজ গতির হ'ল ছন্দ পতন। চলমান জনস্রোত মুহূর্ত্তে থেমে গেলে। অজস্র জীবনদল মাটির মায়ায় গেল ঘুমিয়ে। ওদের শান্ত সমাহিত, নিষ্প্রাণ দেহের পাশে অজস্র আহতের স্তূপ। যন্ত্রণা-কাতর মানুষের আকুল আর্ত্তনাদ—মৃতোর পাশে ওরা যেন শোকার্ত্ত আত্মজন।

অট্টালিকার ছাদে ছাদে বিকট-দশনা নরপশুর দল। নিষ্ঠুর নৃশংসতার মাঝে সাফল্যের ক্রূর হাসি ওদের মুখে। জীবাত্মায় অন্তিম আঘাত হেনে হাসছে ওরা। খোদা কি কোনদিন ওদের পাপের জন্য ক্ষমা করবেন?

অচিরে নগরীর অলিতে গলিতে আর্ত্তক্রন্দনের রোল শোনা গেল। শোকে মূহ্যমান হ'ল মহানগরী! সে এক নতুন কারবালা—সে এক নতুন জাগরনের ইঙ্গিত। মুহূর্তের হঠকারিতায় জীবনের মায়াডোর ছিন্ন হয়ে গেল, সজ্জিত কুসুম আঘাতে অবহেলায় হ'ল মলিন। ওদের নিষ্ঠুর খুনের খেলায় বিকল হয়ে গেল এতদিনের চলমান যন্ত্র। কিন্তু মিছিলরত মানুষের ঈমান টলেনি। শত ঝনঝায় তাদের ঈমান নষ্ট হয়নি। তাই গড়ের মাঠে অশ্রুভারানত চোখে জমায়েত হ'ল লক্ষ লক্ষ মানুষ—তারা ঐক্যতান তুললো আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে। অবিচল ভাবে নেতার নির্দেশে, ঈমানের, জোরে পালন করল তারা জাতীয় জীবনের ঐতিহাসিক দিন।

ক্রমে নগরের প্রশস্ত রাস্তাগুলো জনবিরল হ'ল। যান বাহনের গতি বিদেশী আরোহীদের মাঝে হ'ল সীমাবদ্ধ।

বৈকালী আকাশ। সন্ধ্যা নেমে আসছে গগন প্রান্তে। রক্তাবিরে পশ্চিম আকাশ ভুখা-রাক্ষসীর মত করাল। আকাশে মেঘের স্তূপে যেন আগুনের তাণ্ডব। তার তলে জমাট বেঁধে আছে গাঢ় অন্ধকার। তারও গহীন তলে লুকিয়ে আছে নর-পশুদের সুগভীর ষরযন্ত্র। নিরীহ, সরল, অসহায় মানুষদের উৎখাতের ষড়যন্ত্র।

মসজিদে মসজিদে আজান ধ্বনি—উদাত্ত নির্ভিক আহবান সুর। মহাকালের বুকে শাশ্বত বাণীর সুস্মিত আহবান। সত্য ও সুন্দরের ছায়াতলে আত্মার সমর্পণের জন্য মধুর আহবান। মহান জাগরণ। মোয়াজ্জিনের কণ্ঠে যেন প্রাণের স্পন্দন।

অশ্রু মুছে সজাগ হয়ে ওঠে শোকার্ত্ত নরনারী। গোবরা আর

মানিকতলার গোরস্থান হ'তে ফিরে এলো হাজার হাজার মানুষ। ওরা লাশ দাফন করে ফি'রে এলো। তরতাজা আত্মজনের রেখে এলো মাটির তলায় শুইয়ে! ওরাও মুছলো চোখ—ওরাও প্রস্তুত হ'ল নামাজের জন্য। কিন্তু কোনদিন ওরা কি ভুলতে পারে এমন আকস্মিক বিচ্ছেদ বেদনার কথা?

নামাজ শেষ হয়েছে। সন্ধ্যার ধুসর তখন অন্ধকারে গাঢ়। আকস্মাৎ গোধুলির সেই রক্তাবিরের দৃশ্য ফুটে উঠলো অন্ধকারের বুকে। শ্যাম বাজারের বস্তীতে বস্তীতে আগুনের লেলিহান ফণা। ভয়ার্ত্ত, অসহায় নরনারীর আকুল আর্ত্ত কোলাহল। রাঙা হয়ে উঠলো রাতের আকাশ।

কাশীপুরের এক দুর্গত এলাকায় সারাদিন আট্‌কা পড়েছিল সফি। রাতের অন্ধকারে ট্যাক্সিযোগে বাসার দিকে এগিয়ে আসছিল সে। অকস্মাৎ বস্তী এলাকার সীমান্তে গুলির আঘাতে নিহত হল ড্রাইভার। সফিকে আত্মগোপন করতে হ'ল গলির মাঝে।

হাজার হাজার মানুষের আকুল আর্ত্তনাদ। অজস্র হাত বোমার আওয়াজে কেঁপে উঠেছে মহানগরীর বুক। বিভৎসতায় ভীষন হয়ে উঠছে কলকাতা। পুড়ে গেল—সবকিছু পুড়ে গেল! আগুনের তাণ্ডবে পুড়ে গেল শত শত আবাস গৃহ—গরীবদের সব সম্বল।

চীৎকার। আবার চীৎকার।—বাঁচাও, আমাদের বাঁচাও। দোহাই তোমাদের। আর্ত্তকণ্ঠের মিনতিমাখা ব্যাকুল অনুনয়।

মানুষ মরণশীল। কোনদিন এর ব্যতিক্রম হয়নি—হবেও না। তবু মানুষ চায় বাঁচতে—সুন্দর এ পৃথিবীতে—জঘন্য এ পৃথিবীতে—নির্য্যাতন-প্রপ্রীড়িত এ পৃথিবীতে মানুষ চায় বেঁচে থাকতে। শুধু বেঁচে থাকতে। সম্পদ, বৈভব—মান, সম্ভ্রম কোন কিছুই জীবনের চেয়ে বড় নয়। তাই মৃত্যু-দানবের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মানুষ সহস্র কাতর কণ্ঠে চাইছে প্রাণভিক্ষা। শুধু বেচে থাকার

জন্ত এতটুকু অনুগ্রহ। ওরা সর্ব্বস্বান্ত হয়ে—ভিক্ষার ঝুলি হাতে—প্রাণ নিয়ে চাইছে সরে যেতে।

কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে ওদের আকুল আবেদন। জীবনের ক্রন্দনে জাগেনি জীবন। মান, সম্ভ্রম সব কিছু বিলিয়ে দিয়েও ওরা পারেনি বাঁচতে। তাই প্রতিরোধ দিয়েছে? বেপরোয়া প্রতিরোধ। মরিয়া হয়ে করেছে ওরা যুদ্ধ।

প্রবহমান বিক্ষিপ্ত নরনারী ছুটে চলেছে। ওদের মাঝে সফিও ছুটছে আত্মরক্ষার্থে। তারপর থামতে হয়েছে এমন এক স্থানে যেখানে সমরদের বাড়ী।

সরম! হ্যাঁ, সফির পুরানো কংগ্রেসী বন্ধু সমর মুখার্জ্জি। ওই ত আলোকোজ্জ্বল সমরদের দালান বাড়ী। অন্ধকারে দূরে দাঁড়িয়ে সফি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ওখানে সমর আছে—আরতী আছে—আরও অনেক বন্ধু আছে। ওরা এ বিপদে সফিকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। আরতী যে সফির কাছে জীবন সত্তা বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। আরতী তাকে ভালবাসে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।

সফি সন্তর্পণে এগিয়ে যায়। কিন্তু ভাগ্যের একি দারুণ পরিহাস জীবনের অটল বিশ্বাসে আজ একি বিভ্রান্তির স্পষ্টতা! এত কালের অহিংস মন্ত্রের পূজারীর মুখে নিদারুণ হিংসার উত্তেজনা! সমরের কণ্ঠ! হ্যাঁ, সমর হুঙ্কার ছেড়ে বলছে—সাবাড় ক'রে আসবি। সব শালাকে শেষ ক'রে আসবি। একটা মুসলমানও যেন রেহাই না পায়। ষ্টেনগানে গুলি ভর্ত্তি রয়েছে—খাঁড়াগুলোতে সিঁদুর মাখিয়ে রেখেছি। ছুটে যা—সবাই।

উঃ! সমরের কণ্ঠে আজ একি নিষ্ঠুরতা! সমর কি এমনিভাবে বদলে গেছে!

পাশ দিয়ে উন্মত্ত বেগে কয়েকজন যুবক হত্যার তাণ্ডবে ছুটে গেল। হাতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। তীব্রবেগে ছুটে গেল তারা।

এবারে মেয়ে কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল। কোমরে কাপড় জড়িয়ে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে একদল মেয়ে। তারা আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আরতী—নারী বাহিনীর সেনাপতি সে। আরতী উত্তেজনা প্রকাশে চিৎকার ক'রে বলছে—এগিয়ে যা এগিয়ে যা। নৃমুণ্ডমালিনীর মূর্ত্তিতে, সংহারিণীর মূর্ত্তিতে ভৈরবী মা কালির মূর্ত্তিতে এগিয়ে যায়। একটা মুসলমানও যেন ফিরে যেতে না পারে।

—আরতী! স্পষ্ট-কণ্ঠ আরতীর? বৈদ্যুতিক আলোতে দাঁড়িয়ে রক্ত লোলুপ মূর্ত্তি আরতী! সমর মুখার্জ্জি আর তার বোন আরতীর এ-ই রূপ! অবিশ্বাস্য! একেবারে অবিশ্বাস্য।

ওরা সাম্যের গান গায়—বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন দেখে-মানুষে মানুষে প্রীতির সম্বন্ধ কামনা করে, ওরা মানবতার দোহাই দেয়, মানুষ্যত্বের বড়াই করে। এত জঘন্য ওদের মনোবৃত্তি! এত নিষ্ঠুর, বহুরূপী ওরা? এমনি ক'রে সনাতন আদর্শে জলাঞ্জলি দিতে পারে? মহান জাতি গ'ড়বার সংগ্রামকে এভাবে কলঙ্কিত করতে পারে? এ যে স্বপ্নেরও অতীত। ওদের স্বরূপ আজ প্রকাশ পেয়েছে।

সফির চিন্তার স্রোত অকস্মাৎ থেমে যায়। মুখ ঘুরিয়ে চাইতেই দেখে একদল উন্মত্ত যুবক তাকে ঘিরে ফেলেছে! নিঃশব্দে মাথার উপরে ঝলসে প্রকাণ্ড এক খাঁড়া। সফি আর্ত্ত চীৎকারে সরে যেতেই টর্চ্চের আলো প্রতিফলিত হ'ল তার মুখে। —সফি! তুই এখানে? বলতে বলতে সমর এগিয়ে এলো দ্রুতবেগে। হাতে তার শানিত রক্তমাখা অস্ত্র। বিব্রত কণ্ঠে সমর বলে—এখানে কি করতে এসেছিস? শীগ্‌গীর চ'লে যা। চ'লে যায় এখান থেকে। খুব কিন্তু বেঁচে গেছিস।

—সমর দা! ভীত-বিহ্বল কণ্ঠস্বর সফির।

সমর দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় সফিকে। বলে—শীগগীর আয়

আমার সঙ্গে। নইলে খুন অনিবার্য্য কাউকে রুখতে পারবো না। আয়। চ'লে আয়।

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সমরকে অনুসরণ করে সফি। দয়া! অনুগ্রহ! প্রাণভিক্ষা! না, না, না। এমন হীনভাবে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়ায় পৌরুষ নেই। সহসা সমরের হাত আঁকড়ে ধরে সফি। বলে—তুমি—তুমি আমায় খুন করতে পার না, সমরদা?

সমর সহজকণ্ঠে উত্তর দেয়—হ্যাঁ, তাও-আজ পারি।

জানি, সব তুমি পারো। নইলে চতুর্দ্দিকে আজ এমন কান্নার রোল উঠবে কেন? এত অবিশ্বাস্য পরিবর্ত্তন তোমাদের? একথা ভাবতেও বিস্ময় বোধ হয়।

সমর কোন উত্তর দেয় না। নীরবে পথ চলে শুধু। তারপর এক নিরাপদ এলাকার সীমন্তে পেঁাছে দিয়ে বলে—এবারে চ'লে যা। ওদিকে তোদের মুসলমান পাড়া রয়েছে। আর কক্ষনো এদিকে আসিস না; বুঝলি?

পথচলতে চলতে সফি বলে—হ্যাঁ। আর কোনদিন আসবো না। তুমিও আজ এমনিভাবে বদলে গেছ, সমর দা। শুধু তুমি বদলাওনি তোমাদের সারাটা জাতই বদলে গেছে! সর্ব্বস্ব বিলিয়ে যে আরতী আমাকে পেতে চেয়েছিল—সে-ও আজ বদলে গেছে। তোমাদের কোমলপ্রাণা নারীরা পর্য্যন্ত সংহার মুর্ত্তি খুনীতে পরিনত হয়েছে। তোমাদের আর আমাদের মাঝে আজ অনেক পার্থক্য। কিন্তু এ পার্থক্য সৃষ্টি তোমরাই করলে। তোমরাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিলে অখণ্ড ভারতে মুসলমানদের সত্যিকার স্থান কোথায়। ভালই করলে। একটা নতুন রাষ্ট্র গ'ড়ে তুলবার একান্ত প্রয়োজন করে অনুভব করবার সুযোগ দিলে।

একটা অন্ধকার গলির মাঝে পাঞ্জাবী পুলিশের গাড়ী। রক্তাক্ত অবস্থায় অর্দ্ধচেতন এক যুবতীকে উদ্ধার করেছে তারা। বিবস্ত্র প্রায়

তরুণী। তার কানের এক পাশে ক্ষত। তা থেকে রক্ত ঝরছে প্রচুর পরিমানে। পরণে ছিন্নভিন্ন মলিন একখানা শাদা শাড়ী। তাজা রক্তে রঞ্জিত শাড়ীখানা।

পুলিশ অফিসার প্রশ্ন করলেন – তোমার ঘর কোথায়? কি ক'রে এখানে এলে? কারা তোমার এ অবস্থা করেছে? বল।

মেয়েটি অঝোর ঝরণে কাঁদতে থাকে। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—আমি—না, না, না। আমি সে-সব কিছুই বলতে পারব না। আপনারা আমায় গুলি ক'রে মারুন। আমি মরতে চাই—আমার মৃত্যু হোক? ওঃ খোদা। তুমি আমার মৃত্যু দাও।

পুলিশ অফিসার আশ্বাস দিয়ে বলেন—আমরা পুলিশের লোক কি হয়েছে বল? ভয় কি তোমার!

মেয়েটি বহুকষ্টে বলে—হ্যাঁ, সত্যি কোন ভয় নেই আজ আর কোন ভয় নেই। আমি বলবো, সবই বলবো! ওরা—পাষণ্ডরা, ওই পশুরা—না' না। আমি কিছুই বলতে পারবো না। আমায়—আমায় ক্ষমা করুন। মেয়েটি ডুকরে কেঁদে ওঠে।

সফি আরও কাছে এগিয়ে যায়। পুলিশ অফিসার ডাইরিতে নোট লিখে প্রশ্ন করেন–তোমার নাম?

—আয়েশা।

আয়েশার নামোচ্চারণে সফি চমকে ওঠে। মেয়েটিকে গভীরভাবে লক্ষ্য ক'রে কাছে গিয়ে বলে—তুমি আমিনের বোন?

–কে? কে তুমি? সফি ভাই! আমি, আমি তোমায় চিনেছি, এক মুহূর্ত্তে চিনেছি। কিন্তু–কিন্তু–এত রক্ত–

আয়েশা আর বলতে পারে না। সংজ্ঞাহীন হয়ে একেবারে ঢ'লে পড়ে সে গাড়ীর ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ গতিতে অকথিত বাণী নিয়ে ছুটে যায় পুলিশের গাড়ী।

সফি ওদের অনুরোধ করবার অবসরও পায় না। আয়েশাকে এত

কাছে পেয়েও কিছুই তার জানা হ'ল না। সব যেন স্বপ্ন।

আয়েশা! এমনিভাবে আয়েশার ওপর ওরা অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে? জঘন্য! অতি জঘন্য এ দুনিয়া! কিন্তু আবার কোথায় আয়েশার দেখা পাওয়া যাবে? হাসপাতালে? হ্যাঁ, তাকে কালই হাসপাল থেকে খুঁজে বের করতে হবে। জঘন্য। অতি জঘন্য! মানুষ সব পারে। ভালবাসতেও পারে আবার হত্যা ও করতে পারে। নরপশুর দল! এতটুকু দ্বিধাও করেনা ওরা খুন করতে। বেঈমানের দল—মোনাফেকের দল। চরম বিশ্বাসঘাতকের দল! না, না, না। ওদের দোষ কি! দোষ আমাদের। আমরা জাগিনি তাইত মেরেছে এতকাল। আর পারবে না। আমাদের বলিষ্ট জাগরণে চিরদিনের মত ওরা ভয়ে স'রে যাবে। জাতীয় জীবনের এই মনোবল এই একতা—কঠোর সংকল্প—অমলিন ঈমান ও সত্যের সাধনা সারা পৃথিবীর বুকে এক নতুন জাতির ইতিহাস সৃষ্টি করবে। হে মহান গণনেতা—তুমি যা দশ বছর আগে কল্পনা করেছিলে এতদিনে তার বাস্তববোধ জাগলো। তোমার মনীষা যে আমাদের চেয়ে শত শত গুণ বেশী। তাই অকুণ্ঠচিত্তে শ্রদ্ধাভরে তোমার নেতৃত্বতলে নিজেকে আমি কোরবান করবো। তুমি আমার ছালাম গ্রহণ কর।

মানুষ জঘন্য। সত্য ও সনাতনধর্ম্মী ভারতবর্ষে মানুষ মানুষকে এমন নিষ্ঠুরভাবে খুন করতে পারে তা স্বপ্নেরও অতীত ছিল। হায়রে মানবতা! বিবদমান জঘন্যতম মানুষদের নৃশংসতা দেখে মানবতা ডুকরে কাঁদে। এই কি মানুষের সত্যিকার রূপ?

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রতিযোগিতার মহরৎ শেষ হয়েছে। এবার লাভ ক্ষতির অঙ্ক কষছে ক্লান্ত দুটো জাতি। কলকাতার আবহাওয়া এখন শান্ত। সাধারণ নাগরীক জীবনেও স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে ফিরে। কিন্তু সফি গেছে একবারে বদলে। বহু অনুসন্ধানেও আয়েশার সন্ধান সে পায়নি। জীবনের সুপ্তস্মৃতি ক্ষনিকের বাস্তব স্পর্শ দিয়ে তাকে নতুন ভাবে ব্যথির ক'রে রেখে গেছে। এ ব্যথার মাঝখানে মিনতি ছিল সর্ব্বদা সজাগ। সে যেন সমস্ত উদ্দাম নিয়ে, সেবা শুশ্রূষা দিয়ে আপন ক'রে নিতে চায় সফিকে।

মানিকতলার গোরস্থানের আকাশে সেদিন সন্ধা সমাগত। সফি রাস্তার একপাশে দাড়িয়ে শান্ত, সমাহিত জীবনদলের লীলাক্ষেত্র নয়ন ভ'রে দেখছে। আকস্মাৎ কার যেন পরিচিত কণ্ঠ সে শুনতে পেল। দণ্ডায়মান গাড়ীর একপাশে দাঁড়িয়ে কে ও বৃদ্ধা রমণী? সুদূর অতীতে মনে হয় বৃদ্ধা এ রমণী কোন একদিন সফিকে স্নেহ করতেন। তাকে পরখ ক'রে দেখে সফি ভাবে—আয়েশার মা নয়ত? হ্যাঁ, সত্যি তিনিই ত।

সফি কাছে গিয়ে বলে—মা, আপনি এখানে?

বৃদ্ধা আর এক বৃদ্ধার সঙ্গে বাক্যালাপে ব্যস্ত ছিলেন। বিয়োগ-ব্যাথা সংক্রান্ত বাক্যালাপ। সফির মুখে মা ডাক শুনে বিস্ময়-বিমূঢ়

চোখে তিনি চেয়ে রইলেন। কিন্তু স্মৃতিতলে গতদিনের কোন কিছুই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো না। তাই তিনি জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কে তুমি বাবা?

—আমায় চিনতে পারলেন না? আমি সফি।

—সফি! তুমি এখানে কোথায়?

অতি সংক্ষেপে সফি তার গত ছয় বছরের ইতিহাস বর্ণনা ক'রে বললে—রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের এক বাসায় এখন থাকি। ভাল একটা চাকরীও জুটেছে।

—বেশ। শুনে সুখী হলাম বাবা।

হামিদাবানুর মনের প্রাঙ্গনে সহসা আঁধার নেমে এলো। এক মুহূর্ত্তে তিনি গত বছরের বিপুল ক্ষয় ক্ষতির ইতিহাস মানস চোখে দেখে নিলেন। এই সফি-যাকে গৃহপ্রান্ত থেকে একদিন হামিদাবানু ঘৃণাভরে, রূঢ় অপমানে বিতাড়িত করেছিলেন। আজ তার উন্নতির ইতিহাস শুনে তিনি লজ্জাবনত হয়ে উঠলেন। বিতাড়িত সফি মানুষ হয়েছে—স্বাস্থ্য, সম্পদ সব কিছু তার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু তিনি নিজে আজ নিঃসম্বল—অসহায়। স্বামীর অকালমৃত্যু—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন—এবং পরিশেষে একমাত্র পুত্রের নিষ্ঠুর হত্যা তাকে নরাধম ভিখেরিণীতে পরিণত করেছে।

সফি কিছুক্ষণ মৌন থেকে প্রশ্ন করে—আমীন কোথায় মা? কি করে সে এখন?

সন্ধ্যা সূর্য্য ডুবে গেছে। পশ্চিম আকাশে মুখর দীপ্ত দিবসের মৃত্যু-যবনিকা। নৈশ অন্ধকারের বিপুল হাতছানি।

আমীনের নামোচ্চারণে মা ভেঙ্গে পড়লেন। যে অশ্রু অন্তরের গহীনতলে ফল্গু ধারার সৃষ্টি করেছিল, তা এখন ধ্বংসমুখী কীর্ত্তিনাশায় পরিণত হ'ল। মায়ের জীবনী শক্তির সুবিশাল চত্বর আজ চৌচির হয়েফেটে গেল। একটা সজোর প্রলয় যেন বয়ে গেল তার

সমস্ত সত্তার ওপর দিয়ে। কিন্তু তবুও তিনি সংযত—নিরুত্তর। সকরুণ নিরবতার মাঝে অনেক উত্তর তিনি দিলেন। তারপর রুক্ষ-ধুসর চুলে বোঝাই মাথাটা নাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু রোধ করতে পারলেন না অশ্রুর উত্তপ্ত তরল ধারা। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে নিজেকে আয়ত্তে এনে দীর্ঘশ্বাসে ডাকলেন—আয়েশা, এদিকে আয় মা। ওখানে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? এ যে তোর সফি ভাই। চিনতে পারিসনি বুঝি?

আয়েশা! আয়েশার কথা সফি এতক্ষণে ইচ্ছা করেই উত্থাপন করেনি। দাঙ্গা-দূর্গত আয়েশা বেঁচে আছে কিনা কিংবা থাকলেও তার কি দুর্দ্দিশা হয়েছে—মায়ের বুকে আয়েশার বিচ্ছেদ অথবা নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি কতখানি ব্যাথার কারণ হয়ে আছে' তা সফি জানে না। সুতরাং অনিশ্চিত অমঙ্গল যতক্ষণ নিশ্চিত মঙ্গলে রূপান্তরিত না হয়, ততক্ষণ ও প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল।

মা ডাকেন—আয়। এদিকে আয় মা। লজ্জা কিসের?

ঘোড়াগাড়ীর আড়ালে আয়েশা অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। দীর্ঘ ছয় বছর আগের একটা দিনকে স্মরণ করে আয়েশা যেমন পূর্ব্ব-রাগের কথা ভাবলো, তেমনি তার লাঞ্ছিতা জীবনের কলঙ্ক প্রত্যক্ষদর্শী সফির কাছে মহাব্যাধিগ্রস্ত রোগীর দুঃখময় লজ্জায় তাকে সঙ্কুচিত ক'রে তুললো। কি ক'রে আয়েশা তার মুখ দেখাবে! মৃত্যু তাকে এতদিন যবনিকার গহীন গহ্বরে গ্রাস করেনি কেন! কিন্তু তাই বা কেন? জীবনের নিষ্ঠুরতম ক্ষতির জন্ম আয়েশা একটুকু দোষী নয়। তার জীবন মনের সমৃদ্ধিতে যে কালো দাগ পড়েছে তা ভয়াবহ এবং অপ্রতিরোধ্য অত্যাচারের মাঝেই সংঘটিত। তার জন্ম যদি কেউ তাকে ঘৃণা করে তবে তারই বিবেকহীনতার পরিচয় হবে।

মা আবার ডাকলেন—কই, দাঁড়িয়ে রইলি যে।

দ্বিধাজড়িত পদে আয়েশা পাশে এসে দাঁড়ায়। ম্লান নিরাভরণা

অধোমুখী আয়েশা—ছিন্ন মলিন বস্ত্রে পরিবৃতা যৌবনময়ী আয়েশা। অযত্নবিন্যস্ত কেশদাম তার সোনালী মুখের দু'পাশ বেয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ বাবুয়ের বাসা যেন। তারই মাঝখানে আনত আঁখি—দীপ্তিম্লান সকরুণ মুখখানা। সেই আয়েশা—সেই লাবণ্যময়ী তরুণী আয়েশা আজ শ্রীহীন, চাঞ্চল্যহীন শিথিল। তার সে উদ্দাম নেই, প্রাই-প্রবাহে আনন্দেরছন্দ-সুর নেই, আছে শুধু নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকার, ব্যথা-বেদনার গম্ভীর ছাপ। কেন তার এত দীনহীন বেশ? নগ্নপদে, ছিন্নবসনে কেন আজ রাজার দুলালী? এই কি সেই ছয় বছর আগের কুঁড়ির বুকে লুকিয়ে থাকা অনাঘ্রাতা আয়েশা?

সফি এতসব চিন্তা করে অন্তর্বেদনায় ভারী হয়ে ওঠে। হামিদাবানু দীর্ঘশ্বাসে বলেন—আজও ওর বিয়ে দিয়ে উঠতে পারিনি বাবা। চার বছর হ'ল ওর বাবা জান্নাতবাসী হয়েছে।—তারপর—

মা থেমে যান। নিজেকে সংবরণ ক'রে আবার বলেন—ওইত ওখানে আমাদের বাসা? চল, সবকিছু শুনবে।

সফি নীরবে ওদের অনুসরণ করে।

বাসায় ফিরে এসে হামিদাবানু সফিকে আসন এগিয়ে দিয়ে বলেন—লুটতরাজ হয়ে কিছু আর নেই বাবা। সব শেষ হয়ে গেছে। শুধু আমি যে কেন বেঁচে আছি ভেবে পাইনে। তার ওপর অতবড় আইবুড়ো মেয়ে আমার ঘরে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে মা আবার বলেন—উনি মারা যাবার পর একমাত্র ভরসা ছিল আমীন। সে-ও কবরখানায় ঘুমিয়ে আছে। আমার বুকের মানিককে ওরা খুন করলো। নর-পিশাচেরা আমার শান্ত সুবোধ ছেলেটাকে নিষ্ঠুরভাবে জবাই করলো।

আমীন খুন হয়েছে?

শান্ত, আত্মভোলা কণ্ঠে সজল চোখে চেয়ে মা বলেন—হ্যাঁ বাবা, আমীনকে খুন করেছে। আমীনের মৃত্যু হয়েছে। ও আর ইহজগতে

নেই বাবা। কিন্তু ওর মৃত্যুর বিনিময়ে কোটি কোটি মুছলমান স্বাধীনতা ফিরে পাক—নিষ্ঠুর ঘাতকদের থাবা থেকে সরে গিয়ে শান্তি ও সুখের জন্য তারা নতুন আবাসভূমি গ'ড়ে তুলুক, এই আমি চাই। আমি আমীনের মা। পাক্ভূমি সৃষ্টির সংগ্রামকে মনেপ্রাণে সমর্থন করেছি আমিও। আমার অন্তরের কামনা আমীনের মাঝ দিয়ে সত্য ও সঠিক হয়ে ফুটে উঠুক। তাই ত তার রক্তে-রাঙা অসার দেহ যখন উঠানে এনে শুইয়ে দিল, তখন এক ফোটা অশ্রুও বের হয়নি আমার চোখ থেকে। ও শহীদ হয়েছে। ঘাতকদের হাত থেকে শত শত অসহায় নরনারীর জীবন রক্ষা করতে গিয়ে আমীন দিয়েছে নিজেরই জীবন। ও যে আমায় কত বড় কৃতি-সন্তানের মা ক'রে রেখে গেছে তা কেউ জানবেনা সফি, কেউ বুঝবে না।

সফি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে—এমনিভাবে আমীন জীবন দিয়েছে! এ আত্মদান ওর অক্ষয় হ'য়ে থাকবে।

মা ক্লান্ত কণ্ঠে বলেন—কিছুই অক্ষয় হ'য়ে থাকবে না সফি। আজকের এ কাহিনী কাল মিথ্যে হয়ে যাবে, একেবারে স্বপ্ন ব'লে মনে হবে। স্বাধীনতা লাভের পর যারা নতুন রাষ্ট্রের কর্ণধার হবেন তারা আমার এ ক্ষতির কথা ভুলেও ভাববে না কোনদিন। তারা তাদের সংসারে সাজাবে। ভোগ বিলাস আর আত্মসুখের মাঝে খুঁজবে আপন আপন স্বার্থ। ভুলেও তারা জানতে চাইবে না তাদের সৌভাগ্যের জন্য কোন্ মা কোন্ বধূ, কোন্ পিতা সর্ব্বসুখ বিসর্জ্জন দিয়ে কতখানি ব্যথা জমিয়ে রেখে গেছে—কত দীর্ঘশ্বাস, কত হাহাকার, কত বিচ্ছেদ ব্যথা, কত ত্যাগ জমা হয়ে গ'ড়ে উঠেছে তাদের উচ্চাসন।

আয়েশা বাধা দেয়—তুমি থামো মা। তোমার এ প্রলাপ কেউ কোনদিন শুনবে না।

—শুনবে না সে আমিও জানি। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃতদেহের

ওপর প্রবাল দ্বীপের মত সৃষ্টি হবে পাকভূমি। কিন্তু কাদের মৃতদেহ? ক'রা সংগ্রাম করে, আর ক'রা অন্তরালে ব'সে চিরকাল তার সুফল ভোগ করে? তবু খোদা! তুমি কি কোনদিন এই নির্য্যাতিত গরীব জনগণের জন্য ওই অর্থশালী ওপরের মানুষদের বিবেকে আঘাত ক'রে মানুষ ক'রে তুলবে না? ওরা ত বেশ আছে। বড় বড় বাড়ীতে সেপাই শাস্ত্রী খাড়া ক'রে হাওয়া গাড়ীতে চ'ড়ে বেশ বেঁচে আছে। মরছে যারা তারা ওদেরই চাকর—ওদেরই আহার্য্য যোগাড় করতে গিয়ে মরেছে গরীব মানুষগুলো। আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি অনাগত দিনের সেই ছবি। নতুত রাষ্ট্র গ'ড়বে—সেখানে গণনেতারা রাজা হবে—তাদের গদী বজায় রাখবার জন্য ভাড়াটে ফেউ সৃষ্টি হবে—হাসিতে মুখর হবে তাদের সংসার। সেদিন তারা ভুলে যাবে রে—আমাদের মত মানুষদের এতবড় ক্ষতির কথা তারা একেবারে ভুলে যাবে মা।

আয়েশা উত্তর দেয়—এসব ত চিরকালের সত্য মা। আমাদের মত মানুষদের ক্ষতির মাঝেই ত সুযোগ সন্ধানী নেতাদের লাভের অঙ্ক বাড়ে। তুমি দেখতে পাবে গৃহহারা, সর্বহারার দল কোনদিন সঠিক মর্য্যাদা পাবে না। কেউ তাদের দুঃখ বুঝবে না।

মা অশ্রু মুছে বলেন—না বুঝুক, আমিত বুঝেছি। আমার সত্যি জিত্ হয়েছে। আমার খোকা যে তিন শ' নরনারীর জীবন বাঁচিয়ে রেখে গেছে। ওদের প্রতিটি মানুষের জীবন-স্পন্দনে খোকা আমার অমর হয়ে থাকবে। খোকার আত্মদানের আদর্শ স্মৃতি নিয়ে শত সহস্র সন্তান জন্মাবে ওদের ঘরে। তারা বড় হবে—বড় হয়ে একদিন খোকার আত্মত্যাগের উপযুক্ত মুল্য দেবে। সেখানেই হবে আমার আসল জিত্। সেই ত আমার আমার গৌরব।

মা ও মেয়ে যান রান্নার আঙিনায়। তারপর খাবারের প্লেট হাতে আয়েশা এসে দাঁড়ায় সম্মুখে। সামান্য, সাধারণ খাবার।

এ খাবার সফির সামনে এগিয়ে দিতে কষ্ট হচ্ছিল আয়েশার। সে নিঃশব্দে প্লেটখানা সামনে রেখে নতমুখে দাঁড়াল। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণ শব্দ গেল সফির কানে।

আয়েশা নীরব, নতমুখী। কয়েক ফোঁটা অশ্রু তার গণ্ড বেয়ে টস্‌টস ক'রে গড়িয়ে পড়লো। অধরে ওষ্ঠ চেপে নিরুদ্ধ হৃদয়াবেগ রোধ করতে চেষ্ট করে। কিন্তু ব্যর্থ হয় তার সব চেষ্টা। আয়েশা ভেঙে পড়ে—শিকড়-কাটা নিস্তেজ লতার মত ঢ'লে পড়ে। তবু নিজেকে সম্বরণ করতে হয়। অতিথি, মহামান্য অতিথি যে তার জীবন সম্মুখে। তাই সিক্ত চোখে, বিজড়িত কণ্ঠে সে বলে—তুচ্ছ সামান্য খাবার। এগুলো সামনে আনতেও লজ্জা হচ্ছিল।

—কি যে বল! লজ্জা কিসের?

আয়েশা উত্তর দিতে পারেনা। মুখ নত করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার আনত মুখের প্রতি চেয়ে সফি শান্ত কণ্ঠে বলে—এত বয়সে তোমার বিয়ে হয়নি জেনে আশ্চর্য্য হয়েছি।

—আশ্চর্য্য হবার কি আছে? পচা, দুর্গন্ধ দেহ কি কারও—

অসমাপ্ত কথার মাঝে মা আসেন ঘরে। বিস্ময় প্রকাশে বলেন—সে কি! কিছুই খাওনি যে? সফির পাশে গিয়ে বসেন তিনি। আয়েশা অন্য ঘরে যায়। খাবার মুখে দিয়ে সফি বলে—তারপর মেয়ের বিয়ের কি করেছেন? এত বয়স!

মা দীর্ঘশ্বাসে বলেন—কে ওর বিয়ে দেবে বল? সারা জীবন ভাড়াটে বাসায় থেকে উনি চাকরী করে গেছেন। না করলেন বাড়ীঘর, না অন্য কিছু। আমীনকে ভরসা ক'রে বড় আশা নিয়ে কলকাতায় এসেছিলাম, সেও ছেড়ে গেলে। এখন ত অকুল সমুদ্রে। কিযে করি ভেবে পাইনে। তা'ছাড়া কোন ছেলের হাতে মেয়ে তুলে দেবার মত পয়সাই বা আমার কোথায়?

সফি নিরুত্তরে ব'সে থাকে। মা আবার বলেন—তুমি এখন কোথায় আছে বাবা? বে'থা করেছ নিশ্চয়ই?

—বিয়ে! সামান্ন টাকা উপায় ক'রে কেউ আবার বিয়ে করে নাকি?

—তা ঠিক বাবা। যে দিনকাল! পাঁচ পয়সায় জিনিসের এখন পাঁচ টাকা দাম। সস্তা শুধু হতভাগা মানুষগুলো। পেটের দায়ে কত কি যে করতে হচ্ছে ওদের।

এরপর সুখ দুঃখের অনেক আলোচনা হ'ল। অনেক পুরানো কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হল নতুনের প্রেক্ষিতে। রাত গভীর হয়েছে দেখে সফি বলে—তাহ'লে আজ আসি মা।

—এখুনি যাবে? তা বেশ। মাঝে মাঝে এস কিন্তু। তোমার দুঃখিনী মাকে ভুলে যেয়ো না বাবা।

সফি সম্মতি জানিয়ে প্রাঙ্গনে নেমে পরে। কিন্তু সদর দরজার কাছে তার সহজ গতি সহসা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

—শোন। ছোট্ট একটি ডাক।

দৃষ্টি ফেরাতেই চোখ পড়ে আয়েশার প্রতি। দরজার পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে সে। নবমীর আধখানা চাঁদ যে আলো ঢেলেছে তাই স্তিমিত আভায় আয়েশার ম্লান মুখখানা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। সে ইশারায় কাছে ডেকে বললে—শোনা।

পাশে গিয়ে সফি বলে—কি? এখানে দাঁড়িয়ে কেন।

—তোমাকে ছালাম জানাবার অবসর হয়নি—তাই।

—ছালাম!

—হ্যাঁ। আজ তোমাকে ছালাম জানাতেও আমার কতো ভয়! তুমি কি গ্রহণ করবে আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা? সেই আগের মত, সেই কিশোরী জীবনে যেমন—

আয়েশা থেমে যায়!

সফি বিস্ময়-বিমূঢ় কণ্ঠে বলে—কি যে সব পাগলের মত বল!

মুহূর্ত্তে আয়েশার দু'খানা কম্পিত হাত সফির পায়ে উষ্ণ পরশ জাগায়। আবেশে তার মাথায় হাত রাখে সফি। উন্মুক্ত আকাশ তলে চন্দ্রালোকিত গৃহ-প্রাঙ্গনে রূপকুমারীর একি প্রণতি মাধুর্য্য! যৌবনময়ী কোন নারী জানাচ্ছে সশ্রদ্ধ ছালাম। কেন এ ভীরু আত্মসমর্পন। বীরঙ্গনার অপরাধ কোথায়?

সফি দু'হাতে তুলে ধরে তাকে। বলে—ছিঃ! অমন ক'রে পায়ে হাত দিয়ে ছালাম জানাতে নেই।

শ্রাবনের ধারা নেমেছে আয়েশার আনত চোখে! তার কয়েক ফোঁটা রেখেছে সফির পায়ের ওপর। আয়েশার আবেগ অশ্রু। সফির পায়ের তন্বী সুন্দরীর উচ্ছ্বাস-মাখা তপ্ত অশ্রু। নতমুখে আয়েশা বলে—তোমার রাজকুমারী সেই আজ দুঃস্থ কাঙালিনী। একেবারে রুচির বাইরে।

সফি প্রতিবাদ করে—ছিঃ! ওকথা বলো না। তুমি আমার কাছে অনেক বড়। এবং আজও।

অশ্রু-উদ্বেল কণ্ঠে আয়েশা বলে-আজও?

—হ্যাঁ, আজও। অনেক ক্ষয়-ক্ষতি এবং দহনজ্বালার মাঝে সোনা যেমন খাঁটি হয়—তেমনি তুমিও খাঁটি আছ, তা আমি জানি। এমন করে নিয়তি-লাঞ্ছিত হয়ে পুড়েছ বলেই আজ তোমার এত রূপ! তুমি লাঞ্ছিত হয়েছ বিরাট এক সম্রাজ্য গ'ড়বার রণক্ষেত্রে। তোমার মত শত সহস্র মা বোনের আর স্ত্রী কন্যার নির্য্যাতনের মাঝে এক মহান ইজ্জত প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্বের দরবারে। তাই তোমাদের কথা কেউ কোনদিন ভুলতে পারবে না।

আয়েশা ডুকরে কেঁদে উঠে। সফির বাহু তলে আবেশে মাথা রেখে সে নিস্তেজ লতিকার ন্যায় ঢ'লে পড়ে। কি সাধ্য তার তাকে সরিয়ে দিয়ে বিচ্ছেদ হানে?

আয়েশার মাথায় হাত বুলিয়ে মৃদুকণ্ঠে সফি বলে—ঘরে যাও। মা দেখলে কি ভাববেন বলত ?

প্রতিবাদ করে আয়েশা—কিছুই ভাববেন না তিনি। সেদিনের দম্ভ তাঁর নেই আজ।

—কিন্তু একদিন ত ছিল।

—হ্যাঁ, সেদিন তাঁর ধন-সম্পদ ছিল, মিথ্যেবংশ-গৌরব ছিল আর ছিল অভিজাত্যের বড়াই! কিন্তু আজ কিছুই নেই।

—সত্যি, আজ তিনি নিঃশেষ হয়ে গেছেন। বার্দ্ধক্য এসেছে তাঁহার দেহমনে। এতবড় শোক! কিন্তু তোমার চারপাশে এত দৈন্য কেন আয়েশা? একগাছা চুড়িও তোমার হাতে নেই। কেন?

আয়েশা নতপল্লবে উত্তর দেয়—কি হবে ওসব প'রে?

—কি হবে প'রে! কোনদিন তুমি এমন নিরাভরণা ছিলেনা আয়েশা। এমন কাঙালিনী—এমন দুঃখিনী রূপে কোনদিন তোমায় কল্পনাও করিনি। আজ তোমার একি দীনহীন বেশ।

আয়েশা নিজেকে সামলাতে পারেনা। আর্দ্রকণ্ঠে বলে—তোমার আয়েশা আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে। সে আজ করুণার পাত্রী।

—করুণা! এমন ক'রে কেন ভাব বলত? তোমাকে করুণা করার কোন প্রশ্নই আজ ওঠে না। তুমি আমার কাছে সে ই আগের মতই চির অম্লান, চির কাম্য!

সফির বলিষ্ঠ বুকের মাঝে আয়েশার নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসে। তার উদ্বেল-আবেগ এবারে সবেগ তুফান তুলে সফিকে প্রমত্ত দোলা দেয়। তার নিঃশব্দ ব্যাকুলতা এতক্ষণে সশব্দ ক্রন্দনে ফেটে পড়ে। সে-ক্রন্দন উচ্ছ্বাসে এক সময় মায়ের কানে গিয়ে প্রবেশ করে। তিনি নিঃশব্দে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ব্যাথাতুরা কন্যার আত্মসর্পণের করুণ দৃশ্য দেখেন। এমন দৃশ্য ও মাকে দেখতে হয়! আর এমন নীরবে! মায়ের চোখে আজ রোষবহ্নির লেশমাত্রও নেই। আছে শুধু করুণ

অশ্রুর ধারা ? নীরবে দাঁড়িয়ে মা আজ অভিনয় করলেন—প্রাণবন্ত অভিনয় মুক অভিনয়।

মা এবং কন্যার বিপরীতমুখী অভিনয় দৃশ্যকটু । কিন্তু তবুও এ দৃশ্য অবাস্তব নয়। সত্যিকার পবিত্রতা হৃদয়-বেদনার কষ্টিপাথরে যাচাই হয়। হৃদয়ের এ বেদন-ভরা রোদন তলে থাকে না সঙ্কোচ, ভয়, লজ্জা। এ মূহুর্তে স্ত্রী তার মৃত স্বামীকে উলঙ্গ আবেষ্টন করে শোক প্রকাশ করতে লজ্জাবোদ করেনা, রোগশয্যায় স্ত্রীর শিয়রে স্বামীর ব্যাকুলতা প্রকাশের মাঝেও থাকে না একটুকু সঙ্কোচবোধ। মরণোম্মুখ প্রসূতি কন্যার লজ্জার আড়ালে মা যেমন নিঃসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে দেন, তেমনি প্রয়োজনের তাগিদে কন্যাকেও এগিয়ে যেতে হয় মায়ের সঙ্কটকালে। জীবনের অনুভূতির প্রয়োজনে কোন লজ্জা নেই। এ অনুভূতি চির নগ্ন অথচ চির সুন্দর ও পবিত্র।

মায়ের অবস্থান লক্ষ করে আয়েশা ধীরে ধীরে পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। তার অশ্রুসিক্ত মুক অবস্থান মা শান্ত চোখে লক্ষ্য করেন। আয়েশা যা আজ বলতে চায় মায়ের তা বুঝতে বাকী নেই। জগতের প্রেমের হাটে চিরন্তনী চাওয়া পাওয়ার নিখুঁত অভিব্যক্তি। আয়েশা ভুল করেনি—অন্যায়ও করেনি সে। কন্যার বিগত বিশ বছরের অতীত জীবনকে মা এক নিমেষে মানস চোখে দেখে নিলেন। পরিপূর্ণ যৌবনময়ী আয়েশা। সারা দেহে তার উদ্দাম বসন্ত জোয়ার। আগুনের ফুলকি বিস্তার ক'রে যৌবন আসে নারীর জীবনে। সে তখন কাল-বোশেখীর মত তাণ্ডবময়ী। প্রচণ্ড শিহর আলোড়ন তার সারা দেহে। সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা তার শিরা-উপশিরায় —পর্বতে গুহায়! এ বয়সে নারী দুরন্ত প্রভঞ্জনের ন্যায় গর্জ্জনময়ী —খরস্রোতা পাহাড়ী নদ-নদীর ন্যায় কল্লোলময়ী—বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় ফেনিল উচ্ছ্বাসী। তার জীবনে তখন অনন্ত আশা, অপার আকাঙ্ক্ষা—সীমাহীন ব্যাপ্তি। অনাস্বাদিত জৈব সুখের

তাড়নায় উন্মত্ত নারীদেহ। সে-উন্মাদনায় নারী হয় ক্ষিপ্ত—আত্ম সমর্পনের মাঝে সে উপভোগ করতে চায় চরম পুলক অনুভুতি। সে-সমারোহ তলে সমস্ত বিশ্ব চরাচর অস্পষ্ট হয়ে আসে—জীবনের চারপাশে রাজত্ব করে শুধু কামনার কুহেলী। চতুষ্পার্শ্বের দুঃখ শোকে ভরা পৃথিবীকেও মনে হয় অপরূপ সুন্দর! জীব জগতে সেই ত যৌবনের আসল আনন্দ—পাগল রূপ। সে উচ্ছৃঙ্খল, অজস্র যৌবনের মহারূপ দর্শনে যিনি বিরূপ, তার স্বরূপ অস্পষ্ট নয়। সে জীবনবোধের মর্য্যাদা দিতে জানে না। লোকচক্ষুর অন্তরালে সে নিশ্চয় নিবৃত্ত করে তার পশু-প্রবৃত্তিকে। বাইরের মানুষ তাকে যা জানে, আসলে ভেতরে সে তা নয়।

মা সব কিছু জানেন। আয়েশা যে মর্ম্মব্যথার দাহ নিয়ে মায়ের পাসে এসে দাঁড়িয়েছে তা ভাল করেই মা জানেন। নারী জীবনের কত স্তর পার হয়ে আজ তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। পশ্চাতের ঐশ্বর্য্যময় দিনগুলো—রঙভরা পূর্ণ যৌবন—জৈব সুখের আকুল আহবান—ক্ষণে ক্ষণে নিপীড়িত হবার তাড়না—অবশেষে লুকোচুরির মাঝে ধৃতা হরিণীর ন্যায় আত্ম সমর্পণ তলে পুলক অনুভূতি—সব, সব কিছু মায়ের মনে পড়ে। প্রেমের প্রমত্ত খেলায় সেকি অপূর্ব্ব অনুভূতি—কি মোহন আবেশ—অশ্বশক্তির প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙ্গে খান্‌খান হবার কি বিপুল বিক্রম! সব মনে পড়ে মায়ের। সেই যৌবনের চরম অতৃপ্ত কামনার মূর্ত্ত প্রকাশ তার আয়েশা। নিজের অতীত আজ আয়েশার মাঝে বর্ত্তমানে রূপ পরিগ্রহ করেছে। আয়েশাকে প্রতিরোধ ক'রে না কেন বয়ঃধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করবেন?

শান্ত আবেগে কন্যাকে কাছে টেনে মা মাথায় পরশ বুলালেন। নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, নিথর মা। শুধু মুক অভিনয়। তারপর এক সময় মা ও কন্যার নিরুদ্ধ হৃদয় আবেগ সজোর দীর্ঘশ্বাস হয়ে বের হ'ল। একটুখানি বেদনভরা নিঃশ্বাস বই ত নয়!

(২১)

মিনতিকে গত কয়েকদিন ধ'রে চুনী সহ্য করতে পারছে না। আয়েশার আবির্ভাব তার জীবনে নতুন এক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আয়েশা ধ্রুব নক্ষত্রের সমুজ্জ্বল আভা নিয়ে আবির্ভূতা। কৈশোরের মধু-মিলন উভয়ের মাঝে যে প্রেমের বীজ বপন করেছিল আজ তা বর্ষার ধারা সিঞ্চনের মাঝে অঙ্কুর লাভ করেছে। যৌবনে আয়েশার যে অপূর্ব্ব রূপ সৌন্দর্য্য সফিকে মোহমুগ্ধ করেছিল তা আজ সজীব হয়ে তার-জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়। কি সাধ্য সফির সে স্বাভাবিক গতিকে রোধ করে?

কয়েকদিন আগে সফি যে কণ্ঠহার মিনতিকে উপহার দিয়েছিল আজ তা ঘৃণাভরে ফিরিয়ে দিল মিনতি। সে গ্রহণ করলো না সফির দান। অভিমানী অভাগিনী মিনতি!

হতমানে মিনতির কক্ষ ত্যাগ করে চলে যায় সফি। বিক্ষুব্ধ মনে সন্ধ্যার অববাহিকায় আয়েশার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয় সে। মাথায় আঁচল টেনে আয়েশা সশ্রদ্ধা ছালাম জানায় সফির পায়ে।

সফি বাধা দিয়ে ব'লে—ছিঃ! অমন ক'রে পায়ে হাত দিতে নেই তা'ছাড়া কি এত সম্বন্ধ বলত?

আয়েশা প্রতিবাদ করে—নাইবা থাকলো লোক-দেখানো সম্বন্ধ। আমি জানি, খোদা আমাদের সব সম্বন্ধ ঠিক করে রেখেছেন।

সফি মৃদু কটাক্ষ করে—খোদার ওপর দেখছি অটল বিশ্বাস।

—হ্যাঁ, সে বিশ্বাস কোনদিন হারাইনি। আর হারাইনি বলেইত তোমাকে ফিরেও পেয়েছি। সামান্য একটা ভুলের জন্য অনেক দুঃখকষ্ট সয়েছি। আর কেন? কতদিন যে খোদার কাছে তোমাকে

চেয়েছি—কত যে চোখের পানি ফেলেছি তা খোদাই জানেন। কিন্তু একটা দিনও কি তুমি আমার কথা ভেবেছ ?

—কেমন করে ভাববো বল ?

—তা ভাববে কেন ? পুরুষ মানুষগুলো নিষ্ঠুর তাই অমন ক'রে ভুলে থাকতে পারে।

—সত্যি, বড় নিষ্ঠুর। নইলে মুক্তি দিয়ে আবার এমন কঠিন বাঁধনে বাঁধতে পারে কারা ?

সফি শান্ত আবেশে আয়েশার দু'খানা বাহু টেনে নেয়। তারপর দুটো সোনার বালা তার সুগোল হাতে দেয় পরিয়ে। হাত দু'খানা ঐশ্বর্য ভ'রে ওঠে। কাঁপতে থাকে সে! পুলক আনন্দের কাঁপন তার দেহে।

—তুমি আমায় এমনভাবে গ্রহণ করতে পারো ?

—কেন পারব না ? জীবনের প্রথম সম্পদ তুমি। তোমার মাঝে কত যে ভালবাসা ঢেলে রেখেছি তা খোদাই জানেন। আজ থেকে তুমি আমার জীবন সঙ্গিনী। তোমাকে কেন্দ্র করে গ'ড়ে তুলবো সুখের স্বর্গ—আমার অনাগত ভবিষ্যত।

আয়েশা ভাষা হারিয়ে ফেলে। মুখ তুলে তাকাতেও পারেনা সে। এতবড় সৌভাগ্য তার শিয়রে! এ কী অনির্ব্বচনীয় সুখ! কী অবর্ণনীয় মধুর পুলক অনুভূতি! তৃপ্তি-সুখের প্রমত্ত উচ্ছ্বাস তার বুকের দোলায়—দহের রোমাঞ্চ-ক্ষরণে—বাকহীন ওষ্টপুটের কম্পন কৃতজ্ঞতায়—আনত চোখের পল্লব মায়ায়।

মা আড়াল দাঁড়িয়ে সব দেখেন। আয়েশার বিপুল সাফল্যে তৃপ্তিসুখ অনুভব করেন। তারপর এক সময় সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বলেন—কখন এলে বাবা।

সফি ব্যস্ত হয়ে ওঠে—এইত এখনি মা।

—বেশ। তা, আমি বলি কি, তুমি এ বাড়ীতেই চ'লে এস।

কোথায়, কার হাতে, কি যে খাও ! তা'ছাড়া তোমার বুড়ো মাকে দেখতে হয় না বুঝি ?

সফি উত্তর দেয় রোজই ত আসছি মা। সময়ে অসময়ে কত বিরক্ত ক'রে যাচ্ছি !

আয়েশা চটুল হাসি হেসে বাধা দেয়—বিরক্তি না ছাই ! তুমি এ বাড়িতে চলে এস।

মা প্রতিধ্বনি করেন—সেই ভাল বাবা। আয়েশা, তুমি ওর যত্ন নাও মা। আমি এবারে রান্নার যোগাড় দেখি।

সফি কিছু বলার আগেই মা কক্ষান্তরে গমন করেন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে যায়। তারপর উভয়ের মাঝে হয় দৃষ্টির বিনিময়। ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই সফি ব্যস্ততা প্রকাশে বলে—রাত অনেক হ'তে চলল। এবার ঘরে ফিরতে হবে।

—তা'হবে বইকি। ঘরে কে আছে তোমার ?

—কেন,। বউ রয়েছে।

আয়েশা অদ্ভুত মুখভঙ্গী ক'রে বলে—ধেৎ ! অমন ক'রে বলতে নেই। পাপ হয়।

—পাপ ? কিসে পাপ হয় কিছুই বুঝিনে আয়েশা ;

আয়েশা মৃদু হেসে পাখার বাতাস দিতে থাকে।

সফি প্রশ্ন করে—হাসছ কেন ?

—এমনি !

সফি কাছে গিয়ে শান্ত আবেশে আয়েশার মুখখানা তুলে ধরে। কানের পাশে দাঙ্গা জনিত এক ক্ষতচিহ্ন লক্ষ্য করে বলে দু'ভাইবোনে বস্তীর লোকগুলোকে বাঁচাতে গিয়েছিলে। একজন মানবতার জন্য প্রাণ দিয়েছে, আর তুমি দিয়েছ তোমার সব। তাই ত তোমাকে আমি ভুলতে পারিনে। নিজেদের জীবন বিপন্ন ক'রে যারা মানুষের সেবা করে তাদের আমি অন্তর দিয়ে ভালবাসি। সেই

ভালবাসার জীবন্ত প্রমাণ আজ এঁকে দেবো তোমার মুখে।

শান্ত আবেশে কাছে টেনে প্রগাঢ় চুম্বন দিয়ে আয়েশার মুখের প্রতি একদৃষ্টি চেয়ে থাকে সফি।

লজ্জা-রাঙা আনতমুখী আয়েশা। দ্বাদশীর চাঁদ আকাশে আলো ঢেলেছে। জানালা পথে তার মিঠে পরশ আয়েশার রাঙা মুখকে রাঙা করেছে আরও বেশী করে। সে আর নিজেকে ধ'রে রাখতে পারে না। বিলিয়ে দেবার মাঝে শরমের একি গ্লানি!

লজ্জা-বিজড়িত কণ্ঠে আয়েশা বলে—এ'কি করলে তুমি?

—কিছুই করিনি। যা প্রাপ্য তাই শুধু দিয়েছি। বাকি থাকলো আরও অনেক সাধ! কিন্তু সেসব আজ নয়। অনাগত দিনগুলো সম্পদের ইঙ্গিত দিচ্ছে। সেদিন হবে বাকী পূরণ! কেমন তাইত?

গভীর রাতে চুণী অর্থাৎ সফি তার বাসায় ফিরে এল। মিনতি এতক্ষনেও ঘুমায়নি। অধীর প্রতীক্ষায় সে সারাটা দিন কাটিয়েছে —রাতেরও অর্দ্ধেক।

মিনতি আজ নতুন সাজে সজ্জিতা! অপরূপ তার বসন ভূষণ। পরণে কারুকার্যখচিত বহুমুল্যবান শাড়ী—গায়ে নয়ন-ঝলসানো রেশমী ব্লাউজ—কণ্ঠে চুণী-প্রদত্ত স্বর্ণহার। তার ওপর অতিরিক্ত দু'ছড়া বকুলের মালা।

চুণী প্রত্যার্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মিনতি কাছে ছুটে যায়। সহাস্য-মুখী চঞ্চলা মিনতি মিলনের নেশায় আজ প্রস্তুত সে। কামনা-ক্ষিপ্ত মাতাল মিনতি। সফির বাহুপাশে হাত রেখে সে মধুর কণ্ঠে বলে-কোথায় ছিলে এতরাত? খাবারগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে?

চুণী কেমন যেন অপরাধীর কণ্ঠে বলে—তুমি খেয়ে এস। আমার খিধে নেই মোটেও।

মিনতি বিস্ময় প্রকাশ করে—সেকি ! অসুখ করেনি ত ?

—অসুখ আমার হয় না।

—তা সত্যি। তোমার কি অসুখ হয় ! অতিমানুষ তুমি। কিন্তু দেহের না হ'লেও মনে তোমার অসুখ লেগেই আছে।

চুণী নিরুত্তরে ও পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। তার চোখেমুখে চিন্তার মেঘভার। মিনতি বলে—তুমি রাগ করেছ নিশ্চই। ভুল ক'রে যদি ব্যথা দিয়ে থাকি তবে ক্ষমা কর।

স্বর্ণহার শোভিত মিনতির প্রতি সফির দৃষ্টি পড়ে।

সে অপাঙ্গে চেয়ে বলে—বেশ মানিয়েছে। সুন্দর দেখাচ্ছে।

মিনতি দীপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপে বলে—তা'হলে আজ আমায় একান্ত ভাবে গ্রহণ কর। প্রাণভ'রে দোওয়া কর আমায়।

আ-ভূমি প্রণতা হয়ে ঝুঁকে পড়ে মিনতি। কিন্তু সফি পিছিয়ে গিয়ে বলে—ছিঃ। মিনুদি ! একি পাগলামী করছ ?

মিনতি একেবারে ভেঙে পড়ে। কাতরকণ্ঠে বলে—না, না। এ পাগলামী নয়। তুমি অমন ক'রে স'রে যেয়ো না আমি আজ নিঃশেষ হব। তুকি বাধা দিওনা !

আয়েশার যৌবন তলে সফি আত্মবিক্রয় করেছে। সেই বিক্রীত সপে-দেওয়া মন কেমন ক'রে আর একজনকে ক্রয় করবে ? আয়েশা তার মনে প্রগাঢ় ভালবাসার প্রলেপ এঁকেছে। সেই মনের অঙ্গনে মিনতি অকুণ্ঠ আত্মদান ! প্রেমের দ্বিমুখী স্রোতাবর্ত্তে সফি নিজেকে বিপন্ন মনে করে।

করুণ মিনতি জানায় মিনতি—তোমার পায়ে ধরি। কথা কও। কি হয়েছে বল ? আবেগে সফির হাত আঁকড়ে ধরে সে।

সফি বলে—কিছুই হয়নি। তুমি আজ আমায় বিরক্ত ক'রোনা। ঘুমুতে দাও।

মর্ম্মাহত হয়ে ভেঙ্গে পড়ে মিনতি ! তার শেষ প্রচেষ্ঠা সফির নির্ম্মম আঘাতে ব্যর্থ হয়। ম্লানমুখে করুণকণ্ঠে মিনতি বলে—বিরক্ত ! না, আর তোমার বিরক্ত করবো না। তুমি ঘুমাও।

ভগ্ন-হৃদয়ে শান্ত পদে মিনতি বারান্দায় এসে দাঁড়ায় দ্বাদশীর যে চাঁদ সন্ধ্যা রাতে আয়েশাকে স্পষ্টতর করে সফির চোখে মোহিনী মুর্ত্তিতে তুলে ধরেছিল, সে চাঁদ মিনতির ম্লান মুখ দর্শনে নিষ্প্রভ হয়ে ডুবে গেল। মিনতির আশাদীপ্ত চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা ব্যথা অশ্রু নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়লো।

জীবনে পেয়ে হারানোই সুখ, না' হারিয়ে পাওয়াতেই আনন্দ তারই দ্বন্দ্ব জাগে মিনতির মনে।

(২২)

মিনতির ভবিষৎ চিন্তা ক'রে সফি অস্থির হয়ে ওঠে। সফিকে অন্ধের মত ভালবেসেছে সে—একেবারে পাগলিনী লায়লীর মত। অন্ধ ভালোবাসা কোন লাভক্ষতির হিসাব রাখেনা। মিনতির ভালবাসাও সে হিসাব রাখেনি। তার ভালবাসার অগ্রগতি দুর্ব্বার। কিন্তু আত্মসম্মানের নিম্নস্তরে সে ভালবাসা ম্লান নয়।

ওদিকে আয়েশার মাঝে একান্তভাবে ডুবে গেছে সফি। তার আর আয়েশার মাঝে কোন ব্যবধান নেই আজ। দ্বিমুখী স্রোত। মাঝখানে চিন্তা-ব্যাকুল সফি।

গভীর রজনী। কোলাহল মুখর নগরী নিস্তব্ধ। জনসমাগম বিরল।

দিগন্তে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ—নভোমণ্ডলে বিক্ষিপ্ত নক্ষত্ররাজি। নিতান্ত চোরের মত রাজপথ ধরে সফি ঘরে ফিরে এলো। মিনতি স্থানুর মত মৌন-নির্ব্বাক বসে আছে চেয়ারে। দুঃখের ব্যথাভারে নুঁয়ে পড়েছে তার মাথা। মনে হচ্ছে একটা সুন্দর আপেল যেন বৃন্তচ্যুত হয়ে খ'সে পড়েছে।

তার একান্ত কাছে এগিয়ে গিয়ে সফি বলে—একি ! এত রাতেও ঘুমাওনি তুমি ?

বিশাদ মলিন মিনতি। তার মনের অঙ্গনে অমোনিশার অন্ধকার। আখিতারা দীপ্তিহীন—জীবনের সতেজ শতদল তার শুষ্ক মলিন। বিস্বাদের বিবসতায় বিরস নারী। বিষাদ-ঘন আবেশে একখানা পত্র এগিয়ে দিয়ে মিনতি অনুচ্চ কণ্ঠে বলে—এখানা পড়।

--পত্র। কার ?

—আমার এক সহ পঠিনীর।

সফি বিনা বাক্যব্যয়ে পত্র পাঠ করে—

"প্রিয় মিনু।

অনেক দিন পরে তোর পত্র পেয়ে অতীত জীবনকে স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেলাম। তুই আমার ছাত্রী জীবনের সাথী। কতদিন তোর মুখ দেখিনি বলত ? তা কেমন আছিস ? তোরা মানিকতলায় কেনরে ? ও বুঝেছি। স্বামীর সংসারে বুঝি ? স্বামীটি তোর কেমন ? মনের মত হয়েছে ত ! হবে বইকি ! কোনকালেও তোর ত আর রূপগুণের কম্‌তি ছিল না

আমার স্বামীর কথা জানতে চেয়েছিস ? সেকি মানুষ আছে রে। এতবড় মাতাল, বেশ্যাসক্ত মনিুষকে স্বামী রূপে পাবো, তা. জীবনে কোনদিন ভাবিনি। বড় সুখ দেখে আব্বা আমায় জমিদারের ঘরে বিয়ে দিয়েদিলেন কোথায় গেল, সে জমিদারী আর তাদের প্রতাপ প্রতিপত্তি ? সব যেন কর্পূরের মত হাওয়ায় উড়ে গেল। জমিদার-

শ্রেণীর মানুষগুলো পরের পয়সায় ব'সে ব'সে খেত। ফলে মাতাল আর চরিত্রহীন হয়ে পড়ত তারা। কাজ কর্ম্ম ত আর ক'রে খেতে হ'তনা। শুধু ঐশ্বর্য্যের মোহে পড়ে কোন পিতা এদের হাতে যেন কন্যাদান না করেন।

যাক্ নিজের দুঃখ জানিয়ে তোদের দাম্পত্য জীবনের সুখকে ভারী করতে চাইনে। আমার আন্তরিক ভালবাসা গ্রহণ করিস। তোর স্বামীকে আমার আদাব জানাস। পাত্রলাপ করিস কিন্তু। সন্তান ক'টা তোদের? আমার তিনটে। আবার-বোধহয় শিগ্‌গীরই- পুরুষ-মানুষগুলো যেন কি! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেও সময় দেয় না। মাঝে মাঝে পত্র দিতে ভুলিসনা যেন। আচ্ছা আসি।

ইতি—তোর রাবেয়া
ভরতপুর।

পত্র পাঠান্তে সফি নীরবে ব'সে থাকে। মিনতি নির্ব্বিকার ভাবে বলে—রাবেয়া অমন ক'রে কেন লিখলো? ও আমার দাম্পত্য জীবনের সুখ কামনা করে। বড় সুখী আমি, না? স্বামী! হ্যাঁ, সত্যিকার স্বামীর ঘরই করছি আমি।

মিনতি সহসা ডুকরে কেঁদে ওঠে। এতক্ষণের অবরুদ্ধ হৃদয় বেদনা যেন মুক্ত দ্বারে প্রশস্তি খুঁজে পায়। তার নিরুদ্ধ আবেগ সবেগ তুফানে পরিণত হয়। প্রাণ ভ'রে কাঁদে সে। এমন কান্নাও মানুষ কাঁদে। এত অশ্রু মানুষের চোখে?

সফি ব্যাকুল-কণ্ঠে, সহানুভূতির সুরে প্রশ্ন করে—কি করলে তুমি সুখী হও মিনু?

—সুখ! আমার সুখের জন্য তোমার আর চিন্তা করতে হবে না। আমার দুর্ভাগ্যের জন্য আমিই দায়ী। আর কেউ নয়।

এ বাড়ীতে আজ আগুন পর্য্যন্ত জ্বলেনি। কামিনী রান্নার যোগাড়

করেছিল কিনা কে জানে। হয়ত করে রেখেছে সবকিছু। দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে বারোটা বাজলো। জীবনের কোন্ তারে ঘা দিয়ে সুরের ঝঙ্কার উঠালো কে জানে।

বিছানায় উপুর হয়ে কাঁদছে মিনতি। তার প্রশস্ত পিঠের উপর একরাশ বিক্ষিপ্ত কৃষ্ণঘন কেশ। বিলুণ্ঠিতা তন্বী সুন্দরী। বিগলিত অশ্রুতে ভিজে গেছে দেহের নানা স্থান। কোমরের উপরিভাগ উন্মুক্ত প্রায়। সেখানকার অঙ্গ-সৌষ্টব প্রকট হয়ে রয়েছে। কি সুন্দর সতেজ মিনতির দেহ! এত অপরূপ নারীদেহ! এমন সুঠাম সুন্দর গঠন—এত রূপ—আবেশ-মাখা এমন চোখ সফি কখন কোথায় দেখেছে? বিশ্ব সংসারে সমস্ত আলো নিভে যাক—জগত আঁধারে ডুবে মাক—তবু এ-অঙ্গ আপন জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, আলো ক'রে রাখবে তার ঘর-সংসার আর হৃদয় মন।

সফি হাত বাড়িয়ে দেয় মিনতি দেহের দিকে। তাকে তুলে ধরে দু'হাতে বেড় দিয়ে। তার নরম মাংসল দেহের সবখানি জুড়ে চক্রবেড় দেয় সফি। একান্ত মধুর সে পরশ! মিনতি বাধা দেয় না। অশ্রুসিক্তা অভিমানিনী মিনতি—নির্বিকার, অনাসক্ত অর্দ্ধমৃত মিনতি। তার সারা দেহ দু'হাতে নিপীড়ন ক'রে উলঙ্গ আবেষ্টন সৃষ্টি ক'রেও আজ মিনতির কামনা অনুভূতির কোন সাড়া পেলনা সফি।

মুক্তহস্ত দানের মাঝে যেমন সত্যিকার পাবার আনন্দ নেই তেমান নিষ্ক্রিয় দেহ লাভের মাঝে নেই প্রেমনুভূতির সার্থকতা। বনবিহঙ্গ বনেই সুন্দর। তাকে খাঁচায় আবদ্ধ করে দূরে দাঁড়িয়ে দেখতেও আনন্দ আছে। কিন্তু তাকে বধ করে একান্তভাবে পাওয়ার মাঝে নেই এতটুকু তৃপ্তির আনন্দ।

যাকে পাইনা তার জন্যই ত আগ্রহ-ব্যাকুলতা—তাকে পাবার জন্যই থাকে আকুলতা। যে সহজলভ্য, তার জন্য থাকেনা পাবার

কোন আগ্রহ উগ্রতা। অতৃপ্ত বাসনা আর কামনার তৃপ্তি সাধনের নামই জীবন। সম্পুর্ণ পরিতৃপ্ত অথবা নিষ্ক্রিয় ব্যর্থ জীবনই মৃত্যু। চলমান জীবনে থাকা চাই আকাঙ্খার পর আকাঙ্খা—আগ্রহের পর আগ্রহ—তৃপ্তির মধ্যে অতৃপ্তি। অপূরণের মাঝেই জীবনের গতিময়তা। না পাওয়ার ব্যর্থতার মাঝেই থাকে পাবার সক্রীয়তা, জাগ্রত প্রচেষ্টা। নিঃশেষ ক'রে কুড়িয়ে পাওয়ায় যেমন শেষ, গতিহীন জীবনের প্রণতিও তেমনি ইতি।

অশ্রুসিক্তা মিনতির মুখখানা তুলে ধরে সফি। আনত-নয়না, অভিমানি মিনতি। উল্লাস-মুখর চিত্ত-চাঞ্চল্যময়ী দীপ্ত মিনতি আজ ম্লান। সফি অভিভূত কণ্ঠে বলে—তুমি ত এমন কখনো ছিলে না মিনু? কত আঘাত তোমায় দিয়েছি কিন্তু কোনদিন তোমার হাসিমুখ ম্লান হ'তে দেখিনি।

মিনতি আঁচলে অশ্রু মুছে ধীরে ধীরে স'রে যায়। দরজায় দাঁড়িয়ে নির্ব্বিকার কণ্ঠে প্রশ্ন করে—আয়েশা তোমার কে?

—আয়েশা? বিস্ময়ভরা কণ্ঠে সফি প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ। বড় আশ্চর্য্য হ'লে যে! তার দু'হাতে সোনার বালা কে পরিয়েছে? কে তাদের সংসারের ব্যয়ভার বহন করে—দিনের পর দিন সেখানে গিয়ে পড়ে থাকে?

এতগুলো কথা বলে মিনতি সফির মুখের প্রতি কঠিন দৃষ্টিপাত করে। এ মহা সত্যের মুখে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে সফি! বজ্রাহতের ন্যায় নির্ব্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শুধু।

—কি, কথা বলনা যে?

—এসব তোমায় বললে কে?

বিব্রত সফিকে মিনতি লক্ষ্য করে। ম্লান মুখে বলে—জানতে আমার কিছুই বাকী নেই। কামিনীর মারফতে তোমার গতিবিধির বহু খবর আমাকে রাখতে হয়েছে। জীবনে কাউকে ভালবাসতে

পারিনি। একমাত্র তোমার প্রতি কেন যে দুর্ব্বলতা এসেছিল তাই ভেবে বিস্মিত হই। কিন্তু থাক সে কথা! পূর্ব্বজন্ম আমি মানিনে। তবে গত জীবনের কর্ম্মের ফল যে ভোগ করতে হয়, তা আমার কাছে আজ চরম সত্যে পরিণত হয়েছে। আমি ছিলাম উদ্দাম দাম্ভিক। আকাশস্পর্শী ছিল আমার বড় হবার আকাঙ্খা। কিন্তু বাস্তব জীবনে সব মিথ্যে হয়ে গেছে—আমি নিজেও আজ হাস্যাস্পদ। আমার অতীত আমাকে আজ বিদ্রূপ করে।

মিনতি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে ধীরে ধীরে উঠে যায়। তারপর টেবিলের ওপর থেকে কাগজের ঠোঙা ভর্ত্তি একগাদা খাবার এনে এগিয়ে দিয়ে বলে—আজ রান্না হয়নি। তাই তোমার জন্য এগুলো আনিয়ে রেখেছি। খেয়ে নাও। খানিকটা দুধও আছে। এই খেয়েই রাত কাটাতে হবে।

গভীর মর্ম্মবেদনার মাঝেও মিনতি তার কর্ত্তব্য ভোলেনি। এত দুঃখের মাঝেও তার সেবা অমলিন, অক্ষুণ্ণ। একথা ভাবতেও সফির চোখ অশ্রুতে ভ'রে ওঠে। সে প্রশ্ন করে—তুমি খেয়েছ?

না। আমার শরীর ভাল নয়। রাতে কিছু খাবো না।

সফি উঠে দাঁড়ায়।

মিনতি উদ্বেগ ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—আমার মাথার দিব্যি রইল এগুলো খেয়ে যাও।

ঘুরে দাঁড়ায় সফি—মাথার দিব্যি আমিও যদি দিই।

গভীর রাত পর্য্যন্ত সফির ঘুম হ'ল না। আকাশ-পাতাল অনেক চিন্তা করলো সে। এই ত হাসি কান্নার জগত। তবে আর কেন পরাজয়ের ব্যথা—না পাওয়ার ব্যাকুলতা?

অন্ধকার গৃহ। মিনতি ঘুমন্ত। উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে শেষ রাতের চাঁদ আলো ঢেলেছে। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে মিনতির ঘুমন্ত তনুশ্রী লক্ষ্য করে সফি। ঘুম! ঠিক এমনিভাবে ঘুমিয়ে থেকে মানুষ একদিন আর

জেগে উঠবে না। সেদিন চাওয়া-পাওয়ার সকল আকাঙ্খা নিঃশেষ হবে। ভোগ-বিলাসের সবকিছু পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাবে। ফিরেও সেদিন তাকিয়ে দেখবে না চিরঘুমন্ত জন।

সফি আরও ভাবে-মিনতি এমনি করে তাকে ভালবেসেছিল? যে হৃদয় অনাহারে থেকে তার আহার্য্য তুলে রাখে—রোগশয্যার পাশে যার সেবাহস্ত সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে, তাকে অবহেলা করার অর্থ ন্যায়ধর্ম্মকেই উপেক্ষা করা। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই ক'রে মিনতি তাকে সুস্থ ক'রে তুলেছে। কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল তার?

সফি শান্ত আবেশে মিনতির মাথায় হাত বুলিয়ে ডাকে—মিনু! ও মিনু। মিনতির ঘুম ভেঙ্গে যায়। কিন্তু সফির সোহাগ মাখা হাতখানা তার কাছে কেমন যেন ভারী বলে বোধ হয়। সফির উপস্থিতি তার কাছে গুরুভার হয়ে দেখা দেয়।

অপরাধ-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সফি বলে—অভিমান যে তোমায় কোথায় তা আমি জানি। তোমার অভিজাত্য, আর রূপ ঐশ্বর্য্য, তোমার যশ-খ্যাতি—সবকিছুর কাছে আমি দরিদ্র নগণ্য। তোমাকে তাই কাম্য ভাবতে পারিনি কোনদিন। কিন্তু তুমি যে অলক্ষিতে, অজ্ঞাতে আমাকে এমন ক'রে চেয়েছিলে তা কল্পনাও করতে পারিনি। সামান্য একটা ভবঘুরে মানুষকে তুমি চেয়েছ আপন করে চিরসাথী রূপে। তোমার উচ্চাসন এমনভাবে মোহের বশে ধুলোয় মিশে যাক, এ আমি কোনদিন চাইনি। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি তুমি কত ভালবেসেছ আমায়। তোমার প্রেম পুত-পবিত্র। সেই সত্য ও সঠিক প্রেমকে আমি উপেক্ষা ক'রে সত্যি অন্যায় করেছি। আমি অপরাধী। তুমি আমায় ক্ষমা কর মিনু।

মিনতি ম্লান মুখে উত্তর দেয়—অপরাধ তোমার নয়—অপরাধী আমি। কিন্তু যাক সে কথা। কি বলবে বল।

—আমি মনস্থির করেছি। তোমার জীবন-প্রবাহের সঙ্গে আমায়

একান্ত করে মিশিয়ে নাও, মিনু।

মিনতি প্রতিবাদ করে—এ তোমার মনের কথা নয়। আমি জানি তোমার হৃৎপিণ্ড কোথায়। তাই এতটুকু ভুলও তোমাকে করতে দেবো না। আমার একান্ত অনুরোধ—তুমি আয়েশাকে বিয়ে কর। তাহ'লেই সুখী হ'তে পারবে।

—আর তুমি?

—আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। জীবনে আমার বার্দ্ধক্য এসেছে। সে বার্দ্ধক্য দেহের না হলেও মনের ত বটেই!

—কিন্তু তুমি কি করবে?

—কি করবো তা জানিনে। তবে তোমাদের চলার পথে আর কাঁটা হয়ে থাকবো না।

—কাঁটা ত তুমি কোনদিন হওনি মিনু। আমার সীমিত জীবনে তুমি দিয়েছ বিরাট এক প্রশস্তির সন্ধান। তোমার সবখানি দেহমন দিয়ে আমার মঙ্গল কামনা করেছ। নইলে কোন্ সঙ্কীর্ণ চলার পথে আমাকে ছোট হয়ে পড়ে থাকতে হ'ত কে জানে।

মিনতি বলে—থাক্‌ও কথা। জটিল সমস্যা তোমার সামনে। তার সমাধান প্রয়োজন। আমি সেই সমধানই করে যাব।

মিনতির হাত ধরে সফি ব'লে—না, না। কোন সমাধান তোমায় করতে হবে না। প্রেম অন্ধ। প্রেম পবিত্র এবং চির উজ্জল। সেই প্রেমের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে খাঁটিত্ব আমাদের প্রমাণিত হয়েছে। আজ আমার মাঝে জেগেছে রূঢ় বাস্তবোধ।

মিনতি ম্লান হেসে বলে—তোমার জীবনে যখন বাস্তববোধ জেগেছে তখন আমার জীবনে স্বপ্নের কুহেলী। দুটি বিপরীতমুখী ধারা কি কখনো এক হ'তে পারে না? তোমার ও আমার একান্ত মিলন আজ অসম্ভব। এতদিন ধরে যাকে শ্রদ্ধা করেছ তার প্রতি তোমার শ্রদ্ধার পবিত্রতাই অমলিন থাক। মিনতির এতদিনের প্রেম

মিথ্যে। সে মিথ্যে প্রেম জগত থেকে মুছে যাক। মিনতি নিজেও জগতে মিথ্যে হয়ে যাক। তুমি অন্তরের সঙ্গে যাকে শ্রদ্ধা ক'রে এসেছ সে শুধু শ্রদ্ধা পাবারই যোগ্য। যে জ্বালাময়ী দৈহিক ক্ষুধা তোমার প্রতি আমাকে অহঃরহই আকৃষ্ট ক'রে দেহ ও মনকে অস্থির করে তুলেছিল তা আজ থেমে গেছে। মিথ্যে নামধারী মিনতি অভিনয় ক'রে চলেছিল। অভিনয়—শুধুই অভিনয়। সে অভিনয় আজ বিয়োগান্তক পরিণতি লাভ করেছে। বিয়োগই ব্যথা—আর ব্যথাই ত দর্শক হৃদয়ে সত্যিকার জীবনের ছাপ আঁকতে পারে।

—কিন্তু আমাদের জীবন-নাট্যকে কখনই বিয়োগান্তক হ'তে দেব না মিনু।

মিনতি ম্লান হেসে বলে—পাগল। এ না হ'লে স্বাভাবিক পরিণতি আসবে কেমন করে? তাছাড়া আমি খোদার নামে শপথ করেছি।

—খোদার নামে শপথ!

—হ্যাঁ, খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস হারিয়ে এতদিন যে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেছি তা আজ সমাপ্ত হ'ল। নিয়তি নির্ম্মম খোদার শাসন সত্যি নির্ভুল।

মিনতির মুখের প্রতি বিস্ময়ে চেয়ে থাকে সফি। বলে—তুমি কি মুছলমানের মেয়ে?

হ্যাঁ। কিন্তু থাক ওসব কথা। আমার সব পরিচয় জানতে চেয়ো না। অন্তত আজ।

সহসা কামিনীর কণ্ঠ শোনা যায়। সে সজোরে কড়া নাড়া দিয়ে ডাকতে থাকে—মা, মা·····

বিশ্বপ্রকৃতি প্রখর রোদে উজ্জ্বল। কোলাহলে মুখর পৃথিবী। সফি নির্বাক, নিস্তব্ধ—মিনতি নতমুখী, ম্লান। উভয়ের চোখে ক্লান্ত অশ্রু। একটি রাতের মাঝে শতাব্দীর ঝঞ্ঝা যেন বয়ে গেচে উভয়কে কেন্দ্র করে। আবার কামিনীর ডাক শোনা গেল—মা, মা।

মিনতি খাট থেকে নেমে বলে—এই যে আসছি কামিনী।

স্থির প্রশান্ত দুপুর। দিগন্তমেখলা শান্ত—বিশ্ব-প্রকৃতি নীরব, নিথর। কিন্তু মিনতির মনের গভীরে বইছে প্রচণ্ড ঝড়। অশান্ত অস্থির মিনতি। তার চোখের চারপাশে কান্নায় ফুলে উঠেছে। সুহাসিনী মুখমণ্ডলে নেমেছে আমানিশার অন্ধকার।

একখানা ছোট ফটো মিনতির হাতে। ঘরের মেঝেতে কুড়িয়ে পেয়েছে ফটোখানা। নির্নিমেষ নয়নে সে ফটোর প্রতি চেয়ে থাকে। তার আঁখিপাতা স্থির, পলকহীন—আখির মধ্যমণি বিস্ময়ে অচঞ্চল মিনতি দেখছে আর ভাবছে—এই আয়েশা! আয়েশার এত রূপ! বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায় মিনতি। অভিভূতির মাঝেই কেটে যায় অনেকক্ষণ। তারপর বিস্ময়-নিমগ্ন মন সহসা কি যেন চিন্তা ক'রে চঞ্চল হয়ে উঠে। মুহূর্তে কি যেন সমাধান খুঁজে পায় সে। চমক ভাঙা কণ্ঠে ডাকে—কামিনী' ও কামিনী।

কামিনী ছুটে আসে—কি মা?

আমায় একবার আয়েশাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারিস?

—আয়েশাদের বাড়ী?

—হ্যাঁ। যে বাড়ী থেকে তোর বাবুর যাতায়তের খবর এনে দিয়েছিস। যা শীগ্‌গীর কাজকর্ম সেরে নে দেখি।

কামিনীসহ মিনতি এক সময় আয়েশাদের বাড়ী এসে উপস্থিত হয়। প্রথম সাক্ষাতে উভয় পক্ষেই বিস্ময়ের অবধি থাকে না, যদিও কামিনীর সঙ্গে সামান্য পরিচয় হয়েছে আয়েশার মায়ের।

প্রথম দর্শনেই হামিদাবানুকে লক্ষ্য ক'রে মিনতি বলে—আপনি নিশ্চয়ই আয়েশার মা। বলুন, আমার অনুমান কি মিথ্যে।

মা বিস্মিত কণ্ঠে বলেন—না, না! তোমার অনুমান মিথ্যে নয়। কিন্তু কে তুমি? কেন এসেছ বল?

মিনতি সহাস্যে উত্তর দেয়—মায়ের বাড়ীতে মেয়ের আগমন।

তার আবার কারণের প্রয়োজন হয় নাকি? মা'কে দেখতে আসতে নেই বুঝি?

উদ্ভাসিত মুখে মা বলেন—তা আসবে বইকি মা। নিশ্চয়ই দেখতে আসবে।

মিনতির পাশে এসে দাঁড়ায় উৎসুক নয়না প্রশ্নোন্মুখ আয়েশা। প্রস্ফুটিত যৌবনময়ী, তন্বী আয়েশা। আয়েশার মুখ সহাস্য, চোখ স্বপ্ন মদির মাখা, দেহলতা নয়নানন্দকর।

আয়েশার মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মিনতি বলে-আপনার মেয়ে বুঝি?

—হ্যাঁ, মা, আমার আয়েশা!

—মিনতি সজাগ হয়ে উঠে। বিস্ফারিত চোখে সে চেয়ে থাকে আয়েশার প্রতি।

উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হয় গভীরভাবে। কে কত সুন্দর পরস্পর তাই চিন্তা করে তারা। কক্ষান্তরে প্রস্থানের পূর্ব্বে মা বলেন—তুমি বস মা, আমি এক্ষুনি আসছি। মিনতি হাসিমুখে মাথা নাড়ে।

এবারে আয়েশাকে লক্ষ্য করে মিনতি বলে—তোমাকে দেখতে এলাম আয়েশা। অযাচিতভাবে আমাকে আসতে দেখে আশ্চার্য্য হয়েছ নিশ্চয়। অসময়ে অনাহুত অতিথি! ভাবছ, খাবারে কুলোবে কিনা? ভয়নি, খেয়েই এসেছি।

আলাপ নেই, পরিচয় নেই অথচ এত নিঃসঙ্কোচে এমন ক'রে কে বলতে পারে! আয়েশা বিস্মিত হয়। শান্ত কণ্ঠে বলে—কিছু মনে করবেন না। আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পারিনি।

অদ্ভুত হাসি হেসে মিনতি উত্তর দেয়—আশ্চার্য করলে দেখছি। আমাকে কখনো দেখনি নাকি? তোমার এত কাছে থাকি অথচ আমায় দেখতে পাওনা? যে আরশীতে তুমি নিজেকে দেখ, আমিও তারই মাঝে আমাকে দেখে থাকি। কতবার কতভাবে তার মাঝে

আমার রূপের প্রকাশ হয়েছে—প্রতিফলিত হয়েছে আমার সমস্ত কিছু। অথচ সেই একই আরশীতে তোমাকে দেখতে গিয়ে আমার কোন ছাপই তাতে দেখতে পাওনি? নিষ্ঠুর আরশী বটে! আমি কিন্তু সেই আরশীতে তোমায় রোজই দেখি বোন।

আয়েশা এ হেঁয়ালীর অর্থ খুঁজে পায় না। মিনতি তার অসহায় অবস্থা লক্ষ্য ক'রে মুখ টিপে হাসে শুধু! বলে—আরশীর কি দোষ বল? ওর মুখোমুখি দাঁড়ালে তবে নিজেকে দেখা যায়। স'রে গেলে আবার আরশী ফাঁকা পড়ে থাকে! যাক, তুমি আমায় না চিনলেও আমি তোমার কথা অহঃরহই ভাবি। নিত্য তোমাকে আমার মনের আরশীতে দেখতে পাই।

আয়েশা বিস্মিত হয়ে—রোজই আমায় দেখেন? আপনার আরশী অদ্ভুত তা'হলে। কিন্তু কোথায় থাকেন আপনি?

—বলেছি ত। তোমার অতি নিকটে। ওই ত ওখানে আমার বাসা। কাল সন্ধাতে একবার যেয়ো। যদি কোন বিশেষ কারণে আমি অনুপস্থিত থাকি তবে আমার জন্য অপেক্ষা ক'রো। সেখানে তোমার সাথে আমার বাকি পরিচয় হবে। তোমার মা গেলেন কোথায়? তাঁর সাথে যে আমার অনেক কথা।

আয়েশা উত্তর দেয়—মা রান্না ঘরেই আছেন! বসুন, এখুনি উনি এসে পড়বেন।

আয়েশার কাছে এগিয়ে যায় মিনতি। একখানা হাত ধরে প্রশ্ন করে—শুনলাম তোমার নাকি বিয়ে?

বিস্ময় মাখা কণ্ঠে আয়েশা বলে—অশ্চর্য্য করলেন দেখছি। এসব কথা শুনলেন কোথায়? সব ভুল।

—ভুল মোটেই নয়। আমি নিজেই তোমার বিয়ের ঘটক যে! মিনতি হাসে।

আয়েশা নিজেকে আরও বিব্রত বোধ করে। উভয়ের মাঝে মা

এসে দাঁড়ান এমনিক্ষণে। মিনতি এগিয়ে গিয়ে বলে—এই যে, মা এসেছেন। কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? বুঝেছি। অতিথি খাওয়াবার ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন বুঝি?

মিনতির চটুলতায় মা প্রীত হন। তিনি সহাস্যে বলেন—তা ব্যস্ত হওয়াইত স্বাভাবিক। কিন্তু এ গরীব মায়ের ঘরে—

মিনতি এবার বাধা দেয়—থামুন মা! আপনাকে বিব্রত করতে আসিনি। এত বেলায় কেউ বুঝি না খেয়ে আসে? ওদিকে চলুন। আপনার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।

গৃহের একপাশে মিনতি ও মা। আয়েশা উৎসুক নয়নে সন্দিগ্ধ হৃদয়ে দুরে দাঁড়িয়ে ভাবে—কি এত গোপন কথা?

মিনতি প্রশ্ন করে—মেয়ের বিয়ের কি করলেন?

মা বিস্ময় প্রকাশ করেন—কার? আয়েশার?

—হ্যাঁ. আমি এসেছি নারীমঙ্গল সমিতির পক্ষ থেকে। শুনলাম আপনি কন্যাদায়গ্রস্ত। অথচ হাত আপনার কপর্দ্দকশূন্য। সুতরাং আমি ত ব'সে থাকতে পারিনে। তাই এসেছি সাহায্য করতে।

—সত্যি! কিন্তু কেন এভাবে সাহায্য করবে মা?

মিনতি উত্তর দেয়—সাহায্য করাই যে আমাদের কাজ! মেয়ে হয়ে আমরা মেয়েদের দুঃখ বুঝবো না? বলুন, কত টাকা আপনার প্রয়োজন?

মা বিব্রত হয়ে পরেন—আমার টাকার প্রয়োজন একথা কে বললে তোমায়? জীবনে অনেক অপরাধ করেছি, অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ইহকালে। ঋণ গ্রহণ ক'রে পরকালের পথ আর আমি ভারী করতে চাইনা।

মিনতি বাধা দেয়—এ মোটেই ঋণ নয়। একেবারে নিঃস্বার্থ দান। আইবুড়ো মেয়ে ঘরে রেখে কি জাহান্নামে যেতে চান?

আয়েশা আমার ছোট বোন। আমারই চোখের সামনে ও ম্লান হয়ে থাকবে, আর তাই বুঝি আমি বসে বসে দেখবো?

—কিন্তু—

—না, না, কোন কিন্তু নয়। আমি কোন আপত্তি শুনবো না। কামিনীকে দিয়ে কালই টাকা পাঠিয়ে দেব। বলুন, মেয়ের এ দান আপনি গ্রহণ করবেন কিনা?

মা উত্তর দেবার আগেই মিনতি তাঁর হাত আঁকড়ে ধ'রে আবার বলে—মায়ের কাছে মেয়ের দান। এ আপনাকে নিতেই হবে।

মিনতি দ্বিরুক্তি না ক'রে কামিনীকে ইশারায় কাছে ডেকে বলে—চল কামিনী। বেলা পড়ে এলো যে। হ্যাঁ, আজ তবে আসি মা। তারপর আয়েশাকে লক্ষ্য ক'রে বলে—আয়েশা আজ যাই বোন। কাল একবার যেয়ো কিন্তু। কেমন?

আর কেউ কিছু বলার পূর্ব্বেই মিনতি দ্রুতপদে গৃহ ত্যাগ ক'রে অদৃশ্য হয়ে যায়। মা তার গমন পথের প্রতি চেয়ে থাকেন! তারপর এক সময় আপন মনে বলে ওঠেন—এ—ও কি সম্ভব!

মায়ের কাছে গিয়ে আয়েশা প্রশ্ন করে—কি বললেন উনি?

—কিযে বলে গেল, আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না মা। কেমন যেন যাদুমন্ত্রে বশীভূত ক'রে রেখে গেল। অনিচ্ছার মাঝেও আমার কাছ থেকে নীরব সম্মতি নিয়ে চলে গেল।

—কিসের সম্মতি মা?

—দানের। তোর বিয়ে বাবদ মেয়েটি কিছু মোটা টাকা সাহায্য করতে চায়।

আয়েশা বিস্ময় প্রকাশ করে—উপযাচক হয়ে টাকা সাহায্য! তুমি কি বললে?

—কিছুই বলতে পারলাম না। কেমন যেন স্তব্ধ বিমুগ্ধ ক'রে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত ক'রেই চলে গেল। আমি প্রতিবাদ করবার

সময় পর্য্যন্ত পেলাম না।

আয়েশা দীর্ঘশ্বাসে বলে—হুঁ। দারুণ ভুল করেছ মা। টাকা উনি নিশ্চয়ই পাঠাবেন। কিন্তু ওঁর পরিচয় নেওয়া উচিৎ ছিল। যিনি আমাদের এত খবর রাখেন তাঁর পরিচয় কেন নিলে না?

—সময় পেলাম কই? দেখলি ত কেমন ঝড়ের মত বের হয়ে গেল। মেয়েটা অদ্ভুত! কেমন যেন যাদু জানে। নইলে—

পরবর্ত্তী দিনের সায়াহ্ন। কামিনীর হাত হ'তে একখানা চিঠি সহ একগাধা একশ' টাকার নোট গ্রহন করে হামিদাবানু সবিস্ময়ে বলেন—দেখো দেখি মেয়ের কাণ্ড! সত্যি টাকা পাঠিয়েছে।

আয়েশার হাতে পত্র দিয়ে মা বলেন—পড় দেখি কি লিখেছে!

পত্র পাঠান্তে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে আয়েশা। অস্ফুটে বলে—মা গো! আঠারো হাজার, টাকা। জীবনের শেষ সম্বল।

আয়েশার উচ্চারণে সঙ্গে সঙ্গে মা প্রতিধ্বনি ক'রে ওঠেন—কি বললি মা? আঠারো হাজার টাকা! জীবনের শেষ সম্বল! এত টাকা কথনো গ্রহণ করতে পারিনে আয়েশা! কি যেন রহস্য রয়েছে এ দানের মাঝে। না, না। এ কখনো দান নয়। এর মাঝে লুকিয়ে আছে অনেক দুঃখ। লুকিয়ে আছে নিদারুণ দীর্ঘশ্বাস। কি ভয়ঙ্কর কথা বল্ দেখি?

আয়েশা ব্যাকুলতা প্রকাশ ক'রে বলে—এ দান তুমি ফিরিয়ে দাও মা। সব ফিরিয়ে দাও।

কামিনীকে মা বলেন—তুমি এসব নিয়ে যাও বাছা। এত টাকা কখনও কেউ দান করে না। তাছাড়া এ যে তার জীবনের শেষ সম্বল।

কামিনী উত্তর দেয়—কিছুই ফিরিয়ে নিতে পারবোনা মা। শুধু দিয়ে যাবার হুকুম আছে আমার প্রতি।

মা আরও অশ্চার্য হন।—শুধু দিয়ে যাবার হুকুম! আয়েশা কি করি বলত মা?

কামিনী বলে—কিছু করতে হবে না। মেয়েকে নিতে এসেছি? তুমি চল মা। গিয়ে সব কিছু বুঝে প'ড়ে এসো।

হামিদাবানু বলেন—সেই ভাল! আয়েশা, যা দেখি এককবার। মেয়েকে বলে আসবি যে, তার এ দান মা গ্রহণ করতে পারেন না। কামিনীকে লক্ষ্য করে মা বলেন—ওগো বাছা মেয়েকে সন্ধ্যের আগেই পোঁছে দিয়ো কিন্তু।

আয়েশাকে সঙ্গে নিয়ে কামিনী নিজেদের ঘরের সামনে এসে দেখতে পেল সদর দরজা তালা বন্ধ। আশ্চর্য্য হল সে! কামিনী পাশের বাড়ীগুলো খুজে দেখে এলো। কিন্তু কোথায় মিনতি? অনেকক্ষণ অধীর অপেক্ষায় গেল কেটে। তারপর পাশের বাড়ীর এক বৃদ্ধ এসে কামিনীর হাতে চাবির গোছা দিয়ে বললে—এই যে, তোমার ঘরের চাবি।

—মা কোথায় গেলেন? কামিনী প্রশ্ন করে।

—কোথায় গেছেন জানিনে। তবে বলে গেছেন—সবার সঙ্গে এই তাঁর শেষ দেখা। যাবার বেলায় উনি আমাকে পাঁচটা টাকা বকশিস দিয়ে গেলেন! ভারী ভাল মানুষ ছিলেন।

কামিনী প্রশ্ন করে—তোমাকে বকশিস দিয়ে বলে গেলেন—এই তাঁর শেষ দেখা? কামিনীর কণ্ঠে উদ্বেগের স্বর।

ঘর খুলে কামিনী দ্রুত এগিয়ে যায় দোতলার সিঁড়ি পথে। আয়েশা প্রশ্ন করে—বাড়ীতে আর কেউ থাকে না বুঝি?

—কে আর থাকবে! লোকের মধ্যে আমি, বাবু, আর মা। বাবু এখন অফিসে। আসবেন সেই রাত সাতটায়।

—কে তোমার বাবু? কি নাম তার?

কামিনী উত্তর দেয়—ওই যে গো চুণী বাবু। যিনি তোমাদের

বড়ীতে যাতায়াত করেন।

আয়েশা বিস্ময় প্রকাশে বলে—আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করেন! চুণী বাবু আবার কে?

—ওই যে আমাদের চুণী বাবু। যিনি তোমার হাতে সোনার বালা দিয়েছেন। গোপনে সেই সব দেখে এসে মাকে বলেছিলাম। তারপর থেকেই মায়ের আমার কি যে হ'ল।

আয়েশা এবারে কিছুটা অনুমাম করে। কিন্তু কোন কিছুই স্পষ্টভাবে জানতে পারেনা সে। কেমন যেন সব কিছু হেঁয়ালি ব'লে মনে হয়। কামিনী ভারাক্রান্ত হৃদয়ে একবার ব'সে পড়ে। আবার অস্থির আবেগে উঠে দাঁড়ায়। বলে-তুমি ব'সো মা, আমি ১২ নম্বর বাড়ীটা একবার দেখে আসি। ম্লান অশ্রু-ভারানত কামিনী। এত ক্ষণের সব উদ্দাম তার শিথিল হয়ে গেছে।

সুসজ্জিত জনশূন্য কক্ষ মাঝে বিস্ময়-বিমুগ্ধ আয়েশা। সফির ফটো জীবন্ত হাসি ফুটিয়ে চেয়ে আছে। পাশে অবনতমুখী মিনতির প্রতিকৃতি। সফিই কি কামিনীর চুণী বাবু?

নিস্তব্ধ গৃহ। দেয়াল ঘড়ির স্পন্দন চলছে টিক্ টিক শব্দে। যেন একটা অব্যক্ত হাহাকার রোদন ক'রে বেড়াচ্ছে গৃহের আনাচে কানাচে—নিরুদ্ধ বাতাসের বুকে।

টেবিলের ওপর একখানা পত্র। মিনতির পত্র নয়ত? হ্যাঁ' মিনতিই লিখেছে—

"প্রিয় সফি (ওরফে) চুণী বাবু।

আজ চিরবিদায় নিয়ে চোরের মত চ'লে যাচ্ছি। যাবার আগে তোমার কাছে জীবনের বিচিত্রতার ইতিহাস দিয়ে যাবো।

জীবনে বহু অর্থ সঞ্চয় করেছিলাম কিন্তু রাখাবার প্রয়োজন বোধ করিনি। তবুও শেষ পর্য্যন্ত আঠারো হাজার টাকা আমার

ছিল। সে টাকা ছোট বোন আয়েশাকে দান ক'রে গেলাম। আর কিছু টাকা হতভাগিনী কামিনীর জন্য রেখে গেলাম বাক্সে। তাকে দিও। তোমার দেওয়া সোনার হারটা দেরাজে রইল। ওটা আয়েশার জন্য রেখে গেলাম। নিজে হাতে ওর গলায় পরিয়ে দেবার সুযোগ হ'লনা, কিন্তু আমার পরশ রইল ওতে।

চলেছি। কোথায় চলেছি তা জানিনে। যাবার আগে হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা উজার করে তোমাদের দাম্পত্য জীবনের সুন্দর পথে রেখে গেলাম অকুণ্ঠ দো'য়া।

আমি মিনতি নই—মিনা। ত্যাগের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলেছিলাম। ভোগ-সম্ভোগের নেশা আমার ছিলনা। তাই রত্ন স্বরূপ স্বামীকে ত্যাগ করেছিলাম! তাঁকে চলার পথে আবর্জ্জনাজ্ঞানে দূরে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। তারপর চরম ক্ষতিও করেছি তার।

যাক সেসব কথা। জীবনে বহু পুরুষ আমায় পাবার জন্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু যৌন তাগিদ কোনদিন আমাকে আকৃষ্ট করেনি তাদের প্রতি। ঘৃণ্য পশুজ্ঞানে সবাইকে নিরাশ করেছি। তাদের কত অশ্রু যে পথের ধূলায় মিশে গেছে তার অন্ত নেই। কত প্রেমিক যে জীবনে হাহাকার নিয়ে চ'লে গেছে—আমি ফিরেও দেখিনি! তারপর দিনে দিনে কেমন ক'রে যেন আমার মাঝে এলো জৈব জাগরণ—জীবনকে একান্ত ক'রে উপভোগ করবার দৃঢ় কামনা। সেদিন উদ্ধত, একক জীবনের পবিত্রতাকে নোংরা পাশবিকতার তলে নিপীড়িত করার সাধ জাগলো। তাতে কি সুখ, কি মাদকতা তার মাঝে, তাই যাচাই করার সাধ জাগল অন্তরে। দেহ এবং মনে এলো অকুলতা—জৈব পুলকের শিহর জাগানো আকুলতা। কিন্তু আমি যে অভিশপ্ত। তাই চাওয়ার মাঝে কেঁদে ফিরলো না-পাওয়ার দীর্ঘশ্বাস।

আঘাতে প্রতিঘাত আসে। দুঃখ দিয়ে চিরদিন পেতে হয় দুঃখ। এ সত্য আজ চরমভাবে প্রমাণ হয়েছে আমার জীবনে। মানুষ শুধুই

মানুষ। মানুষ আত্মকেন্দ্রিক এবং একক জীবনে সত্য এবং স্বাধীন। সে কারও কাছে কৃপার পাত্র নয়, কারও অধীনেও সে নয়। যে নিজেকে ছোট বা অসাহায় ভাবে' সে আশ্রয় খোঁজে অপরের কাছে, কিন্তু যার মাঝে শক্তি সাহস এবং সামর্থ আছে, যে নিজত্ব সম্বন্ধে সম্পুর্ণ সজাগ, সে কেন হবে পরমুখাপেক্ষী। এই বিশ্বাস ও ধারণা নিয়ে মানুষ হয়েছিলাম আমি। কিন্তু কোনদিন ভাবিনি যে আমি নারী, সৃষ্টির মাঝে শুধুই আমি নারী। জন্মগত ভাবে আমি অবলা নারী—পুরুষ নই। আমার মাঝে নারী-সুলভ কমনীয়তা ও দুর্ব্বলতা আছে—অশ্রয়-লতিকায় মত দুর্ব্বল মন সুপ্ত হয়ে আছে—একথা, কোনদিন ভাবিনি। সর্ব্বোপরি মাতৃত্বের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে নিঃশেষ করাই যে নারীর সার্থকতা সে চিন্তাও কোনদিন করিনি। অথচ এ সবই চিরন্তনী। তাই ভুল আমার ভাঙালো—নিজেকে ফিরে পেলাম একদিন সত্যিকার ভাবে। সেদিন চেয়ে দেখলাম গত দিনের অহমিকার অন্তরালে বিপুল ক্ষতি আমার হয়ে গেছে। উদ্দাম জীবন-বসন্তে যাদেরকে দূষিত কীটজ্ঞানে ত্যাগ করেছিলাম তারা ফিরে গেছে সত্যি। কিন্তু আমার জীবনের চারপাশে রেখে গেছে সকরুণ দীর্ঘশ্বাস। অভিশাপে পূর্ণ করে রেখে গেছে আমার চলার পথ। আজ আমার দম আটকে আসে—শূন্যতার হাহাকারে জাগে জীবনের অতৃপ্তির বেদনা। এ ভাবে ব্যর্থ হওয়ার প্রয়োজন ছিল আমার। ব্যর্থতার ব্যথাই আমার প্রাপ্য। নইলে আমার কলুষ কামনায় জঘন্য উচ্ছৃঙ্খলতারই হ'ত প্রসার লাভ। খোদার নিখুঁত সৃষ্টির নিয়মতান্ত্রিকতায় আসতো দারুন ব্যতিক্রম।

আমার স্বামীকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণ্য করতাম। তাঁকে অত্যন্ত ছোট ভাবতাম। কিন্তু তিনি ছিলেন মস্তবড় দার্শনিক—তাঁর মত ছিল উদার ও মহৎ। আমার কাছে শত আঘাত পেয়েও কখনো তাঁকে দুঃখ করতে দেখিনি। কত উপদেশ তিনি আমায় দিতেন

বলতেন—''তুমি আমায় ঘৃণা কর তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু জীবনকে উপলব্ধি করতে শেখো। এ জগতে সব মিথ্যে—সব অহমিকা—ভুলের ওপরে প্রতিষ্ঠিত সব। তিনি কবিতা শোনাতেন ... ...

এই যে দেখ বিশাল ধরা
জীব জগতের জয়গান,
(এ) একটুখানি চল্‌কে-পড়া
বিন্দু জলের ঢেউ-তুফান।

সব ভেঙে যাবে—সব মিথ্যে হয়ে যাবে। তারপর সত্যের, জগত দেখতে পাবে মৃত্যুর মাঝ দিয়ে। মৃত্যুর পারাপারে আছে সত্যিকার সুন্দর জগত।" আমি তাঁর এসব কথা শুনে বিদ্রুপ করতাম। কঠোর-ভাবে তাঁকে দিতাম আঘাত। তাঁর সান্নিধ্য পর্য্যন্ত এড়িয়ে চলতাম। আমার রঙিন দীপ্ত জীবনের পাশে তাঁকে বিড়ম্বনা ভেবে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিতাম। তারপর আমি তাকে স্বামী ব'লে মানতেও অস্বীকার করলাম। সে যে কতবড় ঔদ্ধত্য, কতবড় হৃদয়হীনতা—কতবড় অমানুষিকতা—আজ তা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারি। আজ ভাবি যৌবনটাই জীবন নয়!

তারপর জীবনের স্তরে স্তরে কি যেন সব হয়ে গেল। বাপের সংসার ত্যাগ করলাম—স্বামীকে বিষ খাইয়ে পাগল করলাম, চিত্র জগতে সৌভাগ্যের চরম উন্নতি কল্পনা ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কিন্তু যথেষ্ঠ সুনাম অর্জন করেও কোন স্বস্তি পেলাম না। পুরুষের দুরন্ত উন্মত্ততা আমার যৌবনকে কেন্দ্র করে বারে বারে আঘাত হানলো। সে আঘাত ছিল আমার আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিত্তিমুলেরই ওপর আঘাত স্বরূপ। ফলে পুরুষ জাতকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলাম। জীবনের সাধারণ গতিকে নিয়ন্ত্রিত করলাম অসাধারণ ভাবে। নারীদেহে পুরুষ ভাবলাম নিজেকে।

কিন্তু ভাঙন ধরলো আমার মন-গড়া জীবন সৌধে। কাঁচ

পাত্রের বুকে বিক্ষিপ্ত আঘাতের ভাঙন। একটা হাহাকার আমার জীবন জুড়ে তুফান তুলতে লাগলো। পদে পদে নিজেকে অপরাধী ভাবলাম। তারপর সর্বশেষ আঘাত দিলে তুমি। তোমার মাঝে কি যেন দেখলাম। তোমার কর্মের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে যেন কৃতার্থ ভাবতে লাগলাম। হয়ত তেমোর জীবন-দর্শন আমার কাছে সহজবোধ্য ছিল—হয়ত তোমার স্বদেশ-প্রীতির মাঝে বহত্তর জীবনের মোহিনী শক্তি আমাকে অভিভূত করেছিল। তোমাকে কেন্দ্র ক'রে আমার জীবনে ক্রমে ক্রমে জাগল সুপ্ত অনুভূতি। ওরা যেন শত শাখায় সঞ্চারীত হ'ল আমায় সর্বদেহে। যৌবন বোধের—জৈব অতৃপ্তির সে কি আকুল ক্রন্দন। পরিপূর্ণ যৌবন ছেপে কামনা জাগলো দেহের শিরা উপশিরায়, অন্তঃসলিলার পিচ্ছিল ধারা বইল আমার পর্ব্বতে, গুহায়। জীবনের কেন্দ্রে কেন্দ্রে কেঁদে ফিরলো আবর্ত আহ্বান। নারী দেহের সে কি রকম উদ্দাম বিকাশ—জৈব জাগরণের সে কি দুর্দমনীয় পুলক অনুভূতি! পাগল হয়ে গেলাম। পুরুষের সবল সিংহ বিক্রমের মাঝে নিজেকে দলিত মথিত ক'রে তৃপ্তি সুখের জন্য আত্মহারা হয়ে উঠলাম! কিন্তু বিভ্রান্ত না হয়ে, অতীত ঐশ্বর্যের মর্য্যাদার দিকে চেয়ে আমি আবার একের মাঝেই নিজেকে করলাম ন্যস্ত। শুধু একজনকে চাইলাম—শুধু তোমাকে। লোক-চক্ষুর অন্তরালে, আত্মগোপনের মাঝেও চাইলাম তোমাকে। কিন্তু সে চাওয়া আমার উচিত ছিল না। তাই তোমার নিরাসক্ত ব্যবহারে—ন্যায় ও সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে আজ আমাকে চরমভাবে ব্যর্থ হ'তে হয়েছে। এ ব্যর্থতা ক্ষণিকের হলেও আমার জীবনের চলার পথে অসামান্য সফলতা। কিন্তু তবুও—আমি ব্যর্থ। সত্যি আমি আজ ব্যর্থ।

পরাজয়ের গ্লানি আমার চতুর্দিকে। আজ আমি বিপুল বিশ্বে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র নারী। আমার জীবনের চারপাশে আসছে স্বামীর

অট্টহাসির রোল ভেসে। তার নির্দেশ-ইঙ্গিত আমায় আহ্বান জানাচ্ছে। তিনি আমায় ডাকছেন—সহাস্যমুখে, সাদরে। সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রে তিনি আমায় বুক পেতে সস্নেহ আহ্বান জানাচ্ছেন। আমি সেখানেই চ'লে যাচ্ছি। নিদারুন ব্যর্থতা নিয়ে তাঁরই কাছে গিয়ে দাঁড়াব। তাঁর চলার পথে এগিয়ে যাবো নিঃশব্দে। তোমরা আমায় দো'য়া করো।

অভিনেত্রী আমি। তোমাকে নিয়েও অভিনয় শুরু করেছিলাম। কিন্তু বাস্তব জীবন আর অভিনয় যে এক নয়' তা আজ জানতে পেরেছি। একান্ত করে পাবার সাধ যেখানে, সেখানে ক্ষণিকের অভিনয়ে পাওয়াতে তৃপ্তি কোথায়? জীবনের প্রতি স্তরে স্তরে, প্রতি মুহূর্তের কামনাতলে বারে বারে পাওয়াতেই ত সুখ, সার্থকতা চরম সফল্যের আনন্দ।

স্রষ্টা চিরদিনই বড়। তার সৃষ্টিকে শত রূপ দিয়েও কেউ কোন দিন স্রষ্ঠা হতে পারেনি। তাঁকে ছাড়িয়ে উর্ধেও উঠতে পারেনি কোন শিল্পী কোন দিন। নাট্যকার চরিত্র সৃষ্টি করে। সে স্রষ্টা। অভিনেতার চেয়ে, রূপকারের চেয়ে, তার নাটক সৃষ্টির মন অনেক বড়। তাই অভিনেত্রী আজ নাট্যকারের কাছে পরাজয় স্বীকার করছে। মহান স্রষ্টার সৃষ্টির তলে নিজেকে অতি ক্ষুদ্র জ্ঞানে উদ্ধত মিনতি জানাচ্ছে অকুণ্ঠ প্রণীত—সসম্ভ্রম প্রণতি। ভুয়ো মিনতির অপমৃত্যুর মাঝে আসল মিনার হয়েছে আবির্ভাব।

বিদায়। চিরদিনের জন্য বিদায়। পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে সাশ্রু নয়নে আয়েশাকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলাম, আর নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে যাচ্ছি তাঁরই কাছে যেখানে অজস্র ক্ষমা আর অনুশোচনায় পুড়ো হবে আমার প্রায়শ্চিত্ত। তোমরা আমায় ক্ষমা করো।

ইতি—তোমাদের
মিনা

—ঝাপসা। সব ঝাপসা। সবকিছু অস্পষ্ট।

কামীনি ফিরে এ'সে ডুকরে কেঁদে ওঠে—এখন কি হবে মা? বাবু এলে কি বলবো আমি?

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আয়েশা বলে—কিছুই তোকে বলতে হবে না কামিনী। সব আমিই বলব।

কামিনী বিষন্ন মনে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়।

সন্ধ্যা নেমে আসে নগরীর বিশাল প্রাঙ্গনে। লক্ষ লক্ষ আলোর উদ্ভাসিত ক'লকাতা। কর্মব্যস্ত নর-নারীদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের সমারোহ। সে আগমনীর পথ ধরে প্রফুল্ল হৃদয়ে সফি ফিরে আসে ঘরে। তার আগমনে সজাগ হয়ে উঠে আয়েশা।

বিষন্ন-হৃদয় কামিনীকে সিঁড়ির ধারে উপবিষ্ট দখে সেফি বলে—কি রে? পাহারায় ব'সে আছিস নাকি?

কামিনী কোন উত্তর দেয়না। তার প্রতি কেমন এক বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে সফি গৃহে প্রবেশ করে। আয়েশা জানালার পাশে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকে। শান্তপদে কাছে গিয়ে সফি বলে—মিনু আজ তোমার জন্য এমন এক উপহার এনেছি, যা পেলে… …

সহসা থেমে যায় সফি। গৃহকোনে অভিমানী নারীর ক্ষুব্ধ অবস্থান লক্ষ্য করে। আবার বলে—একটিবার চেয়ে দেখ। ওকি! অমন করে মুখ ফিরিয়ে রইলে কেন?

কিন্তু নারীমূর্তি তেমনি অচঞ্চল, মৌণ।

সফি এগিয়ে যায় অভিমানী মিনতীর (?) দিকে সুকৌশলে পেছন থেকে মুক্তার মালাটি পরিয়ে দিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বলে—অমন করে থাকলে আমি কিন্তু কঠিন শপথ নেবো।

আয়েশা নিজেকে সামলাতে পারে না। অশ্রু-সজল চোখে সহসা ঘুরে দাঁড়ায়। সফির প্রতি চেয় কি যেন বলতে গিয়ে থেমে যায়। বিস্ময়-বিমূঢ় কণ্ঠে সফি বলে—আয়েশা! তুমি এখানে?

কোন উত্তর দিতে পারে না আয়েশা। নত-পল্লবে অশ্রু ঝরিয়ে দেয় শুধু। তার পাত্‌লা ঠোঁট দু'খানা ভীরু কম্পনের মাঝে জানায় অন্তরের ব্যাকুল অভিব্যক্তি।

বিস্ময়ে হতবাক সফি! এ তার দৃষ্টিভ্রম নয়ত! পৃথিবী কি এক নিমিষে উল্টে গেল! জীবনের খেলার হাটে ক্রীত পণ্য কি ক্ষণিকের ভুলে বিনিময় হ'য়ে গেল? অদ্ভুত! বড় অদ্ভুত!—তা' তুমি কেমন ক'রে এলে এখানে?

নতমুখী অশ্রু-সজল আয়েশার বুকের মাঝে জেগে উঠে অশান্ত ক্রন্দন। তবুও সে নিজেকে সামলে নিয়ে এগিয়ে যায় সফির কাছে। বেদনা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলে—আগে তুমি জামা কাপড় বদলাও। তারপর সবকিছু শুনো।

—না, আগে বল মিনতি কোথায়?

আর্দ্র-আকুল কণ্ঠে আয়েশা বলে—তিনি নেই। চিরদিনের মত দূরে চলে গেছেন। এই তার শেষ পত্র।

—শেষ পত্র! বল কি! সফির সর্বশরীর নিমিষে হীম-শীতল হয়ে আসে। খাটের উপর সে ব'সে পড়ে। আয়েশার হাত হ'তে পত্র নিয়ে গভীর উদ্বেগের সঙ্গে পাঠ করে। তার চোখ বেয়ে নামে অশ্রুর নিঃশব্দ প্লাবন।

রাত প্রায় এগারটা। বিষন্ন-ম্লান সফি। গাঢ় অন্ধকার নেমেছে তার মনের প্রাঙ্গন জুড়ে। বিষণ্ণ অভিভূতির মাঝেই সে আপন মনে ব'লে উঠেঁ—মিনতি, তুমি এমনভাবে আমায় কাঙাল ক'রে রেখে গেলে? তুমি না আমায় ভালবালতে—একান্ত ক'রে কাছে পাবার জন্য কায়মনবাক্যে কামনা করতে?

উচ্ছ্বাস-জনিত ব্যাকুলতায় চীৎকার ক'রে ওঠে সফি—না, না, কখনো তোমায় আমি যেতে দিতে পারি না।

আয়েশা ছুটে কাছে যায়। বলে—তুমি শান্ত হও। উনি ছিলেন

অভিনেত্রী—তাই চরম অভিনয় করে গেছেন।

সফি তেমনিভাবে নির্লিপ্ত থেকে উত্তর দেয়—সত্যি, তা-ই আয়েশা। কিন্তু এ অভিনয় দু'একদিনের নয়—দীর্ঘ তিনটি বছরের এতদিন ধরে দৃশ্যের পর দৃশ্য শেষ ক'রে বিচ্ছেদ-ম্লান যবনিকা আজ অন্তরে রেখে গেল বিরাট এক ক্ষত। জানিনা এ ক্ষত জীবনে শুকাবে কিনা। বড় ব্যথা আজ মনে। বড় ব্যথা আয়েশা।.

আয়েশা আর্ত্তকণ্ঠে বলে—তুমি স্থির হও। যিনি চ'লে গেছেন তাঁর জন্য দুঃখ করে লাভ কি?

—হাঁ, সত্যি। দুঃখ করে কোন লাভ নেই। কিন্তু ওর ঋণ যে জীবনে শোধ দিতে পারবো না। সেবার মাঝ দিয়ে, দানের মাঝ দিয়ে, ভালবাসার মাঝ দিয়ে ও যে আমায় নাগপাশে আবদ্ধ ক'রে রেখে গেছে। জীবনের শেষ কপর্দক পর্যন্ত দান করে নিঃসম্বল হয়ে চলে গেছে। এ যে কত বড় ত্যাগ, কতবড় অভিমান তা আমিই জানি। কিন্তু ওর অনন্ত বাসনা আর আকুল কামনা কি কোনদিন মুর্ত হয়ে জীব-জগতে বাস্তব সত্যে রূপ গ্রহণ করবে না। চাওয়া পাওয়ার হৃদয়-আবেগ কি নিস্ফল ব্যর্থতায় নিয়েই যাবে বাতাসের আবিল তরঙ্গে? না, না। ওকে আবার পাব আয়েশা। সে দিন এ গৃহে ওর আসন প্রতিষ্ঠিত হবে আমার হৃদয় জুড়ে।

মানুষের প্রেম বিচ্ছেদ ব্যথায় এত ভারী? একটি মাত্র মানুষ। লক্ষ লক্ষ মানুষ যুগ যুগ ধ'রে মানুষের মনে স্থান পায় না, জীবনভ'র সাধন করে মানুষের চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়না—অথচ সামান্য এক নারী জীবন যন্ত্রের কোন্ কোমল তারে আঘাত ক'রে এতগুলো মানুষকে কাঁদিয়ে গেল? এই কি জীবনের মালাডোর থেকে স্খলিত কুসুমের বিয়োগ ব্যথা? অতি পাশে থেকে, সৌহার্দ স্থাপনের মাঝে চিত্ত জয় ক'রে নিবিড় ভালবাসা বিলিয়ে যে জন আকস্মাৎ একদিন জন্মের মত চ'লে যায়, তারই জন্যই ত পাশের অতি আপন জনের

আকুল কান্না। তারই জন্যই ত ভক্তজনদের বিলাপ, বিশ্বপ্রাণে সমবেদনার করুণ উচ্ছ্স।

এই সমবেদনার—এই-ভালবাসার—এই চিরন্তনী প্রেমের বিশ্ব-ভোলা আকুল-আহ্বানের মাঝেই পৃথিবীময় জীবকুলের সৃষ্টি উৎস। জীব দেহ নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু সত্যিকার প্রেম অমর, অবিনশ্বর। প্রেমের ভাস্বর স্মৃতি কোনদিন বিস্মৃতি লাভ করে না। এ স্মৃতির জীবন্ত সাক্ষী কালের বুকে চিরসমুজ্জল—চির জাগ্রত। মহাকাল ধ্বংসের মাঝেও সে স্মৃতি অমর হয়ে বেঁচে থাকে। সাহারার মরু প্রান্তরে তাই আজও বেঁচে আছে পিরামিড, প্রাচীন গ্রীসের সমুদ্র-সৈকতে প্রেমের নিদর্শন রক্ষা করছে শত শত প্রীতি। আরবের মরু বালু ভূমে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের উদার বক্ষ বিস্তার ক'রে রয়েছে কাবার গৃহ। এই হৃদয়-বেদনার অনন্ত উচ্ছাস তাজমহলের পাষাণ হৃদয়ে হাহাকারের মাঝেও পেয়েছ প্রাণের সন্ধান।

(২৫)

দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে সফি চ'লে এসেছে। তার সঙ্গে এসেছে বধূ আয়েশা আর তার মা। মিনতির দানের সামান্য অংশ মাত্র তারা আনতে সক্ষম হয়েছে। বিভাগ পূর্ব বাংলার দুর্বৃত্তেরা লুঠন করেছে তাদের সবকিছু।

সফির জীবনে মিনতির বিচ্ছেদ ব্যথা হ্রাস হয়ে এসেছে। আয়েশা না নাভাবে স্বামীকে ভুলিয়ে রাখে। কিন্তু তবুও স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে সে বলে—কেন তোমার এ দীর্ঘশ্বাস' আমি জানি। কিন্তু মিনতির মত আমি ত অভিনেত্রী নই।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে বিমনা সফি বলে—মিনতি। হ্যাঁ, মিনতিকে কেন যেন ভুলতে পারিনে। অথচ জবনে একটা মুহূর্ত্তের

জন্মেও তাকে কাম্য ভাবিনি। যেদিন ভাবলাম, সেদিন দিগন্তে ঝড় উঠলো—তোমার আবির্ভাব হলো অতি আকস্মিক ভাবে। মিনতি অতিশপ্ত, তাই ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল—আর তুমি হ'লে বিজয়িনী। তোমাকে এমনি ক'রে বুকে ধরে বেদনার দীর্ঘশ্বাস ফেলী বলেই ত আজও ফেটে যাইনি। ফুটবলের ব্লাডারে যে পরিমান হাওয়া দেওয়া হয় তাতে কভার না থাকলে ফেটে যেতো। কভার থাকে বলেই ত অত হাওয়া বুকে নিয়েও ব্লাডার সহজে ফেটে যায়না। অফুরন্ত দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জিভূত হয়ে আমাকেও ফাটাতে চায়। আমি তখন আশ্রয় খুঁজি তোমার মাঝে। তোমাকে আমার চার পাশে কভারূপে রাখি বলেই ত আজও বেঁচে আছি আয়েশা।

আয়েশা এ অদ্ভুত সুন্দর উপমায় আনন্দ পায়। বলে—বেশত। এমনিভাবে সমস্ত বেদনার মাঝে আমাকে তোমার কফার করেই রেখো। তোমার সব দুঃখ যেন আমি ঢেকে রাখতে পারি।

আরও পরের কথা।

মা হামিদাবানু আর নেই। শুধু সফি আর আয়েশার সংসার। উভয়ের মাঝে সেদিনও আসনি কোন নতুন জীবন। তাই সফির অনুপস্থিতিতে আয়েশার নিজেকে বড় ফাঁকা মনে করে। জীবন বসন্তে ফলশূন্য আয়েশা হাঁপিয়ে ওঠে।

ওপাশের বাসায় এক ভদ্র পরিবার বাস করেন। তাদের দেড় বছরের খোকনকে আয়েশা সবসময় কাছে রাখে। নির্জন অবসর সময় কাটাবার একমাত্র সাথী খোকন। তার আধো আধো কথার মাঝে আয়েশা মিশিয়ে নেয় জীবনের সুখ আর ছন্দ। খোকনকে নিয়ে সে অকারণে ব্যস্ত হয়ে উঠে। তার জামা-কাপড় এমন কি খেলনার বস্তু পর্যন্ত আয়েশা কিনে দেয়। কিন্তু এসব দিয়েও দেবার সাধ যেন তার পূর্ণ হয়না। ছোট্ট খোকনের মাঝে আয়েশা নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে পেতে চায় অনির্বাচনীন সুখ, মাতৃত্ববোধের

চরম সুখ। আবেশ আকুলতায় আয়েশা খোকনকে বুকে চেপে ধরে। তার আবেগ মত্ততার মাঝে ছোট্ট শিশু দেহ কতখানি ব্যথা জাগে আয়েশার তা চিন্তা করার ফুরসৎ কোথায়? তার দুরন্ত আবেষ্টনে খোকন হাপিয়ে ওঠে। চীৎকার করে কাঁদতে থাকে। এমনিভাবে কাঁদিয়ে সোহাগ চুম্বন দিয়ে আয়েশা বলে—না, না। মানিক আমার—সোনা আমার।

শূন্য-বক্ষ আয়েশা। সন্তানহীনা মমতাময়ী নারীর বুকে শূন্যতার হাহাকার। আয়েশা একা একা থাকতে পারে না। তাই সময়ে অসময়ে তাকে—খোকন, ও খোকন ……

খোকন তার কচি পায়ে ছন্দ তুলে ছুটে আসে। দু'খানা বাহু বাড়িয়ে সহাস্যমুখে ছুটে আসে সে। আয়েশা নিমেষে তাকে বুকে তুলে নেয়। তার ফেঁপে-ওঠা বুকে খোকনও যেন বলের কভারের মতই তাকে ফেটে নিঃশেষ হ'তে দেয় না। আয়েশার গলা জড়িয়ে, বুকের মাঝে জ'মে যায় ছোট্ট খোকন। মাতৃক্রোড়ে শিশু যেন।

কী জীবন্ত আবেশ! আয়েশা মনেপ্রাণে অশান্ত হয়ে ওঠে। আবেগ চঞ্চলতায় খোকনের কোমল গণ্ডে মিলিয়ে দেয় তার পাতলা ঠোঁট দু'খানা চুম্বনে চুম্বনে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে। সহস্র সিংহের বিক্রমে খোকনকে চেপে ধরে বুকের মাছে। তার অতৃপ্ত যৌবনতটে জাগে সৃষ্টিসুখের বিপুল তরঙ্গ। খোকনের স্পন্দনের মাঝে নিজের নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করে। শান্ত মধুর অবেশে চরম তৃপ্তির সন্ধান খোঁজে আয়েশা। কত সুখ আছে এতে? কত তৃপ্তি? কিন্তু না, কোথায় সুখ কোথায় তৃপ্তি? নকল দিয়ে কি আসলের সাধ পূর্ণ হয় কোনদিন? তাই কামনার দীর্ঘশ্বাস সজোর ধাক্কা দেয় আয়েশা ক্ষুধার্ত্ত হৃদয়ে। জীবনের গতিছন্দে সুরের অপূর্ণতা বোধ করে আয়েশা। নিস্তরঙ্গ জীবন স্রোত সহসা বহির্মুখী

ধাক্কায় তাকে অস্থির ক'রে তোলে। সে যেন ভেঙ্গে খান খান হ'য়ে যেতে চায়।

ফাল্গুনের দুপুর। প্রশান্ত, কোলাহল শূন্য দুপুর। আয়েশা ঘুমিয়ে আছে অঘোর নিদ্রায়। তার বুকের মাঝে অলস ঘুমে জরিয়ে আছে খোকন। সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্রের আড়ালে আয়েশার শুভ্র সুডৌল বুকে খোকনের কচি ওষ্ঠাধর সংলগ্ন। ঘুমন্ত শিশুর পাশে অর্দ্ধনগ্নভাবে ঘুমিয়ে আছে অনাগত শিশুর মা? বিলম্বিত বাহু—স্খলিত-বসন, অনাবৃত পৃষ্ঠপ্রদেশ। ঘুমন্ত খোকন মাঝে মাঝে কোমল বাহুতে আঁকড়ে ধরে আয়েশাকে। শিহর মাদকতায় ঘুমের মাঝেও আয়েশা আড়ষ্ট আবেশ দেয় সঙ্কুচিত পুলকে! কি স্পর্শ সুখ অনুভব করে সে নিদ্রার আবেশ? কি কামনার নেশা জেগেছিল তার ঘুমোবার প্রক্কালে? কি খেয়ালে ডুবতে চায় সে অস্তিত্বহীন হয়ে? কার ওষ্ঠপুট মাঝে নিঃসঙ্কোচে, পুলক অনুভূতির আবেশে নারী উন্মুখ করেছে আবরণে ঢাকা শরম-শিহরিত?

আয়েশা ঘুমের আবেশে খোকনের শিথিল হাতখানা শক্ত করে জড়িয়ে নেয় বুকের মাঝে। স্বল্পঘুমে অনুভব করে সে অদ্ভুত পুলক। প্রেমান্ধ আবেগ জেগে ওঠে তার অঙ্গে—জোয়ার জাগে শিহরে তরঙ্গে। আয়েশা প্লাবিত হতে চায়। সরসিত করতে চায় কামনা-মরুর বিশুষ্ক বেলা ভূমিকে।

খোকন ঘুমিয়ে আছে। তাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধ'রে ঘুমিয়ে আছে আয়েশা। নিদ্রাবেশে সে আঁকড়ে ধরে খোকনকে তার শুভ্র কোমল বুকে। মায়ের ঘুম সন্তানে দেহ আবেষ্টনে।

পড়ন্ত বেলায় চাকরীস্থল থেকে সফি ঘরে ফিরেছে। শান্ত সমাহিত নগরীর বুকে।—সেই প্রশান্তি মাঝে ঘুমিয়ে আছে কক্ষপ্রাঙ্গণ।

সেখানে অপরূপ এক দৃশ্য সফির চোখের সামনে। নিঃশব্দে,

স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। এ কি আদিম মাতৃত্ব! অনাগত মায়ের সন্তান লালনের এ কি মধুর দৃশ্য।

অভিভূত সফি। অভিভূত তার দর্শন ইন্দ্রিয়। নীরবে, প্রশান্ত দৃষ্টিপাতে সে লক্ষ্য করে ঘুমন্ত আয়েশাকে। সুন্দরী, তম্বী আয়েশা আকাঙ্খাময়ী অতৃপ্ত আয়েশা। অনাগত কত শিশু ওর মাঝে রয়েছে অপ্রকাশ। কাদের প্রচ্ছন্ন স্বরূপ এত অরূপ? এ ভাবে উন্মুক্ত ক'রে কোনদিন নিজেকে প্রকাশ করেনি অয়েশা! স্বামীর চরম কামনা তলেও লজ্জাবোধ' অকারণ সঙ্কোচ? কিন্তু সন্তানের কাছে মায়ের একি সকরুণ আত্মসমর্পন।

অতি সন্তর্পণে পাশে গিয়ে আসন গ্রহণ করে সফি।

খোকনের মুখের পাশে আয়েশার বুকের পরশ! রসলেশহীন সন্তানহীনা নারীর সুঠাম পয়োধর। ক্রমে শিথিল হয় খোকনের বাহুর আবেশ। নিদ্রাবেশ আয়েশা তাকে আঁকড়ে ধরে বুকের মাঝে। কিন্তু আবার আলগা হয়ে যায় তার বাহু-বন্ধন! সফি সামলাতে পারেনা নিজেকে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আয়েশাকে।

আকস্মিক আক্রমণ! আয়েশা ত্বড়িতে উঠে বসে। সক্রিয় বুনো চুম্বন তলে ততক্ষণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে সে। বলে—ছাড়ো। পাগল হয়ে গেলে যে।

—পাগল করার পরিবেশ কেন সৃষ্টি করেছ তাই আগ বল? নিজের প্রতি একবার চেয়ে দেখ।

নিজেকে লক্ষ্য করে সে লজ্জায় ম'রে যায়। সফির বাহুমুক্ত হয়ে ছুটে যায় পাশের ঘরে। তারপর আবরু ঠিক করে মৃদু হাসি ফুটিয়ে কাছে এসে দাড়ায়।

সফি প্রশ্ন করে—কি? চুপ ক'রে রইলে যে! কিছু বলবে?

আয়েশার মুখ ফুটে কথা বের হয় না।

সফি কাছে টেনে নেয় তাকে। মাথায় সুধীর পরশ বুলিয়ে

খুলে দেয় তার চুলের বাঁধন। মেঘের মত ছড়িয়ে পড়ে অজস্র চুল তার দেহের চারপাশে। তারই পটভূমিকায় আয়েশার সুন্দর মুখশ্রী বিপুল বনানী মাঝে সুদৃশ্য সৌধ যেন।

দুষ্টু হাসি হেসে সফি বলে—তোমার মনের কথা আমি জানি।

স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে আয়েশা বলে—কি, বল?

ঘুমন্ত খোকনকে দেখিয়ে সফি বলে—অমম একটা ছেলে চাও' নয় কি?

আয়েশা মুখ তুলে সমর্থন করতে গিয়ে থেমে যায়। তার লাজুক মুখ আবার অবনত হয়।

সফি প্রশ্ন করে—বল, সত্যি কিনা?

আয়েশা উত্তর দেয়—হ্যাঁ। তোমার বুঝি সাধ যায় না? কেমন যুঁই ফুলের মত ছেলেটি। এতটুকু বলেই আয়েশা আবার থেমে যায়। স্বামীর বুকের মাঝে মুখ লুকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। অন্তরের মৌণ ভাষায় আয়েশা কি কথা বলে সফি তা স্পষ্ট শুনতে পায়। ধীরে সুস্থে স্ত্রীর মাথায় হাত বলিয়ে বলে—নাইবা হ'লে ছেলের মা। ত'ছাড়া এত তাড়া কিশের? ছেলে হ'লে একা থাকার এ আনন্দ থাকবে কোথায়?

আয়েশা প্রতিবাদ করে। অভিমানের সুর ওঠে তার কণ্ঠে।—না না। তুমি অমন কথা ব'লো না। একা আমি থাকতে চাইনে। এত ফাঁকা জীবনে মেয়েরা কখনও বাস করতে পারে? আমি মা হ'ব। ছোট এতটুকু ছেলে—আমি হব তারই মা। মাতৃত্বই যে নারীত্বের চরম বিকাশ। তুমি আমাকে মা হ'তে দাও, ওগো তুমি আমায় পূর্ণতা দান করে ধন্য হ'তে দাও।

সফি অবাক বিস্ময়ে আয়েশার আকাঙ্খা-দীপ্ত মুখের প্রতি চেয়ে থাকে। আজ তার মনের প্রাঙ্গনে মিনতির মুখখানা ভেসে ওঠে। মিনতিও একদিন এমনি কথাই মুখ ফুটে বলেছিল। আজ আয়েশা

আবার সেই কথাই বললে! জগতের নারী-হৃদয় কি শুধু মাতৃত্বের আশা নিয়েই বেচে থাকে? হয়ত বা তা-ই। যারা মা হয়না তারা হতভাগিনী—জীবনে তারা ব্যর্থ!

নারীর সঙ্গে বিশ্ব-জীবনের যে নাড়ীর সম্বন্ধ। নারী সেই জন্যই ত মা! সন্তান প্রসবিনী, সৃজনময়ী মা। এমনি সব মায়েদের মাঝ দিয়েই খোদার চিরন্তনী সৃষ্টি আজও বেঁচে আছে। নইলে কবে এ পৃথিবী জনপ্রাণী শূন্য হয়ে যেতো, কে জানে?

(২৬)

রতনদীঘির চৌধুরী পরিবারে মুমূর্ষ আনোয়ারকে কেন্দ্র ক'রে উঠেছে কান্নার রোল। অচেতন অস্থিচর্মসার আনোয়ারের দেহের পাশে সজল চোখে বসে আছে তার দ্বিতীয়া স্ত্রী, আর শিয়রে রয়েছেন বৃদ্ধা স্থবির, লোলচর্ম মা। পলকহীন, অশ্রুসিক্ত মায়ের চোখ। আশে পাশে দাঁড়িয়ে আছে আরও অনেকে। একটা থমথমে রুদ্ধ অর্ত্তনাদে ভারী হয়ে আছে গৃহ। আসন্ন মৃত্যু বিভীষিকার শাসনতলে গতিহীন পৃথিবীর স্তব্ধতা যেন।

ভগ্ন, জরাজীর্ণ চৌধুরীবাড়ী। পুরাতন দালানবাড়ীর সংস্কার সম্ভব হয়নি কোনদিন। নোনা-খাওয়া ইট গুলো পাইওরিয়া রোগীর বিশ্রী দাঁতের মত প্রকট হয়ে আছে। জানালার লোহার শিকগুলো মরচে ধ'রে খেয়ে গেছে—কাঠের চৌকাঠ ভেঙ্গে খসে পড়েছে। ইঁদুর, আরসলা, বাদুর প্রভৃতির আবাসে পরিণত হয়েছে বিরাট চৌধুরী বাড়ীর ঘরগুলো।

দীঘির চারপাশ জঙ্গলাকীর্ণ। বহুদিন সংস্কার হয়নি এ দীঘির। ঘন আগাছায় আর বেতস বনে ছেয়ে গেছে ভগ্ন দীঘির চার পাশ ডাহুক ডাহুকীরা নিরাপদ আবাস গড়েছে ঝোপ-জঙ্গলের

অন্তরালে। গতদিনে ঐশ্বর্য-বহুল পথ আজ নিশ্চিহ্নপ্রায়। চলতে গেলে পায়ের তলায় ওঠে বুনোলতার আকুল ক্রন্দন! ওরা যেন জড়িয়ে ধরে দু'খানা পা। সান বাঁধানো প্রসস্ত ঘাট ভেঙ্গে ধ'সে গেছে। দীঘির তলদশে শেওলা-বহুল ফাটলধরা ভগ্নাবশেষ বিকৃত হয়ে পড়ে রয়েছে—যেন শ্মশাণ ভূমিতে বিক্ষিপ্ত নর-কঙ্কালের শত শত অবস্থান। গভীর কালো পানি কেমন যেন থমথমে ভাব নিয়েছে। কেউ এখন সাহস করে না দীঘিতে নামতে।

চৌধুরী পরিবারের রাজ পথ আজ শ্রীহীন—কদর্য্য। সদর দরজা থেকে সোজা ডিষ্ট্রীকবোর্ডের রাস্তায় গিয়ে মিশেছে রাজপথ। লাল সুরকীর রঙে একদিন এ পথ জীবন্ত ছিল। আজ গতদিনের ঐশ্বর্যের সঙ্গে রাজপথের শ্রীও চ'লে গেছে। অতীত আভিজাত্য আজ ধূলি-ধূসরিত, ক্ষত-বিক্ষত। দুই পাশে দেবদারু গাছের সারি। ওরাও কালের গতিতলে বার্দ্ধক্য পেয়েছে। নিস্তেজ গতিহীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অজস্র গাছ। দেবদারু পাতার ফাঁকে চাঁদের হাসি আর আগের মত মধুর হয়ে নেমে আসেনা—কলকণ্ঠ বিহঙ্গের স্বচ্ছন্দ বিহারে মুখর হয়না অতীতের ঐশ্বর্য্যপূর্ণ দিনগুলো।

চৈত্রের দুপুর। প্রখর রৌদ্রতেজে ঝলসে গেছে সমস্ত পৃথিবী। স্খলিত শাখাপত্রে মৃত্যুর জ্বালাময়ী ক্রন্দন। সে ক্রন্দন ক্লান্ত ধরণীর বিশুক আবহাওয়ায়। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে, কণ্ঠতালু শুকিয়ে যায়—জীবনী শক্তি হয় ক্ষীণবল। শর্, শর্ শব্দে দেবদারু পাতা ঝ'রে পড়েছে—অজস্র তামাটে রঙের পাতা। মৃত্যু, মহড়ায় ধূলিম্লান রাস্তায় ওরা পুরু কার্পেটের আস্তর মেলেছে যেন। ওদের বিশুষ্ক বুকের ওপর ক্রন্দন তুলে কচিৎ কখনো-দু' একজন নরনারী নিদাঘের স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে যাতায়াত করে। দু'একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ শব্দে চীৎকার 'করে ওঠে—ছাগ শিশুরা লাফিয়ে বেড়ায়—গাভীরা হাম্বা হাম্বা রব তোলে। ওপাশে বিরাট বাঁশবন। ছোট বড় অসংখ্য

কঞ্চিশাখা এখন পত্রহীন। দু'একটা ঘুঘু দুপুরের স্তব্ধ বুকে আওয়াজ তুলেছে করুণ সুরে। মধুমক্ষিকা, গুঞ্জন তুলেছে বাতাসের স্তরে।

পড়ন্ত বেলা। কানাই কামারের হাতুড়ির শব্দ নেই। কলুদের ঘানির ক্যানকেনে আওয়াজ বন্ধ। তাঁতীবাড়ীর তাঁতের বিরামহীন ঠক্ ঠক্ শব্দ নেই। কোকিলার মায়ের ডাল-ভাঙ্গার যাঁতা আজ নিঃশব্দ। সব যেন, ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত—অলস, অবশ, নিঃসার! শুধু জেগে আছে কাকের দল। ওদের কণ্ঠ আজ আরও কর্কশ।

বেলা পড়ে এসেছে। পশ্চিম দিগন্তে জমে উঠেছে অসংখ্য খণ্ড মেঘের দল। অচঞ্চল বিচিত্র মেঘমালা। ওদের অন্তরালে ডুবে গেল সন্ধ্যা-সূর্য্য। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বিচ্ছুরিত তীর্য্যক সূর্য্যরশ্মি—অসংখ্য টর্চ্চের আলো যেন।

আনোয়ারের শেষ নিঃশ্বাস ঘনিয়ে এলো। অন্তিম শর্য্যা-শিয়রে শ্মশ্রু বিশিষ্ট এক বৃদ্ধ কোরাণ পাঠে নিমগ্ন। তার কণ্ঠ যেন সপ্ততল আকাশ ভেদ ক'রে অনন্তের কানে গিয়ে প্রতিধ্বনি জাগাচ্ছে।

দার্শনিকের মৃত্যু—মানুষের মত বিরাট এক মানুষের অনাড়ম্বর মৃত্যু। এ মৃত্যু শিয়রে সফি এসে উপস্থিত হয়েছিল। তারই কোলে মাথা রেখে আনোয়ার চিরকালের মত স্থির হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তার আঁখি পাতা গেল নেমে। জগতের পান্থশালায় খেলার আসরে চিরতরে ম্লান হ'ল একটা মহান জীবন।

আনোয়ার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। পৃথিবীর কোন বন্ধন তাকে আটকাতে পারেনি। তার মুক্তি-পিঞ্জর আত্মার উল্লাসগতি সফি যেন স্বচক্ষে দেখেছে। সে দেখতে পেয়েছে—কি যেন এক অশরীরী শক্তির স্ফুলিঙ্গ আনোয়ারের অঙ্গ হ'তে আলগা হয়ে সুদূর গগনমার্গে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিস্তারে উঠে গেল, কি যেন এক অস্ফুট বাণীর পরিব্যাপ্তিময় রণন ধ্বনি সে শুনতে পেল! হঠাৎ আকাশ ধোঁয়াটে হল। ক্ষণিকে মেঘের সঞ্চার দেখা দিল। কী

কৃষ্ণঘন মেঘ। কি ভয়াবহ তার গতিভঙ্গী। মেঘের স্তরে স্তরে প্রলয় শুরু হ'ল! তোলপাড় করে ওলট পালট হয়ে গেল মেঘের দল। প্রলয় শুরু হ'ল আকাশের বুকে।

মুহূর্ত্তে প্রলয় থেমে গেল। শান্ত বেহেস্তি সুষমায় চতুর্দ্দিক এখন পরিব্যাপ্ত। একটা মধুর বাদ্য ধ্বনিতে দিগঙ্গন সুরময়। অন্ধকার মেঘের মাঝে দেখা গেল প্রশস্ত সুরঙ্গ পথ। সে সুরঙ্গের মাঝ থেকে পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে মহা জ্যোতিষ্মান এক আকর্ষণীয় আলো। সে আলোর ধারা বেয়ে উর্ধ্বগতি নিয়ে আনোয়ারের বক্ষপদেশ থেকে উঠে গেল এক অপূর্ব্ব দর্শন জ্যোতিঃ! বিদ্যুৎবাহের মত ক্ষুদ্র এ আলো অনন্ত আলোর মহা বিস্তৃতর মাঝে মিশে গেল। তারপর অদৃশ্য হ'ল মহাকালের বুক থেকে সেই জ্যোতির্ম্ময়ী দ্যুতির রেখা। গভীর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল দীপ্তি, থেমে গেল চলমান জীবনের স্পন্দন ধ্বনি। আনোয়ার ঢলে পড়ল—থেমে গেল তার হৃৎপিণ্ডের গতি চিরদিনের মত।

মেঘের জ্যোতিষ্মান সুরঙ্গপথ এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। অজস্র বিভীষিকাময় ফাটলে বিস্তৃত মেঘাস্তর। ভয়াবহ তার রূপ। এতক্ষণের গর্জ্জনও থেমে গেছে। পৃথিবীর পুরাতন সুর বাতাসের শন্ শন্ শব্দের মাঝে শোনা যায় এখন। মোহমুক্ত সফি। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সে দেখতে পায় সেই অতীতের জীবন—শুনতে পায় চিরকালের ব্যস্ত কোলাহল। সেই হাসি কান্নার কদর্য্য ব্যস্ততা সমান তালে চলে তার চোখের সামনে।

মেঘের বিচিত্র স্তরের মাঝে জমেছে রঙের আসর। অস্তমিত সূর্য্যের শেষ আভায় রঙিন মেঘমালা! এমনি এক রঙিন আকাশের মাঝেই তার আনোয়ার ভাই একদিন আশ্রয় খুঁজেছিল।

সন্ধ্যার কাজল মধুমতির তীরে সংলগ্ন গোরস্থানে আনোয়ারের শেষ সমাধি প্রস্তুত হ'ল। কঠিন মাটির বুক শাণিত অস্ত্রের আঘাতে

মানুষেরা খুঁড়েছে এক বুক গর্ত্ত। ওখানে তারা শুইয়ে দেবে কঙ্কালসার এক নরদেহ। তারপর দেবে মাটির শক্ত প্রলেপ। নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে এতকালের আসর জমকানো মানুষটিকে। বিস্মৃতির মাঝে হারিয়ে যাবে ওর সকল স্মৃতি।

শবগ্রাহী মানুষের দল এগিয়ে চলেছে মন্থর গতিতে। ধৌত, স্নাত, সুবাসিত শব নিয়ে ওরাও যেন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সবার হাসি মুখ আজ ম্লান, বিবর্ণ।

ওদের গমন পথের পেছনে একখানা গাড়ী এসে থামলো। তার মাঝ থেকে নামলো বিগতযৌবনা ক্লান্ত-ম্লান, মিনা। চোখেমুখে তার দারুন উৎকণ্ঠা। মনের প্রাঙ্গণ জুড়ে গভীর বিষণ্ণতা। বুকের মাঝে গুমরে মরছে বিরামহীন নিঃশব্দ আর্ত্তনাদ। গাড়োয়ান মেয়েটিকে বললে—ওই যে চৌধুরীদের বাড়ী। সোজা চলে যান।

দেবদারুর শুকনো ঝরা পাতার বুকে ক্রন্দন তুলে এগিয়ে চলেছে শব বাহকের দল। পেছনে কতগুলো লোক শান্তপদে শোক প্রকাশ করে এ গুচ্ছে। স্থবির লোলচর্ম্ম বৃদ্ধাকে আগলে ধ'রে চলেছে গ্রামের একদল মেয়েরা।

মিনা স্তব্ধ-বিস্ময়ে মলিন মুখে দাঁড়িয়ে দেখলো সবকিছু। শত অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে সে এসেছিল স্বামীর পায়ে মাথা রাখবার জন্য। কিন্তু একি অভাবিত দৃশ্য তার চোখের সামনে। ওরা নিয়ে যাচ্ছে কার মৃতদেহ? কে মরেছে আজ? মিনার বিষাক্ত নিঃশ্বাস কি কারও চরম ক্ষতির কারণ হয়েছে?

একটা রাখাল বালককে কাছে ডেকে মিনা সস্নেহে প্রশ্ন করে—কে মারা গেছে খোকা?

বালক উত্তর দেয়—পাগল।

পাগল! চৌধুরী বাড়ীর কেউ নাকি? উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে মিনা প্রশ্ন করে। বালক মাথা নেড়ে বলে—হ্যাঁ, আনোয়ার চৌধুরী

—আনোয়ার চৌধুরী। অব্যক্ত চীৎকার ক'রে ঢ'লে পড়ে মিনা। সারা দেহে জাগে ভীরু কম্পন! চোখ ফেটে অশ্রু বের হতে চায়—বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চায় হৃৎপিণ্ড।

মিনা ছুটে যায়। শবধারী মানুষদের পেছনে গিয়ে সে চীৎকার ক'রে বলে—ওগো, তোমরা একটু শোন।

কিন্তু কেউ ফিরে তাকায় না। কোরাণের আয়েত উচ্চারণ করতে করতে ওরা এগিয়ে যায় নিরুত্তরে।

মিনা উন্মাদিনীর মত ছুটতে থাকে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য সে। কিন্তু নিষ্ঠুর এ পৃথিবী। কারও অসাবধানতার জন্য এ পৃথিবী ক্ষমা করতে জানে না। এবড়ো থেবড়ো রাস্তার উপরে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তার কপালের একাংশ কেটে দরবেগে বেরিয়ে আসে রক্ত। ধূলায় লুণ্ঠিত হয় সুন্দর দেহ। আবছা আলোয় নিজের রক্তাক্ত দেহ নজরে পড়ে। রক্ত!- এত রক্ত তার দেহে! মিনা দু'হাতে ক্ষত স্থান চেপে ধরে। সারা মুখে রক্তের ছাপ। ধুলি আর রক্তে বিশ্রী হয়ে উঠে মুখমণ্ডল। রক্তমাখা মিনাকে আজ কেউ চিনতে পারবে না। কেউ না। নিজের রক্তমাখা হাত দু'খানা পরখ করে দেখে সে অব্যক্ত চীৎকার ক'রে নিজেই মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হয়।

টলতে টলতে সে গোরস্থানের দিকে এগিয়ে যায়। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য উন্মাদিনী নারী। শেষ বারের মত স্বামীর পায়ে মাথা রেখে ক্ষমা চেয়ে নেবে সে। তাই ছুটে চলে মিনা। কিন্তু ব্যর্থ হয় তার সব আয়োজন। মিনার উপস্থিতির আগেই শববাহকেরা কবরের মাঝে লাশ নামিয়ে দেয়। কোরাণের আয়াতগুলো গুণ গুণ ক'রে পড়তে থাকে ওরা। তারপর মাটি চাপা দিতে শুরু করে। ওরা দৃষ্টির আড়াল করে দেয় বিরাট একটা নরদেহ!

সন্ধ্যায় অন্ধকারে চতুর্দিকে এখন থমথমে ভাব। সামান্য একটা ।আত্মার মহাপ্রয়াণে পৃথিবীর জীবন-চাঞ্চল্য যেন থেমে গেছে। বিশ্ব

হাহুতাশে বুকের পাঁজর ভেঙ্গে আসে! অন্ধকারের কলো ছায়া আজ আজরাইলের থাবার মতই বিভীষণ। আরও কয়েকটা লণ্ঠন জ্বলে ওঠে কবরখানায়। বাঁশ বনের আড়ালে বুনোলতায় ঘেরা সান্ধ্য গোরস্থানে ভৌতিক আলোর মতই সেগুলোকে মনে হয়। মনে হয় কতগুলি ছায়ামুক্তি প্রেতের মত নড়াচড়া করছে।

লাশ নেমে গেছে কবরের মাঝখানে। শেষ মুহূর্তে ক্ষমা চাইবার অবসরও মিনার জোটেনি। কিন্তু চৌধুরী বাড়ীর সদর দরজা তার জন্ম উন্মুক্ত হয়ে আছে। সেখান থেকে বাতাস এসে যেন জানিয়ে যাচ্ছে আশ্রয় আহ্বান।

একে একে কবরখানা হ'তে মানুষের দল ফিরে এলো। কয়েকটা লণ্ঠন হাতে ক্লান্ত, বিষণ্ণ মনে ওরা এলো ফিরে। দেবদারু গাছের আড়াল থেকে মিনা লণ্ঠনের আলোয় সফিকে স্পষ্ট দেখতে পেল। সফি এখানে! সে আবার লক্ষ্য করলো ওর মুখ! নিজেকে বিব্রত ভেবে সরিয়ে নিতে চাইল, কিন্তু পারলো না।

নৈশ অন্ধকারের বুক চিরে ক্ষীণ কান্নার আওয়াজ বের হ'ল। লণ্ঠন হাতে এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল সফি।—কে? কে ওখানে, ধূলি-রক্তমাখা, বিশ্রী এক নারী। তাই রাতের আলোছায়ায় সফি একটুও চিনতে পারে না তাকে।

সে আবার প্রশ্ন করে কে তুমি?

মিনা নীরবে সরে যায়। শির্ শির্ করে রাতের বাতাস ব'য়ে যায় দেবদারু গাছের শাখাপত্র দুলিয়ে। অগ্রগামী মানুষের দল সফিকে ডাকে—চ'লে এস ও এক পাগলী।

সফি বলে—পাগলের মৃত্যুর মাঝে আবার পাগলীর আবির্ভাব! কথাগুলো বলে সেও চ'লে যায়।

মিনা এতক্ষণে অস্থির হয়ে উঠে। চৌধুরী বাড়ীর ধূলিকণা তাকে আশ্রয় দিলেও সফির কাছে সে কোনমতেই মুখ দেখাতে পারে না।

" [redacted] "

তার আত্মসমর্পনের পথে উপস্থিত হয় বিরাট এক বাধা। সফিকে এখানে সে কল্পনাও করেনি।

চতুর্দ্দিকে থমথমে আবহাওয়ায় ভারী হয়ে আছে। বাতাস গুঞ্জন তুলে ভেসে যাচ্ছে। পৎ পৎ পাখার শব্দে বাদুড়ের দল উড়ে চলেছে অবিরাম গতিতে। আরও অনেক নিশাচর পাখীরা গাঢ় অন্ধকারে মেলেছে পাখা।

সংসারের ব্যস্ততার সাড়া এখন ক্ষীণতম। জগতের জীব-কুল আজ মহাতারকার গতিপথে দিশেহারা, স্তব্ধ। দিনের আলো নেই, গোধূলির আকাশ নেই, রাতের শিখাময় প্রদীপ নেই। পৃথিবী যেন জীবন্ত মরা। আছে শুধু বিচ্ছেদের বেদনামাখা গাঢ় অন্ধকার। জীবনের প্রদীপ্ত পথে মরণের কুৎসিত ভয়াবহ আঁধারের মহাসাগর। সে আঁধারের পরপারে কি আছে, কেমন সে দেশ, কে জানে? হয়ত সেদেশ ক্ষণিকের জন্য নয়। হয়ত সেখানে জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, শোক; বেদনায় বিচ্ছেদ-ম্লান দীর্ঘশ্বাস—কোন কিছুই নেই। আছে শুধু প্রাণ—অজস্র হাস্যমুখর প্রাণের প্রীতিময় স্পর্শ দোলা, অফুরন্ত আলোর উৎসব—চির বসন্তের চিরন্তন জাগরন। সেখানে ভোগের শেষ নেই, উপভোগের কার্পণ্য-ক্লান্তি নেই, সম্ভোগের বিতৃষ্ণা নেই, বাধা নেই। সেই ত জীবকুলের আসল আবাস ভূমি।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—